মাঙ্গলিক

উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির

প্রথম প্রকাশঃ ১৯৬৪

প্রকাশিকা ঃ
সুপ্রিয়া পাল
উজ্জ্বল-সাহিত্য-মন্দির
সি-৩, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীঘণ্টেশ্বর চক্রবর্ত্তী
মহামায়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৬৬ বি, মাণিকতলা স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

মাঙ্গলিক

মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় 'মাঙ্গলিক' মধুর গল্প ও উপন্যাসের সমষ্টি নিয়ে প্রকাশিত হলো। দেশবরেণ্য সুধী সাহিত্যিকবৃন্দের অমূল্য রচনা দিয়ে পূর্ণ করা হয়েছে মাঙ্গলিকের মঙ্গলঘট। তাঁদের উৎসাহ ও লেখার জন্য আমরা তাঁদের নিকট চির-কৃতজ্ঞ।

বিজ্ঞাপনবর্জিত এইরূপ বিরাট একটি গ্রন্থ নামমাত্র মূল্য নির্ধারিত হয়েছে—শুধু মাত্র সৎ-সাহিত্য প্রচারের জন্য। আপনাদের ভালো লাগলে শ্রম সার্থক হবে আমাদের। তাড়াতাড়ি মুদ্রণ কাজে যদি আমাদের কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে থাকে, আশা করি তা নিজগুণে ক্ষমা করবেন।

এই বই প্রকাশনার কাজে যাঁরা সাহায্য করেছেন, তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। কাগজের অস্বাভাবিক দুর্মূল্যতা ও দুষ্প্রাপ্যতার মধ্যেও যথাসময়ে বইটি প্রকাশ করতে যাঁরা নিঃস্বার্থ-ভাবে পরিশ্রম করেছেন, তাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

পরিশেষে যাঁর পরিকল্পনায় এই গ্রন্থ প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে, সাহিত্য-গত প্রাণ উজ্জ্বল সাহিত্য-মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা শ্রদ্ধেয় শরৎচন্দ্র পালের স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হলো এই গ্রন্থটি।

নমস্কারান্তে—

প্রকাশক

সূচীপত্র

ক'টি ছায়া একটি গল্প

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

সতীশ ডোম। সতীশের বংশ পরিচয় করতে যা দিয়েছি, তাতে এতটুকু অতিরঞ্জন নেই। তাদের নিয়ে অনেক গল্প লিখেছি আমি। সতীশ কবিযশঃপ্রার্থী ছিল—এই আকাঙ্খাতেই সে ওই পরিবার ও গোষ্ঠীগত চৌর্যবৃত্তির প্রবিত্রাণ পাবার জন্য ষ্টেশনে এসে রাজা পয়েন্টস্‌ম্যানের কাছে আশ্রয় নিয়েছিল। পাঁচ-সাত মাইলের মধ্যে যেখানে কবিগান হোক, মাথায় চাদর জড়িয়ে, জামা গায়ে দিয়ে সতীশ যেতোই এবং আসরে কবিয়ালের দোঁহাদের পাশে ব'সে সুরে সুর মিলিয়ে দোয়ারকি করত। মধ্যে-মধ্যে ফোড়নও দিত। আমাদের দেশে কবিয়ালরা সাধারণত ঢুলি নিয়েই আসে, দোয়ার জুটে যায় স্থানীয় সতীশদের মধ্যে থেকে। না জুটলে ঝুমুর দলের মেয়েরা এই কাজ ক'রে থাকে। কবিগান সাধারণত মেলাতেই হয় এবং মেলায় কবিগান ও ঝুমুর—এ দু'টি আহার্যের ব্যবস্থায় ভাত এবং ডালের মত অপরিহার্য বা অবশ্যকরণীর ব্যবস্থা। আমার গ্রামে বা গ্রামের কাছাকাছি যেসব মেলা হয়, সেসব মেলায় আমি সতীশকে এইভাবে দোয়ারকি করতে এবং ফাঁক পেলে সেই ফাঁকে নাক গলিয়ে মুখ বাড়িয়ে কানে হাত দিয়ে ঈষৎ সামনে ঝুঁকে দু'-চার কলি গাইতেও দেখেছি। প্রতিপক্ষ ঝুমুর দলের মেয়েদের ব্যঙ্গ করতেও শুনেছি। আবার দূরান্তরের মেলা থেকে ফেরার সময় ভোরবেলায় স্টেশনের পথে তাকে মাথায় চাদর বেঁধে উচ্চকণ্ঠে গান গেয়ে ফিরতে দেখেছি। সতীশ জানত যে, আমিও একজন কবিযশঃপ্রার্থী। তাই আমার সঙ্গে প্রীতিটা ছিল একটু গাঢ় আমাকে দেখলেই হেঁট হয়ে প্রণাম জানিয়ে বলতো, প্রণাম প্রভু।

ইচ্ছে যে, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি, "কোথা হতে আগমন, কহ কিবা বিবরণ, রসভাণ্ড উপচায় কেন ?"

আমি নিজেই জিজ্ঞাসা করতাম। না করলে সতীশ নিজেই বলত, কই, শুধোলেন না যে ?

কি শুধোব ?

কোথা থেকে আসছি ? কি ব্যাপার ? এত খুশী ক্যানে ?

সে তো বুঝতে পারছি। মেলায় গিয়েছিলে। খুব কবিগান করেছ ?

"রসিকের কথা রসিকে জানে, বংশী বাজে বৃন্দাবনে", খুব গাওনা— বুঝলেন প্রভু, নিদারুণ বেপার। দু'দিকে দুই পেলয় কবিয়াল। সে

একেবারে কর্ণ-অর্জুনে বাণ-কাটাকাটি। তারমধ্যে আমি, বুঝলেন কিনা, খাণ্ডব অরণ্যের দহনকালে বাঁচা নাগের মত কর্ণের বাণের মুখে বসে অর্জুনের মুকুট কেটে দিয়েছি। ছিষ্টিধরের মুকুট ধূলোয় প'ড়ে গিয়েছে।

তারপরই সে আরম্ভ করতো বিবরণ, "নিদারুণ যুদ্ধকাণ্ড, সুতরাং সে প্রকাণ্ড—আদি আছে, অন্ত নাই যেন।"

শেষ কোনদিনই হ'ত না। আমরা এসে পৌছে যেতাম স্টেশনে চায়ের ষ্টলওয়ালার নাম একটা আছে, কিন্তু সে আজও পর্যন্ত আমাদের ওখানে বেনে-মামা বা বণিক মাতুল নামেই পরিচিত। স্টলে বসে থাকতো আমার বাল্যবন্ধু বাতে প্রায় পঙ্গু দ্বিজপদ, 'কবি' বইয়ের সেই দ্বিজপদ। তার শেষ জীবনের নিখুঁত বিবরণই দিয়েছি 'কবি' বইয়ের মধ্যে। আমার জীবনে আমি প্রথম কবিতা লিখে ছাপিয়ে দিলাম শারদীয়া পুজা উপলক্ষ্যে, তখন আমার বয়েস আট, দ্বিজপদ কয়েকমাসের ছোটো আমার থেকে। সেই সময়ে কারুর শিক্ষায় হোক বা নিজের শক্তির গুণেই হোক 'কবিকে' কপি বলে সম্বোধন ক'রে কয়েকটা কপিপাতা কাঁচাই কচ্ কচ্ করে চিবিয়ে খেয়ে বলেছিল, খেয়েনিলাম। পরিণত বয়সে দ্বিজপদ এই রসিকতাটা ভুলতে পারেনি বা নতুন রসিকতা আবিষ্কার করতে পারেনি—এই হেতু সতীশকেও সে বলতো—কপিবর।

মধ্যে মধ্যে ঘুঁটে ছেঁদা ক'রে একফালি দড়ি পরিয়ে সতীশকে, উপহার দিত—নে, মেডেল।

অথচ সে সতীশকে স্নেহ করত। কিন্তু এই রসিকতাটুকু এত মর্মান্তিক ছিল সতীশের পক্ষে যে, সে আদৌ সহ্য করতে পারত না। তাই চুপ ক'রে যেত। এরই মধ্যে রাজা পয়েন্টসম্যান এসে দাঁড়াত। বলতো, এই যে, ফিরছে! কেমন গাওনা হ'ল?

রাজার নাম রাজা মিয়া, সে জাতিতে মুসলমান এবং হিন্দীও সে বলে না, যুদ্ধেও যায় নি, মেজাজেও মিলিটারী নয়—ওটুকু আমার চড়ানো পোষাক বা রঙ যাই হোক না কেন। ঠাকুরঝি রাজার শ্যালিকা নয়, সতীশের সঙ্গে তার প্রেমও হয়নি। তবে ঠাকুরঝির অস্তিত্ব আছে। গ্রামান্তরের রুইদাস-বংশের মেয়ে, ছোটখাটো চির কিশোরীর মত গঠন, চোখে ভীরু চঞ্চল হরিণীর দৃষ্টি, তাঁতে-বোনা খাটো কাপড়খানি আট-সাঁট ক'রে বেঁধে মাথায় দুধের ঘটি নিয়ে এ গ্রামে দুধের যোগান দিত। আসতো ঐ রেললাইন ধ'রে। সে দিত বেনে-মামার দোকানে দুধের যোগান। সতীশও তার কাছে এক পোয়া হিসেবে দুধ নিত। খুব দ্রুত কথা বলত, সে সবের পিছনেই যেন একটা সরল—শঙ্কাত্রস্ততা ছিল। দু'কথা চারকথার

পরেই বলত, ঠাকুরঝি বকবে যে ; অথবা ঠাকুরঝিকে না শুধিয়ে পারব। তা, দাঁড়াও, বাপু, ঠাকুরঝি আসুক। নয়ত ঐ ঠাকুরঝি আসছে, লাও বাপু, শিগগীর দুধ লিয়ে লাও ; ঠাকুরঝি বকবে।

ওই কারণেই মেয়েটির আসল নাম চাকা প'ড়ে গিয়ে নাম হয়ে গিয়েছিল ঠাকুরঝি। বেনে-মামা বলত, ওই ঠাকুরঝি এসে গিয়েছে।

সতীশ বলত, ঠাকুরঝি !

কি বলছ ? মেয়েটি ওই নামে সাড়া দিতে কোন আপত্তি করত না।

আমাকে আজ একপো দুধ বেশী দেবে ?

তা লাও।

এমন সে মেয়েটি। মধ্যে মধ্যে সতীশ তাঁর সঙ্গে রসাল করতো, সে আমি শুনেছি অন্তরাল থেকে। আমি স্টেশনে গিয়েছি দুপুরবেলা, চা খাব বেনে-মামার দোকানে, কিন্তু দুধ নেই। ফুরিয়েছে। ঠাকুরঝি দুধ আনবে সেই অপেক্ষা। বেনে-মামা স্টেশনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে প্লাটফর্মের ওপর, সতীশ এগিয়ে শান্টিং পয়েন্টে দাঁড়িয়ে আছে, রোদ-ঝকঝকে লাইনের ওপর, লাইনটা আর মাইলটাক গিয়ে, একেবারে পূর্ব থেকে মোড় ফিরে বেঁকে গিয়েছে ; যেখানটায় দু'টো লাইন মিলে গিয়েছে একটা বিন্দুতে, সেইখানে সকলের দৃষ্টি হঠাৎ সেই বিন্দুর উপর থেকে রৌদ্র প্রতিফলিত দুধের ঘটির ছ'টা সকলের চোখে পড়ত। ছটা বিন্দুটি চঞ্চল-চলমান, তার নীচে দেখা যেত ক্ষারে-কাচা কাপড়ে আবৃত ক্ষীণ তনুমহিমা। মনে হ'ত স্বর্ণ-শীর্ষবিন্দু কাশফুল একটা। ঠাকুরঝি ক্রমে-ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠত। শান্টিং পয়েন্টের ধারেই একটা কৃষ্ণচূড়ার গাছও আছে, তারও গোড়াটা বাঁধানো, চারিপাশে তার জয়ন্তী কস্তুরী ফুলের জঙ্গল, আমি সেইখানে ব'সে কি শুয়ে থাকতাম। সেখান থেকেই শুনতে পেতাম, সতীশ তার সঙ্গে রসিকতা করছে।

বাবা রে বাবা, হাসতে পারলে—

দ্রুত উচ্চারণে খর-খর কথায় উত্তর দিত ঠাকুরঝি—ঠাকুরঝি ভিনগাঁ যেয়েছেন। এল তা-পরেতে এলাম কিনা !

আর আমাদের চোখ ক্ষয়ে গেল পথের পানে চেয়ে।

ঠাকুরঝি রসিকতার ধার দিয়েও যেত না, সরলভাবে সহজ বিস্ময় প্রকাশ ক'রে বলত, চায়ের নেশা বেজায় নেশা, লয় ? তারপরই বলত, বেনে-মামা বকবে, লয় ?

এই ঠাকুরঝি। এই চরিত্র ক'টিকে নিয়েই 'কবি' গল্পের সৃষ্টি। 'প্রবাসীতে' যখন গল্প হিসাবে বের হয়, তখন ঝুমুর দলের নামগন্ধ ছিল না।

শেষটায় ঠাকুরঝির অসুখের সংবাদ পেয়ে নিজের প্রতি তার আকর্ষণ অনুমান করেই নিতাই চ'লে গেল—এই ছিল সমাপ্তি। পরে শেষ অংশ যোগ করার পরিকল্পনা মনের মধ্যে জেগেছিল। সে প্রায় মাস ছ'য়েক পরের কথা। 'কবি' গল্পটির সঙ্গে শেষাংশ যোগ ক'রে উপন্যাসাকারে লেখা স্থির ক'রে লিখে যাই।

বাংলা দেশের বিশেষ ক'রে রাঢ় অঞ্চলের মেলায় ঘুরে ঘুরে নিম্নস্তরের দেহ-পণ্যাদের নিদারুণ দুর্দশা আমি দেখেছি। এদের অধিকাংশই অবশ্য প্রেমে ছলনায় ভুলে গৃহত্যাগ ক'রে এই পাপ-পঙ্কিল চোরাবালিতে এসে প'ড়ে তিলে-তিলে ডুবে ম'রে যায়। এরাও তখন উন্মত্ত। তাদের মন-দেহ অসাড় দুঃখবোধ, লজ্জাবোধ এ সবই নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এই পঙ্কিল জল আকণ্ঠ পান না করলে তখন আর এদের তৃষ্ণা নিবারণই হয় না। তবুও মানবাত্মার এই অপমান অসহ্য। হতভাগিনীদের উপায় নেই, পথ নেই। তারা স্বাধীন নয়, বন্দীদের চেয়েও পরাধীন, ক্রীত-দাসীর মত অবস্থা। এদের দশজন-পাঁচজন-পনেরোজনের মাথায় আছে এক-একজন মাসীশ্রেণীর মালিক। তারাই এদের নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, অভাবে-অভিযোগে দেখে, পুলিশে ধরলে জামিন হয়, মারামারি হ'লে রক্ষা করবার চেষ্টা করে এবং উপার্জনের বোধ হয় বিশেষ একটা অংশ গ্রহণ করে। মাসীদের কোন কথায় এদের 'না' বলবার কোন উপায় নেই।

মেলার পর মেলা ঘুরেছি, তথ্য সংগ্রহ করেছি। দেখেছি। ঝুমুর দলের মেয়েরা এ থেকে কিছু স্বতন্ত্র। ওই নিছক দেহ-পণ্যাদের অস্তিত্ব তো অনেক পরে জেনেছি। কিন্তু ঝুমুর দেখে আসছি বাল্যবয়স থেকে। আমাদের বা কাছাকাছি গ্রামে মেলায় এই সব দেহ-পণ্যাদের প্রবেশ করতে দেওয়া হ'তো না। কিন্তু ঝুমুর আসতো। ঝুমুর না হ'লে মেলা হয় না। কবিও হয় না। সে ওই দোয়ারকির জন্যে। ঝুমুর দলের মেয়েরা কবিগানে দোয়ারকি করত ও নাচত। আমাদের বাল্য-বয়সে এই কারণে কবিগান শোনা নিষিদ্ধ ছিল এবং সন্ধ্যের পর এক যাত্রা বা থিয়েটারের আসরে অভিভাবক ছাড়া থাকতে পেতাম না। এ ছাড়া শুনতে পেতাম নানান ধরনের গুজব, বিশেষ ক'রে যুবক সম্প্রদায় সম্পর্কে। প্রথম কথাটা আমার মনে আছে। আমার তখন বয়স ন'-দশ। আমাদের পাশের এক গ্রামে শেষ নাগ পঞ্চমীতে মনসার মেলা হয়। সেই মেলার সময় হঠাৎ গ্রামময়—এক ধনী সন্তান, তিনি এখন স্বর্গত, তিনি তখন নতুন ক্যামেরা কিনেছেন। সেই ক্যামেরা

দিয়ে নাকি তিনি ঝুমুর দলের ছবি তুলেছেন। লুকিয়ে দেখতে গেলাম ঝুমুর দল। মেলার প্রান্তে খড়ে-ছাওয়া কুঁড়েতে তাদের বাসা। বাইরে গাছতলায় উনান গ'ড়ে ভাত রান্না হচ্ছে। মেয়েরা সেজেগুজে বসে আসে। মুখে হাস্য, চোখে ইঙ্গিত, প্রতিটি অঙ্গ সঞ্চালনে লাস্য বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

বড় হলাম। ঝুমুর নাচ দেখলাম। ভদ্র আসরে দেখলাম। তখন সে খেমটা নাচের অনুকরণ। ভদ্রজনেরা চলে গেল—সে আসরে এবং যেখানে ভদ্রজনেরা যান না—সে আসরেও দেখলাম, তখন সে কুৎসিৎ কদর্য তাণ্ডব; একজন একটা দোয়ানি দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরলে, একটা মেয়ে নাচতে নাচতে এসে দাঁত দিয়ে কামড়ে টেনে ছাড়িয়ে নিয়ে গেল। হঠাৎ একদিন এদের দলের নেত্রীকে এবং একটি মেয়েকে আমি খুব কাছ থেকে দেখলাম। এমন একটা অবস্থার মধ্যে তাদের জানলাম, যে, তাদের আর তখন বাইরের ছলনার আবরণটা ধ'রে রাখবার সামর্থ্য নেই।

আমাদের গ্রামে স্টেশনের ধারে কোন মেলা ফেরত একদল ঝুমুর এসে নামল। বড় বটতলায় ঘর পাতলে। তাদেরই একটি মেয়ের হ'ল কলেরা। এই মেয়েটির নামই বসন। এককালে সুশ্রী ছিল, শীর্ণকায়া, দীর্ঘাঙ্গী, গৌরবর্ণ রঙ, বড়-বড় উগ্রদৃষ্টি দুটি চোখ, মাথায় অপর্যাপ্ত চুল। দেহটা দেখে মনে হয়, কোন রক্তপায়ী সরীসৃপ নিঃশেষে ওর দেহের শুধু রক্তই নয়—সারাংশও টেনে নিয়েছে। আমি তখন কলেরায় ম্যালেরিয়ায় সেবা করে বেড়াই, আগুন লাগলে বালতি নিয়ে ছুটি দুর্ভিক্ষের চাল কাপড় সংগ্রহ ক'রে বেড়াই, কলেরার ওষুধ আমার কাছে আছে। ক্যালোমেল $\frac{1}{6}$ গ্রেণ আর সোডিবাইকার্ব পাউডার। কেওলিন আছে। রেক্টাল স্যালাইনের গ্লাস ও রবার টিউব রাখি। দিতেও পারি। কিছু প্রতিষেধক রাখি। যাদের, হয়নি ইনজেকশন দি। কোথাও কারো কলেরা হ'লে খবর আগেই আসে আমার কাছে। কাজেই খবরটা এলো। গেলাম। দলটির মুখ শুকিয়ে গেছে। সকলে দূ'রে দূ'রে ব'সে আছে, মেয়েটি ছট্‌ফট্‌ করছে—জল আর জল শব্দ। কাছেই অদূরে ব'সে আছে মাসী। আর একটি পুরুষ, যে বসনের ভালবাসার জন, মদও রয়েছে দেখলাম। যথাসাধ্য ক'রে এলাম।

এটা সকালবেলার কথা। ওই সময়েই বসনের অস্থিরতা দেখে মাসী বলেছিল, ভগবানকে ডাক্ বউ, ভগবানকে ডাক্। সে বলেছিল, না।

এই সময়টুকুর মধ্যেই এ-কথা সে-কথার মধ্যেই ওই কথাটিও শুনেছিলাম—বসন ম'লে তার ওয়ারিশ হবে ওই মাসী। বলেছিল, আমার নেকন দেখনা।

বিকেলবেলায় ওদের ওই বসনের ভালবাসার মানুষটি এসে খবর দিলে একটুকুন ভাল আছে। একবার যদি আসেন।

এদিকে, অর্থাৎ রোগী ভাল থাকার সংবাদ এলে উৎসাহ এবং আকর্ষণ দ্বিগুণ ওঠে। উৎসাহিত হয়েই গেলাম। তখন দেখলাম, ওরা একটু আশ্রয়স্থল পেয়েছে। স্টেশনের পাশেই সে সময়ে আমাদের শম্ভুকাকার আশ্রয় ছিল। শম্ভুকাকা কানে খাটো, সে-আমাদের তান্ত্রিক লোক, কারণ করেন, গাঁজা খান, পৃথিবীর কোন কিছুকেই ভয় করেন না, যত ক্রোধ, তত কোমলতা। তিনি ওদের অবস্থা দেখে ডেকে ওই ঘরে ঠাঁই দিয়েছেন—থাক এইখানে।

গিয়ে দেখলাম মেয়েটি ঘুমুচ্ছে। যেতেই মাসী তাকে ডাকলে, বসন!

আমি বারণ করবার আগেই সে ডেকেছিল, মেয়েটি ক্লান্ত চোখ মেলে চাইলে। প্রাণের আবেগে হাত বাড়িয়ে আমার পা খুঁজলে।

আমি বললাম, থাক।

তার ঠোঁট দুটি কাঁপলো, বললে, আপনি না, থাকলে ম'রে যেতাম বাবু, এরা হয়ত জান্তোই ফেলে পালাতো পারতে, আমাকে শেয়াল-কুকুরে ছিঁড়ে খেয়ে নিত।

কথাটা তার আদৌ মিথ্যে নয়। মুহূর্তে আমার মনে প'ড়ে গেল—পর-পর কয়েকটা ছবি। একটী আছে 'ধাত্রীদেবতায়'। কলেরায় সেবা করতে নেমেছি সেই প্রথমবার।' ফ্যালা ডোম কলেরায় মরেছে, তার স্ত্রীর কলেরা হয়েছে, বাড়ীর বাকী লোকেরা পালিয়েছে। মেয়েটা 'জল-জল ক'রে অস্থিরতার মধ্যে দাওয়ার উপর থেকে গড়িয়ে নীচে উঠোনে প'ড়ে গেছে। বাড়ীর পাঁচিলের ওপর শকুন বসে আছে তার দিকে চেয়ে।

আর একবার আমাদের পাড়ার মধ্যে এসে বাসা নিয়েছিল কোথাকার একটি রামায়ণের দল। তাদের একজনের কলেরা হ'ল। সন্ধ্যের পর গোপনে তাকে ফেলে পালালো দলের সবাই। সকালে দেখা গেল, আক্রান্ত লোকটি ম'রে প'ড়ে আছে, তার বুকের খানিকটা শেয়ালে খেয়ে নিয়েছে। মৃত্যু তার কলেরায় হয়নি। হয়তো সে মরতো। কিন্তু তার পূর্বেই তাকে একা পেয়েই জীয়ন্তেই ছিঁড়ে খেয়েছে শেয়ালে। এমন করবার কারণ অনেক দেখেছি। সুতরাং এদের মধ্যে এমন ঘটবে তার আশ্চর্য কি?

মনে পড়ছে, ঠিক এমনি সময়েই ঘরে বাইরে মাসীর কণ্ঠস্বর শুনেছিলাম, ওই—ওই, পলাইছ ক্যানে? ও লোকেরা, ও বাবারা! এস, এস! কলেরা নয়। সে ভাল আছে। ওগো! তারপরই শুনলাম, অ! বাবু রইছে!

অর্থাৎ আমাকে ব'সে থাকতে দেখে কারা পালিয়ে গেল। বুঝতে বিলম্ব হ'ল না, কেন তারা এসেছিল। এদের এই জীবন। ক্রমে এই জীবন সম্পর্কে আরও অনেক কথা জানলাম। জেনে বিস্ময়ের আর অবধি রইল না। হে ভগবান, এমনও হয়!

পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্নের কাছে এদের মূল ইতিহাস জানলাম।

ঝুমুর দল অনেক স্থানেই আছে। কিন্তু বীরভূমের মল্লারপুরের ঝুমুর দল সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। এখানে ওরা বংশানুক্রমিকভাবে বাস করছে। ঝুমুর দলের মেয়ে ঝুমুর দলে নাচে—তার মেয়ে, তার মেয়ে নেচে আসছে। গেয়ে আসছে। এরা পদাবলী জানে, খেউড়ি জানে। আবার আধুনিক খেমটা টপ্পাও জানে। মল্লারপুরে ঝুমুর দলের একটি পাড়াই আছে। আজকাল হয়তো লুপ্ত হয়ে গেল বা গেছে। পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন আবিষ্কার করেছেন, এককালে মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পরবর্তীকালে পূর্ববঙ্গে তখন বৈষ্ণব ধর্ম ও কীর্তনের সমাদর বেশী, সেইকালে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বহু কীর্তনীয়ার দল ছোট-বড় ভালমন্দ নির্বিশেষে ওই অঞ্চলে যেত এবং যথেষ্ট উপার্জন করে দেশে ফিরত। এই ছোট বড়দের মধ্যে ছোটরা শেষ প্রসার ও সমাদরের জন্য দলের মধ্যে গায়িকা গ্রহণ করে। ক্রমে গায়িকারাই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। তার থেকে ক্রমে নাচ, তারপর আদিরসাশ্রিত গানের প্রচলন হয়। তারপর হিন্দু-মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জনের জন্য ধর্ম বাদ দিয়ে নিছক নাচগানের দলের পরিণতিতে পৌছল। ফোঁটা তিলক মালা ফেলে কেশবিন্যাস হ'ল স্বৈরিণীর উপযোগী গায়ে উঠল পিতলের গহনা—চুড়ি, বালা, বাওটা, বাজুবন্ধ, চিকহার, কানে কান কপালে ঝাপটা। পায়ের নূপুর ঘুচে উঠল ঘুঙুর। তবু আজও এরা গৌরচন্দ্রিকা অর্থাৎ মহাপ্রভুর বন্দনা না ক'রে গান শুরু ক'রে এই সমস্ত কিছু জড়িয়ে আমার মনের মধ্যে এরা না। একটি অদ্ভুত আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। তাই নিতাইয়ের কবিয়ালির সঙ্গে বসনের কথা জুড়ে দিয়েছিলাম।

'কবি'র এই ইতিহাস। 'কবি'র গানগুলি কিন্তু সংগ্রহ নয়। ওগুলি সবই আমি রচনা করেছি। কি ভাবে করেছি আমি বলতে পারি না। মোহিতলাল 'কবি' সম্পর্কে লিখতে গিয়ে গানগুলির কথাই আগে বলছেন। বলেছেন, এই গানগুলিই কবির প্রাণশক্তি। আমি সে সময় নিতাইয়ের মতই ভাবতে পেরেছিলাম।

"কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কান্দো ক্যানে।"—এই লাইনের সঙ্গে অনেক লাইন বেঁধেছি—"কালো চোখের তারায় এমন তবে হাসে ক্যানে?" "কালাচাঁদের কোলের লাগি সোনার রাধা কাঁদে ক্যানে?" অনেক লাইন। কিন্তু কেটে দিয়েছি, ও নিতাইয়ের রচনা হয়নি।

বিরজুর মা

বনফুল

মনিহারি গ্রামের বিরজুর মা'কে মনিহারী গ্রামবাসীদের এখন মনে আছে কিনা জানি না, কেননা মানুষের স্মৃতি বড় ক্ষণজীবী। স্বার্থের সম্পর্ক যাহার সহিত যতক্ষণ থাকে, মানুষ তাহাকে ততক্ষণ মনে রাখে। স্বার্থের সম্পর্ক ফুরাইলেই মানুষ ভুলিয়া যায়, ইহাই নিয়ম।

বিরজুর মা আমাদের বাড়ীতে যখন আসিতো, তখন আমার বয়স পাঁচ-ছয় বৎসরের বেশী নয়। সে ছিল গয়লানী। বাড়ী বাড়ী দুধ দিয়া বেড়াইত। সারা গ্রামে দুধ দিয়া বেড়াইত সে। যখনই আসিত, সঙ্গে একটা না একটা ছেলে বা মেয়ে থাকিত। কখনও কালো, কখনও ফর্সা, কখনও বেঁটে, কখনও লম্বা। কারো নাকে সিক্নি, কারো চোখে পিঁচুটি, কারো মাথায় তেল নেই, কারো মুখের কোণে ঘা। সব বিরজুর মা'র ছেলে-মেয়ে। আমার মায়ের স্বভাব ছিল, ছেলে-মেয়েদের অসুখ তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না। আমার বাবা ডাক্তার ছিলেন, মা বিরজুর মায়ের ছেলে-মেয়েদের কোনো না কোনো ব্যবস্থা করিয়ে দিতেন।

আমাদের বাড়িতেই অনেক দুধ হইত। বাহির হইতে দুধ কিনবার দরকার ছিল না। তবু বিরজুর মা একপোয়া দুধ আমাদের বাড়িয়ে দিতো। মা বলিতেন, তোর কালো গাইয়ের দুধ দিয়ে যাস্ একপোয়া করে। মায়ের বোধহয় আর-একটা উদ্দেশ্য ছিল। বিরজুর মা আমাদের বাড়িতে ঘুঁটে ঠুকিয়ে দিতো। তাহার সহিত যে ছেলে বা মেয়ে আসিত তাহারাও ঠুকিত।

বিরজুর মা'র চেহারা আমার বেশ মনে আছে। সে বেঁটে লোক ছিল। ঘাড়টা ডানদিকে একটু হেলিয়া থাকিত। কালো রং ছিল। একটা চোখে তারার মাঝখানে সাদা দাগ ছিল একটা। কোনো কালে ঘা হইয়াছিল হয়তো। বিরজুর মা'য়ের কিন্তু আর-একটা যে বৈশিষ্ট্য ছিল তাহা সচরাচর দেখা যায় না। তাহার কণ্ঠস্বরে উদারা-মুদারা-তারা এই তিনটি গ্রামই সমানভাবে বাজিত। যখন যে গ্রামে ইচ্ছা সে কহিতে পারিত। যখন কাহাকেও সদুপদেশ দিত তখন তাহার কণ্ঠে বাজিত উদারা, সাধারণ কথাবার্তার সময় মুদারা, আর ঝগড়া করিবার সময় তারা। যখন চুপি-চুপি বসিয়া মায়ের কাছে পরনিন্দা করিত তখনও মনে হইতো, যেন তারায় তাহার কণ্ঠ বাজিতেছে।

মনে হইত, একটা ভ্রমর যেন দ্রুতছন্দে গুন্‌-গুন্‌ করিয়া চলিয়াছে।

বিরজুর মা'কে চিরকাল একরকমই দেখিয়াছি। তাহার বয়স কত হইতে পারে তাহা কোনদিন ভাবি নাই। মোটামুটি ধারণা ছিল, বিরজুর মা আমার মায়ের বয়সী হইবে। কিন্তু একদিন এমন একটা ঘটনা ঘটিল যে, আমার সে ধারণা বদলাইয়া গেল। বিরজুর মা একদিন ফিসফিস করিয়া মায়ের কাছে নালিশ করিল যে, তাহার বড় ব্যাটা হকুরু কাল তাহাকে মারিয়া তাহার রূপার মেঠিয়া (বালা) দুইটি ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছে। ডাক্তারবাবু (আমার বাবা) যেন তাহাকে ডাকিয়া একটু শাসন করিয়া দেন।

বাবা হক্‌রুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি হক্‌রুকে আগে দেখি নাই। তাহার চেহারা দেখিয়া ঘাবড়াইয়া গেলাম। তালগাছের মতো লম্বা, কালো আর ষণ্ডা মার্কা। শালপ্রাংশু-মহাভুজ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই বিরজুর মা'র ছেলে! অবাক হইয়া গেলাম। বাবা তাহাকে ধমকাইতে লাগিলেন। 'তুমি বিরজুর মা'কে মেরে তার মেঠিয়া নিয়ে গেছ কেন?'

হক্‌রু প্রথমেই নিজের নাক-কান মলিয়া ফেললো।

"ভগবান জানে হুজুর। আমি ওর মেঠিয়া কেড়ে নিইনি। ওই আমাকে বলেছিল গরু কেনবার সময় দেবে। কাল পোখমন সিং-এর বাচ্ছাটা কিনলাম, ও মেঠিয়া দেবে বলেছিল বলেই দর করেছিলাম, কিন্তু কেনবার সময় যখন চাইতে গেলাম তখন বললে, আমি চেঘুকে দিয়ে দিয়েছি। আমি তখন বাক্স খুলে দেখলাম। দেখি, রয়েছে মেঠিয়া। আমাকে মিছে কথা বলেছে। আমাকে মিছে কথা বলেছে। তখন আমি নিয়ে গেলাম। তখন আর না নিয়ে করি কি? পোখমন সিং-এর সঙ্গে কথা তখন পাকা হয়ে গেছে।"

বিরজুর মা কাছেই চোখে কাপড় দিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া বলিল, "ও আজকাল আমাকে মোটেই মানে না। ওর বৌয়ের কথাও চলে, আমার কথা একেবারেই শোনে না।"

বাবা ধমকাইয়া উঠিলেন—"এ কি কথা! মায়ের মনে কষ্ট দেওয়া! যাও, এক্ষুনি পায়ে ধরে মাপ চাও।"

হক্‌রু বাবার কথা অমান্য করিল না। তাহার লম্বা দেহ নত করিয়া বিরজুর মায়ের পায়ে হাত দিতে গেল। বিরজুর মা বোধহয় ইহাই চাহিতেছিল। কারণ সে যখন মুখ হইতে কাপড় সরাইল, দেখা গেল তাহার মুখ হাসিতে ভরিয়া গিয়াছে। "হয়েছে হয়েছে, আর পা ধরতে হবে না। বাবু যা বললে, তা মনে রেখো।"

মনে হইল, তাহার হাসির সঙ্গে যেন গর্বও মিশিয়াছে।

হক্রু চলিয়া গেল। বিরজুর মা আড়ঘোমটা টানিয়া বাবাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মেঠিয়া আমি ওকেই দিতাম। কিন্তু আমার কথা শোনে না কেন। দেখলাম, আমাকে লুকিয়ে বৌকে একখানা রঙিন শাড়ি কিনে দিয়েছে। এর মানে কি!"

বাবা ব্যাপারটা মিটাইয়া ফেলিবার জন্য সংক্ষেপে বলিলেন, "না, আর ওসব করবে না।"

বিরজুর মা ভিতরের দিকে চলিয়া গেল। মায়ের কাছে বসিয়া ভোমরার মতো গুন্‌গুন্‌ করিতে করিতে হক্রুর বৌয়ের নিন্দা করিতে লাগিল। বউটা নাকি অত্যন্ত পাজি। প্রায়ই লুকাইয়া বাপের বাড়ি চলিয়া যায়। হক্রু কাজকর্ম ছাড়িয়া তাহার পিছু-পিছু ছোটে। আর জিনিসপত্র ভাঙে কত! শুনিলে কেহ বিশ্বাস করিবে? মাসে দুই-তিনটা করিয়া হাঁড়ি ফেলে। কাপড়ে প্রায়ই খোঁচ লাগায়। মাথাটা যেন কাকের বাসা। তেল দেয় না। উহার বাবা নিমু গোয়ালাও নাকি ওইরকম লক্ষ্মীছাড়া ছিল। তাড়ি খাইয়া দিন-রাত পড়িয়া থাকিত। বিরজুর মা ওই মেয়ের সঙ্গে হক্রুর বিবাহ দিতে চাহে নাই। কিন্তু হক্রু নাছোড়া। মেয়েটার রং ফর্সা কিনা, আর যখন-তখন ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসে।

* * *

অনেকদিন পরে কথাটা আমার মনে হইয়াছিল। তখন আমার বয়স একটু বাড়িয়াছে। বিরজুর মা'কে জিজ্ঞাস করিয়াছিলাম, "আচ্ছা, সবাই তোমাকে বিরজুর মা বলে, কিন্তু তোমার ছেলে বিরজুকে তো একদিনও দেখিনি? সে কোথায়?"

"সে ম'রে গেছে খোকাবাবু! যে বছর গাঁয়ে 'কলেরা হয়েছিল, সেই বছর আমার বিরজু চলে গেছে। কি ভালো ছেলে যে ছিল!"

বিরজুর মায়ের কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া গেল। চোখের উদগত অশ্রু মুছিয়া বলিল, "সবই উপর-ওলার মর্জি খোকাবাবু!'

বিরজুর মা বেহারী, তাহার সহিত হিন্দীতেই কথাবার্তা হইত। কিন্তু সে-যে আমাদের পর, একথা কখনও মনে হয় নাই। তাহাকে নিজের লোক বলিয়াই জানিতাম। আমার জন্য সর, চাঁচি, মিঠাই পেয়ারা, কত কি যে লইয়া আসিত!

মাকে বলিত, "এও আমার আর এক ব্যাটা—"

পূজার সময় প্রতিবারই আমার জন্য একটা রঙিন 'কুর্তা' (জামা)

কিনিয়া আনিত। আমাকে সেটা নিজে হাতে পরাইয়া ঠাকুর দেখাইয়া আনিত। দেখিতাম, একপাল ছেলে-মেয়ে তাহার পিছু পিছু ঘুরিতেছে। সব বিরজুর মা'র ছেলেমেয়ে। মেলায় সে সকলকেই কিছু না কিছু কিনিয়া দিতো। আমাকেই কতবার মাটির পুতুল কিনিয়া দিয়াছে। কোনোবার গণেশ, কেনোবার মহাদেব, কোনোবার শ্রীকৃষ্ণ।

বিরজুর মা'র সম্বন্ধে আর-একটা স্মৃতিও মনের মধ্যে জাগিয়া আছে। তখন আমার বয়স বোধহয় বছর দশেক। ফাঁসিয়াতলায় আমাদের কিছু জমি ছিল। রোজই শুনিতাম, সেখানে নাকি খুব ভালো মটর হইয়াছে। সাধ হইলো, মাঠে বসিয়া গাছ হইতে ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া মটরশুঁটি খাইব। জানিতাম, বাবাকে কিম্বা মাকে বলিলে তাঁহারা রাজী হইবেন না। তাই একবার দুপুরে বাবা-মা ঘুমাইবার পর একা বাহির হইয়া পড়িলাম। বাহির তো হইয়া পড়িলাম, কিন্তু ফাঁসিয়াতলা কোনদিকে? রাস্তা জানা ছিল না। গ্রাম হইতে বাহির হইয়া মাঠে-মাঠে ঘুরিতে লাগিলাম। চারিদিক সবুজে সবুজ। শীতের রোদে চারিদিক ঝলমল করিতেছে। দুপুরবেলা, মাঠে বিশেষ কোনও লোক নাই অনেক দূরে টঙের উপর একটা পাহারাদার বসিয়া আছে। এমন একটা লোক পাইলাম না, যে আমাকে বলিয়া দেয় ফাঁসিয়াতলা যাইবার রাস্তা কোন্‌টা? আলের উপর দিয়া চলিতে চলিতে হঠাৎ একটা সরু পায়ে-চলা পথ পাইয়া গেলাম। দুইদিকে সবুজ, মাঝখানে একটা সরু ফিতার মতো পথ চলিয়া গিয়াছে। সেই রাস্তা ধরিয়া চলিতে লাগিলাম। কতক্ষণ চলিয়াছিলাম মনে নাই। চলিয়াছি তো চলিয়াছি। খাণিকক্ষণ পরে থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িতে হইল। দেখিলাম, প্রকাণ্ড একটা সবুজ বোঝা আমার দিকে আগাইয়া আসিতেছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বোঝার নীচে পা দুটোও দেখতে পেয়ে দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাহার পর দেখিলাম, পিছনে পিছনে একটি ছোট ছেলেও আসিতেছে। আমার কাছাকাছি আসিয়াই বোঝাটা থামিয়া গেল। বোঝার ভিতর হইতে বিরজুর মা কথা কহিয়া উঠিল—"একি খোকাবাবু। তুমি এখানে।

"আমি ফাঁসিয়াতলা যাব। রাস্তা কোন্‌দিকে বলে দাও তো?"

"আমি তো ফাঁসিয়াতলা থেকেই আসছি। সেখানে আমারও এক টুকরো জমি আছে। তুমি সেখানে যাচ্ছ কেন এই রোদে—"

"মটরশুঁটি খাব।"

"তার জন্যে অত দূরে যাবার দরকার কি। আমার বোঝাতেই তো মটরশুঁটি আছে। চল্, এই গাছতলায় বসবি চল্। এখানে বড় রোদ—"

দূরে একটা বটগাছ ছিল। বিরজুর মা সেইখানে আমাকে লইয়া গেল। গাছের তলায় বোঝাটা ফেলিয়া দিয়া পা ছড়াইয়া বসিল। তাহার পর সেই ছেলেটাকে বলিল, "মটরশুঁটি ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে দে তো খোকাবাবুকে।"

সেদিন সেই দিগন্ত-বিস্তৃত সবুজ মাঠের মাঝখানে বসিয়া বিরজুর মা'য়ের দেওয়া প্রচুর মটরশুঁটি খাইয়াছিলাম। এ স্মৃতিটি মনে সঞ্চয় হইয়া আছে। কিছুক্ষণ পরে বিরজুর মা বলিল, "আর খেতে হবে না। বেশী খেলে পেট ব্যথা করবে। মাইজি তখন বকবে আমাকে।"

"মাকে তুমি যেন বলে দিও না।"

"দেব না? আমাকে কি দেবে বলো?"

"আমি আবার কি দেব।" "একটা চুম্মা দেবে।"

হঠাৎ বুড়ি বিরজুর মা আমার গলা জড়াইয়া আমাকে চুম্বন করিল।

"তোমার সঙ্গে যাব।"

"আমি এখন বাড়ি যাব না। আমাকে এখন বাজারে যেতে হবে। এগুলো বেচবো না? আচ্ছা দাঁড়া, ব্যাবস্থা করে দিচ্ছি।"

সেই ছোট ছেলেটাকে বলিল "ওই ওদিককার ক্ষেতে রেশমি ঘাস কাটছে, তাকে ডেকে নিয়ে আয়।"

ছেলেটা ছুটিয়া চলিয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "রেশমি কে?"

"আমার বেটি।"

একটু পরে রেশমি আসিল। বয়স আমার চেয়ে অনেক বড়। ফর্সা একটি মেয়ে।

"খোকাবাবুকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আয়।"

"চল—" রেশমির সহিত বাড়ি ফিরিলাম।

বছর দশেক পরে বিরজুর মা'র যেদিন মৃত্যু হইল তখন আমাদের কলেজের ছুটি ছিল। দেখিলাম. বিরজুর মা'র শবের পিছনে গ্রামসুদ্ধ লোক চলিয়াছে। সব বয়সের লোক। একপাল ছেলে-মেয়ে। সকলে আকুলভাবে কাঁদিতেছে।

সেইদিনই সত্যটা জানিতে পারিলাম। বিরজুর মায়ের বিবাহ নাই। সে চিরকুমারী ছিল। বিরজুর বাবার সহিত তাহার বিবাহের সব ঠিক হইয়া শেষে বিবাহ ভাঙিয়া যায়। বিরজুর বাবার অন্যত্র বিবাহ হয়। তাহারই প্রথম সন্তান বিরজু। বিরজুর মা আর বিবাহ করিতে চাহে নাই। বিরজুর বাবা বিরজুকে তাহার কোলে তুলিয়া দিয়াছিল। তাই তাহার নাম বিরজুর মা। তাহার আসল নামটা সকলে ভুলিয়া গিয়াছিল। তাহার আসল নাম ছিল সোহাগ।

নাগরিকা

বিমল মিত্র

কলকাতা থেকে বেশী দূরে নয়। হাঁটা রাস্তায় মাইল-দশেক। প্রথমে পড়বে বাদামতলা। আর এই বাদামতলা থেকে আরো মাইল তিনেক দূরে রসুলপুর। এই বাদামতলার গল্পই বলবো আমি। আপনারা যদি কখনও এই বাদামতলায় যান, দেখবেন সামনেই এক ভাঙা মন্দির। মন্দিরের ইঁট-কাঠ ভেঙে পড়েছে এখন। তার পাশেই এক বিরাট বটগাছ। আর সেই বটগাছের তলাতেই এক শ্বেতপাথরে বাঁধানো ছোট একটা স্মৃতিস্তম্ভ। এমন কোনো বিখ্যাত লোকের স্মৃতিস্তম্ভ সেটা নয়। কোনও বড়লোকের স্মৃতিস্তম্ভও নয়। সামান্য একজন তেলেভাজাওয়ালা—পটুয়াখালির 'গোবিন্দ সরকার', তারই নাম-ধাম লেখা সামান্য একটু পরিচয় আর নীচে নাম লেখা আছে কোন এক কাঞ্চনকামিনী দেবীর।

আশেপাশের লোকদের জিজ্ঞেস করবেন, ও কাঞ্চনকামিনী কে?

ওরা বলবে, তা জানি না—

তারপর জিজ্ঞেস করবেন, গোবিন্দ কে?

ওরা বলবে, গোবিন্দ সরকার এই বটগাছের তলায় বসে তেলেভাজা ভাজতো, ফুলুরি ভাজতো—

তা সত্যিই গোবিন্দ সরকার তেলেভাজা ভাজতো বটে ওখানে। গোবিন্দ সরকারের বেগুনি, ফুলুরি, আলুর চপের নাম-ডাকও ছিল বেশ। দূর-দূর থেকে মোটরগাড়ি চালিয়ে গোবিন্দর তেলেভাজা খেতে আসতো সবাই ওখানে। কলকাতার বড়লোকের ছেলেরা ওর তেলেভাজার তারিফ করতো। রসুলপুরের বাগান-বাড়িতেও বাবুদের আড্ডায় এখান থেকে তেলেভাজা যেতো।

কিন্তু কাঞ্চনকামিনী? সেই কাঞ্চনকামিনীর গল্পই বলি এবার।

ওই বাদামতলাতেই আমি গোবিন্দ সরকারকে প্রথম দেখি। তখনও গোবিন্দ সরকার বেঁচে। বাদামতলার মোড়ে এসেই গাড়ি থেমে গেল। 'গঞ্জ' মতন একটা জায়গা। রাস্তার একপাশে কটা চালাঘর। সমস্ত রাত চালিয়ে এখানে এসে ভোর হলো। লোকজনের বিশেষ চিহ্ন নেই। মোড়ের মাথায় একটা বটগাছ। আশেপাশে চেয়ে দেখলাম।

দীনবন্ধু বললে—আগে এই বাদামতলায় প্রায়ই আসতাম—কিছু দিন আগেও একবার এখানে এসেছিলাম মনে হচ্ছে—

বললাম—এখন চা পাওয়া গেলে ভালো হতো ভাই—

দীনবন্ধু বললে—শুধু চা কেন, গরম তেলেভাজাও এখানে পাওয়া যায়।

কথাটা বলতে না বলতে নজরে পড়লো—বটগাছের তলায় একজন লোক এই ভোরেই তোলা উনুন নিয়ে বসে আছে। তখনও ভীড় জমেনি। পাশে কিছু চেলা কাঠ, বেগুনি ফুলুরির সরঞ্জাম। লোকটা একমনে তেলের কড়ায় খুন্তি নাড়ছে। গাড়িটা কাছে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে দীনবন্ধু ডাকলে—ওহে ও তেলেভাজাওয়ালা, কি যেন নামটা তোমার?

লোকটা মুখ তুলে বললে—আমার নাম গোবিন্দ সরকার আজ্ঞে।

* * *

মনে আছে, সেদিন গোবিন্দ সরকারের চোখটা দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। করমচার মত লাল টকটকে চোখ, একেবারে গাঁজাখোরদের মত। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া আগোছালো চুল, খোঁচা-খোঁচা দাড়ি গোঁফ। যতদূর মনে আছে, সেই চেহারা দেখেই আমার চা খাওয়ার নেশা চলে গিয়েছিল। বললাম—দরকার নেই চা খেয়ে, বল চল এর পর অন্য কোথাও খেলেই চলবে।

দীনবন্ধু জিজ্ঞেস করলে—গরম আলুর চপ হবে হে?

গোবিন্দ বললে—হবে আজ্ঞে।

অল্প-স্বল্প শীত পড়েছে। সারা জায়গাটা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। মাথার ওপর বটগাছের ডালপালার আচ্ছাদন আর দূরে কয়েকটা ডোবা, আবছা, ছাড়া-ছাড়া বাড়িঘর, আর তার ওপাশে ধান ক্ষেত। কলকাতা থেকে মোটরে আসার পথে প্রথম বিশ্রামের জায়গা এই বাদামতলা। যারা হাঁটা-পথে আসে, যারা সাইকেল চড়ে আসে, তারা অনেক পরিশ্রমের পর এইখানে এসে প্রথম একটু জিরিয়ে নেয়। কোঁচার খুঁটে ঘাম মুছে বটগাছের তলায় মাচাটায় একটু বসে। নন্তা ময়রার দোকান থেকে এক পয়সার বাতাসা কিনে এক ঘটি জল চেয়ে খায়। তারপর ঘাম-টাম শুকোলে আবার সাইকেলে উঠে চলতে শুরু করে। যারা চণ্ডী ঘোষের ইট-খোলার কাজ করে তারা এই বটগাছতলায় এসে যে-যার পোঁটলা খুলে ছাতু ভিজোয়। খোরাকির ফাঁকে কিছুটা গড়িয়ে নেয় গামছা পেতে। আর যেদিন কুলুইচণ্ডীর মেলার সময় যাত্রাগান হয়, সেদিন আশেপাশের দশ-বারোটা গ্রামের লোক এই বাদামতলায় বটগাছের তলায় এসে জড়ো হয়। সারাদিন উপোস করে মায়ের পুজো দিয়ে

পেসাদ নিয়ে ডোবা থেকে জল খায়, আর নন্তা ময়রার দোকানের পাটায় বসে চিঁড়ে মুড়কি আর টোকো দই দিয়ে ফলার মাখে। তারপর সমস্ত রাতভোর বদন অধিকারীর পালাগান শুনে সকালবেলা যে-যার গাঁয়ে চলে যায়।

তা বাদামতলা এখন আর সেই বাদামতলা নেই। এ এককালে নাকি ছিল এদিককার বড় গঞ্জ। গঙ্গা তখন এই নন্তা ময়রার দোকানের কোল ঘেঁষে রসুলপুরের ইস্কুলবাড়ির ওপর দিয়ে একেবারে মাতলার মোহনায় গিয়ে মিশতো। সে-সব এখন আর চেনা যায় না। নীচু খাদ মতন যা ছিল তার ওপরেই চণ্ডীঘোষের ইঁটখোলা হয়েছে, কটাই সান্যালের পটলের ক্ষেত হয়েছে। এখন শ্রাবণ ভাদ্র মাসে করুণাময়ীর ঘাটের জল বেড়ে যখন বান আসে, তখন জল ওঠে এদিকে। এই বটতলা বরাবর জল জমে। তারপর যেদিন পীচের রাস্তা—একেবারে মাতলা পর্যন্ত বড় বড় বাগানবাড়ী হলো কলকাতার বড়লোকদের, তখন থেকে এদিকে জল আর তেমন জমে না বটে, কিন্তু এখানকার লোকদের মাছ ধরার সুবিধে হয়। দু'দিকে দু'জন গামছা ধরলে বড় বড় চিংড়ি ধরা পড়ে। পুকুরে আর মাছ ছাড়তে হয় না। বাদামতলার লোকজন তখন সে ক'দিন পেট ভরে মাছ খেতে পায়। দীনবন্ধু এক্ষণে একটা সিগ্রেট ধরালে। বললে—দু'কাপ চা-ও করে দিতে হবে গোবিন্দ, অনেক দূর থেকে আসছি আমরা।

গোবিন্দ সরকার পুরোনো লোক। সে জানে, কলকাতারবাবুরা গোবিন্দর তেলেভাজা খেতে এই এতদূরে এসেছে এককালে। কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকার তেল পুড়িয়ে গাড়ি চালিয়ে এসেছে এই বাদামতলায়। এসে এই রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে গরম বেগুনি ফুলুরি খেয়েছে। আর কি শুধু বাবুরা? সঙ্গে মা-জননীরাও আসতো। তেনারা তেলেভাজা খেয়ে কত আশীর্বাদ করে গেছে গোবিন্দকে। রসুলপুরের বাগান-বাড়ি যাবার এইটেই তো একমাত্র পথ। ওই কলকাতা থেকে ভোর-ভোর বেরিয়ে আলো ফুটতে-না-ফুটতে এই বাদামতলায় এসে একবার চায়ের তেষ্টা পেতো। আর চায়ের সঙ্গে গরম গরম তেলেভাজা। বেগুনি, ফুলুরি, পেঁয়াজবড়া—গোবিন্দ হাতা-খুন্তি নাড়তে নাড়তে বলতো—পেঁয়াজবড়া খাবেন না দাদাবাবুরা?

—পেঁয়াজি? বেশ বেশ—তা বেশ কড়া করে ভাজা চাই কিন্তু—

গাড়ির মধ্যে মা জননীরাও থাকতো। গাড়ি ভর্তি। সিল্কি শাড়িপরা। আর কি সব গয়না। গয়নায় মোড়া দেহ। আর কি সব রূপ মা-জননীদের! চক্ষু জুড়িয়ে যায় দেখতে। কলকাতার লোক সব, কথাবার্তাও তেমনি। এক টাকার নোট দিয়ে ভাঙানি নিতো না

দাদাবাবুরা। বলতো—ও আর তোমায় ফেরত দিতে হবে না গোবিন্দ—তোমার বকশিস ওটা।

একজন বলতো—তেল তোমার খাঁটি তো?

গোবিন্দ জিভ কেটে বলতো—কি যে বলেন মা-জননী, আপনাদের চরণের দাস বলে কি নরকের ভয়ও নেই আজ্ঞে?

আর একজন সাবধান করে দেয়—দেখো, গোবিন্দ, ফি শনিবারে আসছি, যদি পেট খারাপ হয় তো, তোমাকে পুলিশে দেবো বলে দিচ্ছি!

তাতেও গোবিন্দ রাগে না। বলে—কি যে বলেন মা, পেটের দায়ে দোকান করেছি বলে কি অধম্মো করতে পারি?

তারপর তেলেভাজা চা খেয়ে, টাকা দিয়ে বাবুরা হাওয়া-গাড়ি চালিয়ে হুস্-স্ করে চলে যেত রসুলপুরের দিকে। রসুলপুরেই সব বাবুদের বাগান-বাড়ি। কানন-কুঞ্জ, মহারাজ মঞ্জিল—নানা রকম নাম। কয়েক বিঘে জমি নিয়ে এক-একটা বাগান-বাড়ি। মালিকরা সদলবলে আসে সপ্তাহে একদিন কি বড়জোর মাসে দু'দিন। তবু তার জন্যে মালী আছে, খানসামা আছে। মেথর, বাবুর্চি, আলো, পাখি, গরু, বাছুর সব মোতায়েন থাকে। নতুন আসে যারা, তারা জিজ্ঞেস করে—হাওয়া-গাড়িগুলো কোথায় যাচ্ছে রে বুধো?

বুধো বলে—সব রসুলপুরের বাগান-বাড়িতে।

সকালবেলা উঠেই গোবিন্দ উনুন কড়া নিয়ে ভাজতে বসে। বিশেষ করে শনি-রবিবারে। বাবুরা এক-একদিন দু'টাকা তিন টাকার কেনে। কেউ কেউ ঠোঙা নিয়ে খেতে খেতে বাড়ি যায়।

দীনবন্ধু বললে—এ গোবিন্দ কি আজকের লোক? আগে কলকাতা থেকে তেলেভাজা খেতে এই বাদামতলায় এসেছি। এখন লোকটা বুড়ো হয়ে গেছে।

কিন্তু বেগুনি ও আলুর চপগুলো দেখে কেমন অভক্তি হলো। দীনবন্ধু মুখে দিতে যাচ্ছে, এমন সময় হৈ হৈ করতে করতে ওদিক থেকে একজন দৌড়ে এসে বললে—বাবুমশাই, খাবেন না, খাবেন না—

হঠাৎ কি যে হলো, মুখে তুলতে গিয়েও থেমে গেলাম। নন্তা ময়রার দোকানের দিক থেকেই দৌড়ে এল লোকটা।

দীনবন্ধু বললে—কেন? কি হয়েছে?

ক্রমে আরো কয়েকজন লোক তখন এসে জুটেছে সামনে। ভালো করে সকাল হয়েছে। সেদিন সেই সকালবেলাতেই বাদামতলায় গোবিন্দ সরকারের দিকে আবার চেয়ে দেখলাম। লোকটা তখনও

নির্বিকার। আপন মনেই কড়ার ওপর খুন্তি নেড়ে চলেছে। সত্যিই তখন তাকে দেখতে ভয় লাগলো। লাল করমচার মতো চোখে আমাদের দিকে চেয়ে নিজের মনেই আবার কাজ করতে লাগলো।

দীনবন্ধু হাতের ঠোঙাটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। বেগুনি, আলুর চপগুলো মাটিতে পড়তেই কোথা থেকে কাকের দল এসে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গেল সব। নন্তা ময়রা বললে—কি সর্ব্বোনাশ হতো বলুন দিকিন—কেউ আর খায় না, যাকে দেখি তাকেই বারণ করে দেই। একজন বাবু তো বমি করেই অস্থির, শেষে—

আর একজন বললে—চেহারা দেখে বুঝতে পারছেন না বাবু, ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

দীনবন্ধু বললে—তা তোমরা ওকে ভাজতে দাও কেন? উঠিয়ে দিতে পারো না?

নন্তা ময়রা বললে—শোনো না বাবুমশাই, উঠিয়ে দিয়েছি কতবার তবু ঘুরে ফিরে এসে বসবে। আমরা কেউ দেখবার আগেই উনুন নিয়ে বসবে এখানে, কিছুতেই কারো কথা শুনবে না—তাই দেখতে পেলেই সবাইকে বারণ করে দিই।

* * *

মনে আছে, তার অনেকদিন পরে আবার একদিন রসুলপুরে যাবার পথে ওই বাদামতলায় গিয়েছিলাম। সেদিনও গোবিন্দ সরকারকে দেখেছিলাম। বটগাছের তলায় ঠিক সেই জায়গাটায় বসে আছে। সেই ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল, সেই করমচার মত লাল চোখ, প্রখর দৃষ্টি!

সেদিনও গোবিন্দ সরকারের কাছে দাঁড়ালাম।

চারদিকে বটফলের রাজত্ব। নন্তা ময়রার দোকানের সামনে বাঁশের মাচা। দোকানের ঝাঁপ তখন বন্ধ। খুব সকাল। কিছু দূরে মাঠের ওপর চণ্ডী ঘোষের ইটখোলার চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে গল্ গল্ করে। আরো দূরে প্রান্তরটা উঁচু-নীচু হয়ে দিগন্তে গিয়ে মিশেছে। কটাই সান্যালের পটলের ক্ষেত ছেড়ে কিছু বাদা বন। তারপর নীল আকাশের গায়ে কয়েকটা বক মাতলার দিকে লড়ে চলেছে। সেই বাদামতলার নিঃসঙ্গ আবহাওয়ায় দাঁড়িয়ে রসুলপুরে যাওয়ার কথা ভুলে গেলাম। নন্তা ময়রার কথাই কানে এসে ভাসতে লাগলো কেবল—চেহারা দেখে বুঝতে পারছেন না বাবুমশাই, ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে?

বহুকাল আগে একদিন এই বটতলায় এসে সেদিন প্রথম দাঁড়িয়ে

ছিল গোবিন্দ সরকার, এই নন্তা ময়রাই সেদিন আশ্রয় দিয়েছিল। মাথা গোঁজবার একটা চালার ব্যবস্থাও করে দিয়েছিল।

কুলুইচণ্ডীমেলায় তখন লোকজন হতো খুব। তালপাতার বাঁশি, খেজুর পাতায় কোস্তা,' বাঁশের ধুচুনি, বেতের ধামা, খই, চিঁড়ে, চিনেমাটির বাসন, নাগর দোলা, মাটির হাঁড়িকলসি—সে একেবারে এলাহি কাণ্ড! তারপর দু'দিন বাদেই সব ফর্সা। কিন্তু ওই দু'দিনেই লাল হয়ে যেত বাদামতলার ব্যাপারীরা। কলকাতা থেকে মহাজনেরা আসতো সস্তায় জিনিসপত্র খরিদ করতে। নন্তা ময়রা দু'হাতে মিষ্টি বেচে কুলিয়ে উঠতে পারতো না। ভিয়েন বসতো সাতদিন আগের থেকে। গজা আর শুকনো খাবারগুলো সেই সময়ে তৈরি রাখলে একমাস-দু'মাস চলে। দিনরাত তখন দোকান খোলা। নন্তা ময়রার দোকানে বাড়তি লোক নিতে হয়।

—একটা কাজ দেবেন বাবু?

ভিয়েন্ তখন এসেছে সবে। পুরোদমে কাজ চলছে। দোকানের পেছনে মস্তবড় উনুনে গজাগুলো ভেজে তোলা হচ্ছে চুবড়িতে। গজার কড়া নামলে রসবড়া হবে। তারপর জিলিপী। ভোরের দিকে ছানার মুড়কি হবে বলে ছানা বাটা হচ্ছে।

নন্তা ময়রা বলছে—বেশ মিহি করে বাট্ ক্ষেত্তোর, মিহি করে বাট্—খেতে খারাপ হলে রসুলপুরের বাবুরা দাম দেবে না।

ক্ষেত্তোর বললে—বাবুরা বলছেন কেন বড়বাবু, বলুন বিবিরা—

নন্তা ময়রা বললে—ওই একই কথা হলো, বিবিদের জন্যেই তো বাবুরা আসে রসুলপুরে, তা আর জানি না—

তারপর একটু থেমে বলে—বিবিদের খেতে যদি ভালো লাগে তো পাঁচ টাকা সের দিতেও কসুর করবে না বাবুরা তা জানিস?

তা জানে সবাই। ক্ষেত্র জানে, নন্তা ময়রা জানে, বাদামতলার তাবৎ ব্যাপারী পর্যন্ত, কারো জানতে আর বাকি নেই। বড়-বড় লোক সব। পয়সা ওড়াতে বাগান-বাড়িতে স্ফূর্তি করতে আসে। বড়-বড় হাওয়া-গাড়ি। যমদূতের মতন চেহারা। কিন্তু ভেতরের স্ফূর্তিবাজ সব ছোকরা। সঙ্গে থাকে বিবি। মাঠের হাওয়ায় তাদের সিল্কের রঙিন শাড়ির আঁচল, মাথায় খোঁপার চুল, বুঝি বা প্রাণও ওড়ে। হো-হো, হি-হি করে হাসে। হেসে গাড়ির মধ্যে লুটোপুটি খায়।

বলে—গাড়ি থামালে কেন এখানে? এ কোন জায়গা গো?

সঙ্গের বাবু বলে—একটু জিরিয়ে নিচ্ছি—

—তা গায়ে হাত দিয়ে বুঝি জিরানো হচ্ছে? বলে রাগের ছল করে হাসতে-হাসতে গাড়ির পেছনে এলিয়ে পড়ে। তারপর ভেতরেই হুল্লোড় পড়ে যায়। হাসাহাসির শব্দ শোনা যায় দূর থেকে।

—এই ছ্যাখো, কেউ দেখে ফেলবে!

বাবুটি বলে—এখানে কে দেখবে, কেউ নেই—

মেয়েটি বলে—ওই তো বটগাছের তলায় কত লোক, মিষ্টির দোকান থেকে চেয়ে দেখছে এদিকে—

বাবুটি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের সুরে বলে—দূর ওরা গাঁয়ের লোক, দেখলেই বা, ওরা আবার মানুষ নাকি?

বাবুরা-বিবিরা কেউ মানুষ বলেই মনে করে না এদের। এই বাদাম-তলার ব্যাপারীদের, কি চণ্ডী ঘোষের ইটখোলার কুলী মজুরদের। কিম্বা ওই গোবিন্দ সরকারকে।

নন্তা ময়রা হাঁটুর কাপড় তুলে মাচায় বসে লক্ষ্য করে সব। বাদামতলার আদি-অকৃত্রিম ব্যাপারী নন্তা ময়রা। এই বাদামতলায় আর কেউ মিষ্টির দোকান দিতে পারে না। কেরোসিনের দোকান করেছে ভোলা ঘোষ। মুদির দোকান করেছে শ্রীপদ হাজরা। হ্যারিকেন লম্প'র দোকান করেছে শশী মিস্ত্রী। বাদাম- তলায় নানান কারবারের দোকানী আছে, কিন্তু মিষ্টি খাবারের একচেটিয়া কারবার নন্তা ময়রার। মেলায় মহোৎসবে নন্তা ময়রা মিষ্টি বেচে লালে লাল হয়ে যায়। কাঁচা পয়সা কোঁচড়ে নিয়ে বাড়ি যায়। মুখে বলে—কারবারে সুখ নেই তেমন

মেলার পর তখন আবার রাস্তার দিকে চেয়ে বসে থাকে নন্তা ময়রা। তখন আর ভিয়েন দেখবার তত তাগিদ নেই। গাঁয়ের লোক নুন কিনতে আসে, কেরোসিন কিনতে আসে, চাল, ডাল মশলা কিনতে আসে। কচিৎ-কদাচিত বাতাসাটা, মুড়কিটা কিনে নিয়ে যায়। নন্তা ময়রা বলে—ভালো সন্দেশ তৈরি হয়েছে নেবে না কাঁচির মা?

কাঁচির মা বললে—শুধু-শুধু সন্দেশ খেতে যাবো কেন বাছা, আমাদের কি অসুখ করেছে?

—তা সন্দেশ না, খাও, ভালো জিলিপী করেছি, নাও না!

কাঁচির মা আঁচলের খুঁটে গেরো বাঁধতে-বাঁধতে বলে—আর জিলিপীর দরকার নেই। নোলা বাড়লে শেষকালে সামলাবে কে?

এমন সময় গোবিন্দ এলো। নন্তা ময়রা প্রথমে গা করেনি। বিক্রি-বাটা নেই, কারিগরের রোজ ওঠে না। লাভের গুড় পিঁপড়েতে খাচ্ছে।

তখন যুদ্ধ থেমে গেছে। মিলিটারীর লোকজন রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালিয়ে ধুলো উড়িয়ে যেত। সোঁ-সোঁ শব্দ করে হল্‌দে রঙের গাড়িগুলো রসুলপুরের বাগান-বাড়িতে গিয়ে জড়ো হতো। রসুলপুরের পোড়ো বাড়িগুলো আবার তারা সারিয়ে-সুরিয়ে নিয়ে ছাউনি করেছিল। তখন বউ-ঝিরা রাস্তা দিয়ে হাঁটতো না ভয়ে। বেশি মিলিটারী দেখলে নন্তা ময়রা দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে ভেতরে বসে থাকতো। নইলে হুড়মুড় করে দোকানে ঢুকে সব লুট-পাট করে নেবে ঠিক নেই। শ্রীপদ হাজরার দোকানে খদ্দের আসতে ভয় পেতো। ইটখোলার কুলী-মজুরদের মেয়েছেলেরা লরী দেখতে পেলে পালিয়ে যেত মাঠের দিকে। সে-সব দিন গেছে। এখন রসুলপুরে বাগান-বাড়ির মালিকেরা আবার গাড়ি চালিয়ে আসতে সুরু করেছে। চাল-ডাল কেরোসিনের খদ্দের বাড়ুক, আর নাই বাড়ুক, নন্তা ময়রার কিছু খদ্দের বেড়েছে। তার নোন্‌তা-খাবারের খদ্দের ভিড় হয়। গরম সিঙ্গাড়া-কচুরির চাহিদা বেড়েছে। বাবুরা-বিবিরা রাত কাটায় ওখানে। কয়েকদিন ছু'হাতে টাকা ছড়ায়। গাঁয়ের লোক মুরগী বিক্রি করে মোটা লাভে। পাঁঠা বিক্রি করে চড়া দামে। কিন্তু শুধু মুরগী পাঁঠা হলেও সব অভাব মেটে না। আরো অনেক জিনিস চাই। সৌখীন জিনিস সব। সিগারেট-পান-বিড়ি সব রসুলপুরেই মেলে। মাল-টালও সঙ্গে করে আনে কলকাতা থেকে। গাড়ির গদির তলায় থরে-থরে বোতল সাজানো থাকে। সেটা সহজে ফুরোয় না। ফুরোলে রসুল-পুরের বাগান-বাড়ির মালীরা জোগান দেয়। কোথা থেকে জোগান দেয় তা কেউ জানে না। কিন্তু চাট্‌?

চাট্‌ কিনতে আসে এই বাদামতলায়। আগে ছিল নন্তা ময়রার খাস্তা সিঙ্গাড়া-কচুরি। এখন হয়েছে তেলেভাজা গোবিন্দ সরকারের আলুর চপ, ফুলুরি, বেগুনি, পেঁয়াজি, পাকাউড়ি—

যার কিছু বিক্রি হয় না, সে গিয়ে বিক্রি করে আসে রসুলপুরে।

বসির মিয়ার একটা খাসি ছিল ঘরে। বড় আদরের খাসি। ভেবেছিল ভাল দর পাবে, তা সময় থাকতে বেচেনি। তারপর দর নেমে গেল। পনেরো টাকা থেকে একেবারে দশ টাকায়। সেই খাসি বসির রসুলপুরে কুড়ি টাকায় বিক্রি করে এলো বাবুদের কাছে।

ছু'হাতে ছু'খানা দশ টাকার নোট তুলে ধরে বললে—এই দেখুন বড়বাবু কুড়ি টাকায় বেচে এলাম—

নন্তা ময়রা বললে—হেড মালিকে কত দিতে হলো?

বসির বললে—নিলে আটগণ্ডা পয়সা, কিন্তু বাদামতলায় ও কে কিনতো—ওই দরে?

হু-হু করে হয়তো রসুলপুর থেকে গাড়ি এসে দাঁড়ায় বাদামতলার বটগাছতলায়। ঠিক দুপুরবেলা। নন্তা ময়রা তখন গামছা পেতে সবে দোকানের সামনের মাচায় শুয়েছে। গাড়ি আসতেই নন্তা ময়রা ঘাড় কাত করে দেখলে। গাড়িতে বাবু নেই, বিবিরাও নেই। শুধু মতিলাল একলা। কানন-কুঞ্জের হেড মালী মতিলাল।

—হেড মালী যে, কি চাই আবার?

– আজ্ঞে বড়বাবু, সাত টাকার সিঙাড়া।

নন্তা ময়রাকে তখন উঠতে হয়। ক্ষেত্তোরকেও উঠতে হয়। কাঁচা ঘুমে উঠে আবার উনুনে কয়লা দিতে হয়, ময়দা মাখতে হয়। আর ঘণ্টা-দু'য়েক পরেই শুরু হতো ভাজা। কিন্তু ততক্ষণ দেরি সইবে না। রসুলপুরের বাবু আর বিবিদের। নন্তা ময়রা খুন্তি চালাতে-চালাতে জিজ্ঞেস করে—এই অবেলায় সিঙ্গাড়া কি হবে হেড মালী? ভাত দিয়ে খাবি নাকি?

মতিলাল বললে—এই তো সবে ঘুম থেকে উঠলো সব—এইবার চা হবে কিনা—

—এখন চা হবে তো ভাত খাবে কখন বাবুরা?

হেড মালী বলে—এই চায়ের পর মাংস চড়বে, খেতে-খেতে সেই যার নাম বিকেল।

হেড মালী বহুদিনের লোক। বড়বাবুর আমল থেকে আছে কানন-কুঞ্জে। কানন-কুঞ্জে তখনকার দিনে বড়বাবুর ফুর্তিতে মাল এনে দিয়েছে। তেলেভাজা, সিঙাড়া, কচুরি এনে দিয়েছে। পেঁয়াজ কুঁচিয়ে, আদা কুঁচিয়ে কাঁচা লঙ্কা নুন দিয়ে মুড়ি মাখিয়ে দিয়েছে তেল মেখে। বড়বাবুর মোসায়েবরা আসতো, বড়বাবুর মেয়েমানুষেরা আসতো। বড়বাবুর ঘোড়ার গাড়ি ছিল, ফিটন গাড়ি ছিল। অনেক দিন নিজেই গাড়ি হাঁকিয়ে কলকাতা থেকে আসতো। তখন নিজের হাতে হেড মালী বাগান তদারক করেছে, ঘর-দোর ঝাড়-লণ্ঠন পরিষ্কার রেখেছে। মাঝে-মাঝে কলকাতার হাতীবাগানের বাড়িতে তরিতরকারি বয়ে দিয়ে এসেছে। থোড়, মোচা, গোলাপফুল, শাকসব্জী, ফুলকপি, বাগানের ফুলুরি বড়মা'র কাছে ঝুড়িভর্তি দিয়ে এসেছে। বড়মা'র কাছে পূজার পার্বণী নিয়ে এসেছে।

—আর তোমার ছোটবাবু?

মতিলাল বলে—ছোটবাবুর আমল আলাদা একেবারে। এখন তো তরিতরকারী হাটে বেচতে হয়। তার হিসেব দিতে হয়। একটা পয়সা এদিক-ওদিক হলে কৈফিয়ৎ তলব হয়—অথচ মোসায়েব, মেয়েমানুষদের

জন্যে পয়সার হিসেব থাকে না। এই তো সাতটাকার সিঙাড়া যাচ্ছে, কতক খাবে, কতক ছড়াবে, হয়তো এই সিঙাড়া নিয়েই ফুটবল খেলা সুরু হয়ে যাবে।

নন্তা ময়রা বলে—বলো কি হেড মালী? ফুটবল?

—তা ফুটবল খেলা হয় বৈকি মাঝে-মাঝে। মতির ঠিক থাকে কি বড়বাবু? মাল খেলে কি বাবুদের মতির ঠিক থাকে? যখন হয়তো খেয়াল হবে তখন আবার হুকুম করবে, যা মতি, আর সাত টাকার সিঙ্গাড়া ভাজিয়ে নিয়ে আয়। এই দেখুন না, সাত টাকার সিঙ্গাড়ার জন্য দু'টাকার তেল পুড়লো মোটরের। অথচ দেখুন গে—

মতিলাল আবার বললে—অথচ দেখুন গে, আমার একটাকা মাইনে বাড়াতে বললে ধমক শুনতে হয়।

নন্তা ময়রা বলে—আজ একটা নতুন মুখ দেখেছিলাম বাবুর সঙ্গে—ও কে?

মতিলাল বললে—ওই তো নতুন আমদানী ছোটবাবুর।

—কোত্থেকে আমদানী হলো গো?

হেড মালী বলে—কে জানে কোত্থেকে, বাড়িতে থাকতে এক পয়সার তেল চুলে মাখতে পেতো না, এখন গন্ধ-তেল চায় মাথায়, পায়ে আলতা চাই, সিল্কের শাড়ি, ব্লাউস্ চাই—ছোটবাবুর পেয়ারের মেয়েমানুষ, কিছু বলতেও পারি না—

নন্তা ময়রা বললে—মা দেখতে তো তেমন ভালো নয়, কিসে মজলো তোমার ছোটবাবু?

—ওই কথা বলে কে? ওই ওনারই আবার সোহাগ কত। রাগ ছোটবাবু আবার ওকে খাইয়ে দেন, পায়ে ধরে আবার সাধ্য সাধনা করেন।

তা নন্তা ময়রা দেখেছে একদিন।

যখন ছোটবাবুর বড় মোটরগাড়িটা যায়, দূর থেকে বাজনা শুনেই নন্তা ময়রা বুঝতে পারে কানন-কুঞ্জের ছোটবাবুর গাড়ি আসছে। মাচার কাছে এসে দাঁড়ালে দেখা যায় বাদামী-রংয়ের বিরাট গাড়িখানা। নতুন মেয়ে-টাকে নিয়ে আসছে। চুল উড়ছে, খোঁপা উড়ছে, শাড়ির আঁচল উড়ছে, আর উড়ছে ছোটবাবুর সিগারেটের ধোঁয়া।

একটা কাজ দেবেন বাবু?

নন্তা ময়রা অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। ছোটবাবুর নতুন মেয়ে-মানুষটার কথায় হয়তো ভাবছিল। হঠাৎ পাশ ফিরে দেখে বললে—কে তুই?

কোত্থেকে আসছিস? নাম কি?

—আজ্ঞে, আমার নাম গোবিন্দ সরকার।

—বাড়ি কোথায়?

—পাকিস্তানে।

—কে আছে তোর?

গোবিন্দ সরকার বললে—ছিল সব, এখন কেউ।

—নেই—কেন! গেল কোথায় সব?

গোবিন্দ সরকার বলতে গিয়ে কেমন যেন থেমে গেল। তারপর বললে—না আমার কেউ নেই বড়বাবু—

নন্তা ময়রা বললে—এখানে কাজ হবে না বাপু, অন্য জায়গায় দেখ।

অন্য জায়গা আর কোথায়? শ্রীপদ হাজরার দোকানেও ওই একই উত্তর। কেউই কাজ দেয় না। কারোর কাছেই কাজ নেই। কাজ অত সস্তা নয়। বাদামতলা কি আর কলকাতা? বাদামতলায় ক'টাই বা খদ্দের! ওই চণ্ডী ঘোষের ইঁটখোলায় যাও। কিম্বা কটাই সান্যালের খামারে যাও! আর নয়তো রসুলপুরের বাগান-বাড়ির মালিকদের কাছে যাও। সেখানে কাজ পাবে। বড়লোক বাবুরা সব। ঝোঁকের মাথায় তোমায় কাজ দিলেও দিতে পারে।

কিন্তু চণ্ডী ঘোষ ঝানু ব্যবসাদার। বললে—কি কাজ জানো?

গোবিন্দ বললে—আজ্ঞে, ঘর ছাইতে পারি, বেড়া বাঁধতে পারি—

—ঘর ছাইতে পারো তা এখানে কি? ইটখোলার কাজ জানো?

—আজ্ঞে না।

কটাই সান্যালেরও ওই এক কথা। ভাতের দাম আছে। ভাত অত সস্তা নয়। ভাতের জন্য সারা পৃথিবীতে লড়াই লেগে গেছে। শুধু দু'মুঠো ভাত। সেই ভাতের জন্যেই আজ হাহাকার চারদিকে। তোমার মুখ দেখে কে কাজ দেবে? কলকাতায় যাও, যেখানে রাস্তায় ভাত ছড়ানো আছে।

কলকাতা যেতে গোবিন্দ সরকার রাজী হয়নি। বলেছিল—কলকাতায় যাবোনি বড়বাবু, খেতে না পাই সে-ও ভালো, তবু কলকাতায় যাবোনি!

—কেন, কলকাতায় যেতে তোমার দোষ কি শুনি?

গোবিন্দ সরকার সে-কথার উত্তর দেয়নি। আবার হাঁটতে-হাঁটতে নন্তা ময়রার দোকানের সামনে দাঁড়ালো। নন্তা ময়রা তখন খেয়ে পান চিবুচ্ছে। বললে—কি হলো গো? কটাই সান্যাল কি বললে?

গোবিন্দ বললে—হয়নি, কলকাতায় যেতে বললে।

—তা আমিও তো তাই বলছি কলকাতাতেই যাও না, যেখানে ভাতের ছড়াছড়ি, দোরে-দোরে এমন ভিক্ষে করতে হবে না।

গোবিন্দ বললে—না, কলকাতায় আমি যাবোনি আজ্ঞে!

নন্তা ময়রার কেমন কৌতূহল হলো। বললে—কেন কলকাতায় যেতে তোমার দোষ কি শুনি।

হঠাৎ গোবিন্দ সরকার যেন বাঘের মত রেগে উঠলো। বললে—না, যাবোনি আমি কলকাতায়, আপনার কি? আপনি আমায় কাজ দেবেন তো দিন, নইলে আমি উপোস করবো, মরবো, এখেনে বটগাছ তলায় পড়ে থাকবো, আপনার কি?

শ্রীপদ হাজরাও সেই কথা বললেন। বললেন—ভালো কথাই তো বলছে তোমাকে সবাই বাপু। কাজের জন্যে এসেছো বাদামতলায়! এখানে কি কাজ গজাচ্ছে?

—আপনারা ইচ্ছে করলেই গরীবকে একটা কাজ দিতে পারেন!

শ্রীপদ হাজরা বললে—না পারিনে, তোমার মত বে-আক্কেলে লোক তো দেখিনি হে! ভালো কথা বলছি তবু শুনছো না?

এমনি করেই দোরে-দোরে ঘুরে গোবিন্দ সরকারকে কাজ জোগাড় করতে হয়েছিল। শুধু দরজায়-দরজায় ঘুরেই কাজ হয়নি, এই তেলে-ভাজার দোকান করতে আরো অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে, সে আর এক কাহিনীই বটে।

তখন বোশেখ মাস। বাদামতলার বাসিন্দারা কোনোরকমে টিঁকে আছে মাটি কামড়ে। চণ্ডী ঘোষের ইঁটখোলার কাজকর্ম হাল্‌কা। লোকজন মজুর-মিস্ত্রীর অভাব নেই, কিন্তু খদ্দের হয় না তেমন! মাঝে-মাঝে দু'-একটা খদ্দের, তাদের চাহিদা মিটিয়েও পেট ভরে না, মজুরী পোষায় না। কটাই সান্যালের খামারের কেরষাণ-মজুরের দল শুধু তামাক খায় আর গল্প করে। বৃষ্টি নেই কোথাও। ক্ষেত জ্বলে যাচ্ছে, অথচ দরও হু-হু পড়ছে। মাল বেচেও ঘরে পয়সা ওঠে না সান্যালমশাইয়ের। নন্তা ময়রার দোকানেও খদ্দের জোটে না। সামনে দিয়ে খদ্দের গেলেই নন্তা ডাকে। বলে—ও কাঁচির মা, ভালো সন্দেশ বানিয়েছিলুম, নেবে নাকি? সস্তা দামে দিতাম—

শ্রীপদ হাজরা ডাকেন গণেশ পাড়ুইকে! বলেন—পাড়ুইমশাই, চাল কোত্থেকে কিনছেন আজকাল?

গণেশ পাড়ুই বলেন—ওসব আমার ছেলেরাই দেখছে, আজকাল খবর

রাখিনে।

শ্রীপদ হাজরা বলেন—সস্তার চান্স এসেছে, ভাবলাম যদি দরকার থাকে আপনার—

তা এইরকম ডেকে-ডেকে খদ্দের এসে কি আর কারবার চালানো যায়! বাদামতলার বাজারে হাটবারে যখন বেচা-কেনার পর পাহাড় হয়ে থাকে মালের তখন শ্রীপদ হাজরা হুঁকো মুখে দিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবেন। দিন-কাল যা হলো, তাতে আর কারবার করে খেতে হবে না কাউকে। চালের দর হু-হু করে পড়ছে। তবু খদ্দের নেই। কাজকর্ম জুটছে না কারো। ক্ষেতে-খামারে লোকজন বসে-বসে তামাক খায় আর মজুরি নেয়। বৃষ্টি না-হলে আর ভরসা নেই।

হঠাৎ গণেশ পাড়ুই বললেন—দেখছেন হাজরামশাই, দেখছেন?

শ্রীপদ হাজরা বললেন—কী?

—আর কি? এবার সব ফরসা। আর টিঁকতে হবে না এখেনে।

—কেন?

আশেপাশে লোক জমে যায়। 'ক্ষেত্তোর যাচ্ছিল পাশ দিয়ে, সেও দাঁড়িয়ে পড়লো। নন্তা ময়রা বাঁশের মাচার ওপর বসে বসে দেখছিল। হঠাৎ শ্রীপদ হাজরার দোকানের সামনে ভিড় দেখে এগিয়ে এলো—বললে—কি হলো হাজরামশাই।

আর কি হলো সবারই নজর তখন ঊর্ধদিকে। সবাই হতাশার ভঙ্গীতে উঁচুতে চেয়ে আছে। নন্তা ময়রাও দৃষ্টিকে অনুসরণ করে দেখলে। কুলুইচণ্ডী মন্দিরের মাথার ওপর—সর্বনাশ!

শ্রীপদ হাজরা বললে—আর কী! এবার কারবার ওঠাও নন্তা!

নন্তা ময়রার মুখে কথা নেই। গণেশ পাড়ুই মশাই বললেন—তোমরা তখন ছোট, সেই সময়ে একবার কুলুইচণ্ডীর মন্দিরের মাথায় শকুন বসেছিল—সে তোমরা দেখনি—

না দেখুক, কিন্তু ফলাফলটা জানে সবাই। সেবারও ঠিক তেমনি এক বোশেখ মাসে শকুন বসেছিল মন্দিরের মাথায়। আর ঠিক তার পরেই বাদামতলার গ্রামে আগুন লেগে সমস্ত বাড়ি-ঘর পুড়ে ছারখার হয়ে গিয়েছিল। একখানা আস্ত বাড়ি বলতে আর কিছু ছিল না। করুণাময়ীর ঘাট তখন জলে টই-টুম্বুর। কিন্তু সেখানে থেকে জল আনে কিসে। আশেপাশের ডোবাগুলো পর্যন্ত তখন শুকিয়ে খাঁ-খাঁ করছে। জলের ব্যবস্থা হলো না। ঘর-বাড়ি সব সেদিন পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। আজ এতদিন পরে আবার শকুন দেখে তাই চমকে উঠলো সবাই। কি

হবে! কি হবে এবার ?

গণেশ পাড়ুই নন্তা ময়রার দিকে চাইলেন। নন্তা ময়রাও শ্রীপদ হাজরার দিকে চাইলে। শ্রীপদ হাজরা চাইলে হাটখোলার চণ্ডী ঘোষের দিকে। চণ্ডী ঘোষ চাইলে কটাই সান্যালের দিকে। কিন্তু কোনো সমাধান কারোর কাছ থেকে এলো না। গ্রামের মরুব্বিরা যখন সামনে রয়েছে, বাদামতলার অন্য অধিবাসীদের তখন আর ভাবনার কিছু নেই। তবু যে-যার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো।

গণেশ পাড়ুই বললেন—কখন থেকে আছে ওটা ?

নন্তা ময়রা বললে—আমি তো এই এখনই দেখলাম পাড়ুইমশাই !

গোবিন্দ সরকার পেছনেই দাঁড়িয়েছিল। সামনে এসে বললে—আমি পরশু থেকে দেখছি বড়বাবু!

—পরশু! তা পরশু থেকে দেখছিস তো বলিসনি কেন? মজা পেয়েছিস? কে তুই ?

সকলের চোখ গিয়ে পড়লো গোবিন্দ সরকারের ওপর। এতদিন ভালো করে নজর দেয়নি কেউ ওর দিকে। ক্ষয়া-ক্ষয়া চেহারা, মাথায় ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল। লোকটাকে যেন কোথায় দেখেছে সবাই। যেন বাদামতলাতেই ঘোরাঘুরি করছে কদিন। এর-ওর কাছে ঘুরে-ঘুরে ভিক্ষে করে দু'মুঠো খাচ্ছে। এতদিন কেউ বিশেষ নজর দেয়নি গোবিন্দ সরকারের দিকে। নজর দেবার দরকারও হয়নি। এখন যেন সবাই আবিষ্কার করলে নতুন করে। বললে—কোথা থেকে আসছিস তুই ?

গোবিন্দ বললে—কলকাতা!

—দেশ কোথায় তোর ?

—পোটোখালি।

—তা এখানে কি করতে এলি ?

—আজ্ঞে কাজের ধান্দায়, পেটের জ্বালায়।

—তা পেটের জ্বালায় এত জায়গা থাকতে এলি বাদামতলায় ? কলকাতা থেকে চলে এলি কেন ?

গোবিন্দর চোখদু'টো বাঘের মত জ্বলে উঠলো বুঝি আবার। কিন্তু তখুনি আবার নিভে গেল।

—বল্, কলকাতা থেকে চলে এলি কেন ?

—কলকাতা ভাল্লাগে না!

ক্ষেত্তোর এতক্ষণ দাঁড়িয়ে শুনছিল সব। ঝাঁপিয়ে পড়ে গোবিন্দর

চুলের মুঠি ধরলে। বললে—তা ভালো লাগবে কেন, কলকাতা সোনার জায়গা কিনা, ভালো বাদামতলা—নিশ্চয়ই কোনও মতলব আছে এর—

বলে গোবিন্দ'র গালে থাপ্পড় মারতে যাচ্ছিল। বাধা দিলেন পাড়ুই-মশাই। • বললেন—এখন ওসব থাক্, শকুনের কি করবে তাই বলো আগে নন্তা—বাদামতলা যে পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে তা ভেবেছো ?

কথাটা ভাববার মত। আবার আকাশের দিকে মুখ তুলে দেখলে সবাই। ফুটফুটে রোদ উঠেছে চারদিকে। কুলুইচণ্ডীর মন্দিরের গায়ে কালো শ্যাওলার দাগ সবুজ হয়ে ফুটে উঠেছে। ফাটলের ফাঁকে অশ্বত্থ-গাছের একটা চারা রোদ লেগে ঝকঝক করছে। আর মন্দিরের মাথায় লোহার চক্র আর ত্রিশূলের ঠিক চুড়ার ওপর শকুনটা নিশ্চিন্তমনে বসে আরামে রোদ পোয়াচ্ছে, কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই তার।

—এখন উপায় !

ক্ষেত্তোর বললে—ঢিল মারবো বড়বাবু ?

বড়বাবু বললে—দূর মায়ের মন্দিরে ঢিল ছোঁড়া ? প্রাণের ভয় নেই তোর ?

কে একজন ছোকরা বললে—আগুন জ্বালালে কেমন হয় ?

তা মন্দ নয় কথাটা। গণেশ পাড়ুই বললেন—তা জ্বালা যায়, কিন্তু মায়ের গায়ে যেন আঁচ না লাগে, দেখিস্ !

নন্তা ময়রা বললে—পুরুতমশাই কি বলেন ?

অনন্ত ভট্টাচার্য মশাই বললেন—আগুন জ্বালাতে পারো, তবে মায়ের রোষ নিবারণের হোম স্বস্ত্যয়ন করতেই হবে, গাঁয়ে দেবরোষ লেগেছে; সহজে ছাড়বে না !

তা হোম-স্বস্ত্যয়ন যা কিছু করতে হয় হোক, আপাতত আগুন জ্বালা হলো। ডোবার ধার থেকে শুকনো জঞ্জাল এনে জড়ো করা হলো সেই পাতার স্তূপে আগুন জ্বালিয়ে দিলে ক্ষেত্তোর। দাউ-দাউ করে আগুনের শিখা ঠেকলো বটগাছে - তারপর উত্তরে হাওয়া লেগে ধোঁয়া গিয়ে উঠলো মন্দিরের চূড়োয়। ক্ষেত্তোর চীৎকার করে উঠলো—জয় মা চণ্ডী—
—জগদম্বে—

কিন্তু কোথায় কী। শকুনটা যেমন বসেছিল তেমনি বসে রইলো। সবাই মিলে মন্দিরের চূড়ো লক্ষ্য করে চেয়েছিল। যদি উড়ে যায় ধোঁয়ার গন্ধে !

—ও উড়বে না বড়বাবু, আমি বলছি উড়বে না।

— কে রে তুই ?

সবাই চেয়ে দেখলে কথাটা বলেছে গোবিন্দ সরকার। গোবিন্দ সরকার তখনও উঁচুদিকে চেয়ে আছে। সেইদিকে চেয়েই বলছে—ও কিছুতেই উড়বে না বড়বাবু, আমি বললাম উড়বে না—

গণেশ পাড়ুই কথাটা শুনে রেগে গেছেন। বললেন—তুমি কে হে শুনি, বড় লায়েক হয়েছো দেখছি।

গোবিন্দ বললে - আজ্ঞে, আমি তো কিছু খারাপ কথা বলিনি, বলছি ও বেটা উড়বে না।

অনন্ত ভট্টাচার্য বললেন— আলবৎ উড়বে, ওর বাপ উড়বে, স্বস্ত্যয়ন করলে উড়ে পালাতে পথ পাবে না বাঝাধন !

গোবিন্দ বললে -তাহ'লে ওড়ান হোম করুন—স্বস্ত্যয়ন করুন—

গণেশ পাড়ুই বললে—তা তুই যে অত কথা বলছিস, তুই ওড়াতে পারবি।

নন্তা ময়রা বললে—কি করে ওড়াবে শুনি ?

গোবিন্দ বললে - কেন, মন্দিরের মাথায় চড়ে—

—তোর প্রাণের ভয় নেই ? এ বলে কি ?

গোবিন্দ সরকার হেসেছিল সেদিন। বলেছিল কে আছে শুনি, যে প্রাণের ভয় থাকবে আমার ?

তা সেদিন সেই গাঁ-সুদ্ধ লোকের সামনে তর-তর করে গোবিন্দ ওই মন্দিরের একেবারে চূড়োয় গিয়ে উঠেছিল। সবাই তখন অবাক হয়ে দেখছে। গণেশ পাড়ুই নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেখতে লাগলেন। নন্তা ময়রারও নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। লোকটা পাগল নাকি ?

শ্রীপদ হাজরা অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন- বাহাদুরি আছে হে লোকটার।

থর-থর করে কাঁপতে লাগলো সবাই। হিম হয়ে এলো শরীর। নিশ্চয় বজ্রাঘাতে মরবে ও। পক্ষাঘাত হবে। নিশ্চয় মরে যাবে এবার। এখনি হয়তো পা পিছলে আত্মঘাতী হবে। কিন্তু লোকটা তখন মন্দিরের গা বেয়ে আস্তে-আস্তে ওপরে উঠছে। আর বেশি দূরে নয়। শকুনটাও তখন আরামে রোদ পোয়াচ্ছে এক মনে।

ক্ষেত্তোর চীৎকার করে উঠলো—জয় মা, চণ্ডী মা চণ্ডীকে—জগদম্বে—

আর তারপরেই শকুনটা গোবিন্দর তাড়া খেয়ে উড়ে গেল উড়তে উড়তে প্রথমে গেল চণ্ডী ঘোষের ইঁটখোলার দিকে। তারপর এক পাক খেয়ে

কটাই সান্যালের পটলের ক্ষেতের ওপর দিয়ে পশ্চিম পানে উড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। আর কেউ তাকে দেখতে পেলে না।

একটা নিশ্চিন্তের হাঁফ ছাড়লো সবাই। তবু তখনও ভয়, হয়তো নামতে গিয়ে পড়ে যাবে পা পিছলে। কিন্তু না, পড়লো না পা পিছলে। আস্তে-আস্তে যেমন উঠেছিল তেমনি অক্ষত শরীরেই নেমে এলো লোকটা।

গণেশ পাড়ুই বললেন—সাবাস ছোকরা! কি নাম তোমার? থাকো কোথায়?

অনন্ত ভট্টাচার্য বললেন—কিন্তু বংশ থাকবে না ওর, এই বলে রাখলাম, নির্বংশ হবে ও!

গোবিন্দ শুধু হাসলো একটু। বললে—বংশ আমার নেইও পণ্ডিতমশাই, আমার নেই আজ্ঞে।

অনন্ত ভট্টাচার্য বললেন—এই হাসিই সর্বনাশী হবে, তাও বলে রাখছি। কলুইচণ্ডীর রাগ যে-সে রাগ নয়!

তা সেই গোবিন্দ শেষে কাজ পেলে একদিন। শ্রীপদ হাজরা দিলেন একটি টাকা। নন্তা ময়রা দিলে আটগণ্ডা পয়সা। গণেশ পাড়ুই, চণ্ডী ঘোষ, কটাই সান্যাল কিছু-কিছু করে দিলে। সেই পয়সা দিয়ে গোবিন্দ সরকার মাটির গামলা কিনলে, বেসন কিনলে, তোলা উনুন তৈরি করলে। তেল কিনলে, কয়লা ঘুঁটে কিনলে। কিনে বসলো এই বটতলায় বেগুনি ভাজতে। বেগুনি ভাজা, তারপর হলো আলুর চপ, তারপর ফুলুরি।

নন্তা ময়রা বললে—দেখি, কেমন তেলেভাজা ভাজতে পারিস্ তুই, দেখি একখানা খেয়ে দেখি—

শ্রীপদ হাজরাকেও দু'টো আলুর চপ আর বেগুনি নিয়ে গিয়ে দিয়ে এলো গোবিন্দ। বললে—খেয়ে দেখুন আজ্ঞে, এখনও বৌনি করিনি।

বাদামতলার তাবং লোক এলো দেখতে। নতুন তেলেভাজার দোকান হয়েছে। বেশ মচমচে হয়েছে তো? ছেলে-ময়রা এলো কিনতে বাড়ি থেকে। কাঁচির মা সওদা করতে এসে বললে—কে জানে বাপু, কিনতে তো বলছো, নতুন লোক, দশজনে খাক্, ভালো বলুক্, তবে নেবো।

নন্তা ময়রা বললে—নাও গো কাঁচির মা, তুমি নির্ভয়ে নাও, আমি নিজে খেয়ে দেখেছি।

তা প্রথমদিন মন্দ বিক্রি হলো না। পয়সা, আধলা, আনি দু'আনি মিলিয়ে প্রায় দু'টাকা লাভ হলো।

রসুলপুরের বাবুরা গাড়ি থামিয়ে নিয়ে গেলেন আলুর চপ কিনে জিজ্ঞেস করলেন—ভালো হবে তো হে?

গোবিন্দ সরকার বললে—আজ্ঞে, খেয়ে খুশি হলে তবে না হয় দাম দেবেন।

ছোটবাবু কিনে নিয়ে গেলেন দু'টাকার তেলেভাজা। সঙ্গে মেয়েমানুষ আছেন। তিনি খেয়ে দেখলেন।

ছোটবাবু জিজ্ঞেস করলেন- কেমন খেলে গো?

ছোট ছোট দাঁত। ঠোঁটে রঙ মাখানো। এলো খোঁপা কাঁধের ওপর লটকাচ্ছে। বললে—জমবে ভালো।

—তা'হলে দাও দু'টাকার।

দু'টাকার তেলেভাজা নিয়ে গেল সঙ্গে। কিন্তু ঘণ্টা-দুই পরে আবার গাড়ি এলো হেড মালীকে নিয়ে। বললে—আরো দু'টাকার তেলেভাজা চাই, বাবুদের খুব ভালো লেগেছে।

দোকান খুব জমে গেল। দু'দিনেই গোবিন্দ'র নাম-ডাক ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। তখন কাঁচির মা'কে আর ডেকে বেচতে হয় না। সওদা করে যাবার পথে নাতনীর জন্যে তেলেভাজা কিনে নিয়ে যায় আঁচলে বেঁধে। ভোর থেকেই লোক জড়ো হয় বটগাছতলায়। তখনও শীত কাটেনি ভালো করে। রোদ ওঠেনি বটগাছের মাথায়। কাণা হরিপদ হি-হি করে কাঁপতে-কাঁপতে এসে দাঁড়ায়। একেবারে উনুনের ধার ঘেঁষে দাঁড়ায়। তখনও আঁচ ওঠেনি উনুনে। তারপর এসে জোটে ক্ষেত্তোর। আসে খ্যাঁদা পালিত, আসে হৃদয় হালদার।

হৃদয় হালদার বলে—আজ এত দেরি কেন গোবিন্দদা?

খ্যাঁদা পালিত বলে—বেশ করে লঙ্কা-বাটা দিয়েছো তো গোবিন্দদা? কালকের আলুর চপে মোটে ঝাল দাওনি।

কাণা হরিপদ—বলে—অত ঝাল দিলে রসুলপুরের বাবুরা আর তেলেভাজা কিনবে তোমার?

হৃদয় হালদার বলে—ইঃ, কিনবে না; বাবুরা মালের সঙ্গে কি খাবে শুনি?

গোবিন্দ সরকার তখন আপন মনে তেলেভাজা খুন্তিতে তুলছে। হাতে লাগলে হাত পুড়ে যাবার অবস্থা। চুক-চুক করে শব্দ হয় জিভের। ঠাণ্ডার দিনে গরম-গরম তেলেভাজা খেয়ে জিভের আড় ভেঙে আসে। তারপর নন্তা ময়রার দোকানে গিয়ে ভাঁড়ে-ভাঁড়ে চা নিয়ে আসে ওরা। সকালবেলা গরম চায়ের সঙ্গে গরম রসে আড্ডা জম-জমাট হয়ে আছে। কাজকর্ম নেই কারো। গোবিন্দ সরকারকে ঘিরে নিষ্কর্মা একদল ছেলের ভিড় জমে ওঠে রোজ। তারপর সে ভিড় পাতলা হলে তখন বেচাকেনার পাট বন্ধ করে

গোবিন্দ সরকার ঘরে যায়। নন্তা ময়রার দোকানের গা ঘেঁসে ছোট একটা চালা মতন। সেখানেই রান্না-বান্না, খাওয়া-শোওয়া।

অন্ধকার রাত্রে বাদামতলা নিঃঝুম। শ্রীপদ হাজরা দোকানের ভেতরে বসে চশমাটা চোখে দিয়ে তখন খেরো খাতা নিয়ে বসেন। সরষের তেল তিন ছটাক, খয়ের ছ'পয়সা, তিন গোছ পান, ঘি পাঁচ ছটাক। খুচরো হিসেবের ভিড়ে শ্রীপদ হাজরামশাই থই পান না এক-একদিন।

নন্তা ময়রার দোকানের হ্যারিকেনটাও টিমটিম করে জ্বলছে তখন। নন্তা ময়রা খালি গায়ে বাঁশের মাচার ওপর বসে হাওয়া খান, আর ভেতরে ক্ষেত্তোর তখন বিরাট উনুনটার ওপর ভিয়েনের কড়া চাপিয়ে গলদঘর্ম হয়ে আসে। সকালবেলাকার বোঁদে, খাস্তা গজা আর সন্দেশের আয়োজন হচ্ছে। কিন্তু তখন বাদামতলার অন্যদিক নিঃঝুম। শুধু কয়েকটা বড়-বড় মোটরগাড়ি জোর আলো জ্বালিয়ে কলকাতার দিক থেকে এসে রসুলপুরের দিকে সোঁ-সোঁ করে চলে যায়। বাদামতলার বটগাছটার মোটা-মোটা পাতায় শুধু একবার ঝাপটা লেগে আবার কিছুক্ষণের জন্যে সব চুপ হয়ে যায়।

বললাম—কিন্তু কাঞ্চনকামিনী? ওই কাঞ্চনকামিনী দেবী?

নন্তা ময়রা বললে—আজ্ঞে বাবুমশাই, তখন কি জানতাম গোবিন্দ সরকারের কেউ আছে? আমরা জানি কেউ নেই ওর, ও নিজেও বলেছে সেকথা কতবার—সে তো পরে জানলাম সব—

—কি করে জানলে?

নন্তা ময়রা বাঁশের মাচার ওপর ধুলো ঝেড়ে বসতে-বসতে বললে—বসুন, আজ্ঞে এখেনে আয়েস করে।

বাদামতলার ইতিহাসে এমন ঘটনা আগে ঘটেনি কখনও। দীনবন্ধুরা গেছে ফুর্তি করতে রসুলপুরের বাগান-বাড়িতে। মল্লিকদের ছোটবাবু, মেজবাবু, সেজবাবু সবাই গেছে। কলকাতার ছোকরা বাবুমহলের রসুলপুরে যাতায়াত ছিলই। শুধু যুদ্ধের সময় কিছু কমেছিল—এই যা! তারপর যুদ্ধ যখন থেমে গেল তখন গোরাপল্টনরা আবার গেল রসুলপুর ছেড়ে। আবার বাদামতলার রাস্তা দিয়ে হু-হু করে গাড়ি আসে, গাড়ি যায়। নন্তা ময়রা মাচায় বসে শুধু দেখে। আর দরকার হলে বাবুরা সিঙ্গাড়া, নিমকী, কচুরী গরম গরম ভাজিয়ে নিয়ে যায়। কিম্বা হেড মালী মতিলাল এসে বাবুদের জন্যে ভাজিয়ে নিয়ে যায়। আর তারপর যখন বাগান-বাড়ি আরো জমজমাট হয়ে উঠলো—তখন গোবিন্দ সরকার তেলেভাজার দোকান খুলে ফেলেছে।

—ওই দ্যাখ গাড়ি আসে—

হৃদয় হালদার, কাণা হরিপদ, খ্যাঁদা পালিত সবাই চেয়ে দেখে। মুখের তেলেভাজা মুখেই আটকে রইলো। সবাই দেখলে, কলকাতার দিক থেকে সোঁ-সোঁ করতে করতে ছুটে আসছে একটা গাড়ি। এই ছোট্ট এতটুকু সরষের দানার মতন? তারপর সেই দানাটাই বড় হতে হতে একেবারে বৃহৎ আকার নেয়। শব্দ কানে আসে। তারপর একেবারে সামনে এসে ব্রেক করে দাঁড়ায়। তখন সকলের মুখ ভয়ে শুকিয়ে এসেছে। আর গাড়ি থেকে আসে ছোটবাবুর উর্দিপরা ড্রাইভার। তারপর কেনা হয়ে গেলে আবার গাড়ি ছেড়ে দেয়। ড্রাইভার একটা হেঁচকা শব্দ করে আর গাড়িটা লি-লি করে মিলিয়ে যায় রসুলপুরের দিকে। তারপর আবার আর একটা গাড়ি আসে। আবার একটা। কেউ থামে, কেউ থামে না। কিন্তু গোবিন্দ সরকারের তেলেভাজা খেলে আবার খেতে হয়।

কাণা হরিপদ বলে—তোমার তেলেভাজায় আফিম মেশাও নাকি গোবিন্দদা?

হৃদয় হালদার বলে—রসুলপুরের বাবুরা তো এত বড়লোক, কিন্তু এত তেলেভাজা খায় কেন বলো দিকিন। মাংসের চপ খেলেই তো পারে।

খ্যাঁদা বলে—তা বললে শুনছিলেন, মাংসের চপ আমি খেয়েছি, খেতে তেমন ভালো নয় কিন্তু—

কাণা হরিপদ বলে - কি রকম খেতে রে খ্যাঁদা?

খ্যাঁদা বলে—ঠিক মেটে আলুর মতন, কি রকম মেটে-মেটে গন্ধ।

হৃদয় হালদার বলে—মালের সঙ্গে না খেলে ও তো মেটে মেটে লাগবেই—এই যে তেলেভাজা খাচ্ছি, এই তেলেভাজাই আবার মালের সঙ্গে খেলে অন্য রকম সুতার হতো।

—তুই খেয়েছিস? মিথ্যে বলবার আর জায়গা পাসনি হৃদে?

হৃদয় বলে—কেন, রসুলপুরের হেড মালী মতিলালকে জিজ্ঞেস করিস—খেয়েছি কি না খেয়েছি—এমনিতে নোনতা লাগে, কিন্তু চাট-এর সঙ্গে ভারি জমে মাইরি, খেলেই মনে হয় যেন মরে যাচ্ছি—

গরম আলুর চপটা মুখে পুরে কাণা হরিপদ তখন চিবোচ্ছে; বললে—মরতে বুঝি তোর বড় সাধ রে হৃদে?

হৃদয় বললে—দূর, মরতে যাবো কোন্ দুঃখে, কিন্তু নেশাটার কথা বলছি।

খ্যাঁদা বলে—ওই নেশাতেই মরবি তুই, ওই ঢুক-ঢুক করতে করতে একদিন পিপে খেতে ইচ্ছে করবে, তখন আসবে মেয়ে মানুষ—

হৃদয় হালদার মেয়েমানুষের নাম শুনেই তেতে উঠেছে, বেগুনিটা গিলে ফেলেই গান ধরলে—

বাঁশরী পরশি হৃদে মরমে রহিল বিঁধে
এ তো স্বর নয়, শর গো—

হঠাৎ গোবিন্দ সরকার খেঁকিয়ে ওঠে। বলে—থাম তোরা, মেয়েমানুষের নাম করতে পারবিনে আমার সামনে—থাক।

ছোকরারা তবু থামে না। মজা পায় আর হাসে।

বলে—আচ্ছা গোবিন্দদা, মেয়েমানুষের কথা শুনলে এত ঝাঁকিয়ে ওঠো কেন বল তো? সংসারে ও ছাড়া আর কি আছে মাইরি?

হৃদয় হালদার বলে—গোবিন্দদা আমাদের কলির ভীষ্মদেব গো—

কাণা হরিপদও টিপ্পনি কাটে। বলে—তোমার মনে রস-কস নেই তো, তোমার হাতে এত রস কোত্থেকে এল গোবিন্দদা? মাইরি, আলুর চপ নয়তো রস-বড়া!

হৃদয় হালদার আবার সুর করে গায়—

বাঁধা যার কাছে মন—
আছে তার প্রয়োজন,
সে বিহনে প্রাণে বাঁচিনে বাঁচিনে—
কতকাল আর প্রবোধি বচনে,
আর না মানে বারণ।

কিন্তু শ্রীপদ হাজরাকে দেখলেই ওদের গান বন্ধ হয়ে যায় হঠাৎ। নন্তা ময়রাকে আসতে দেখলেও আড্ডা ভেঙে যায়। দলবল সরে গিয়ে আড়ালে চলে যায়। সবাই চাঁদা করে ব্যবসা করে দিয়েছিল গোবিন্দকে, তাই জিজ্ঞেস করে—কেমন চলছে তোমার গোবিন্দ?

গোবিন্দ বলে—আজ্ঞে আপনাদের আশীর্বাদে আমার আর কোনো কষ্ট নেই।

—ঘরে তক্তপোষ কিনেছো দেখলাম?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনাদের আশীর্বাদে সবই হয়েছে!

নন্তা ময়রা বলে—তাহলে এইবার একটা বিয়ে হলেই হয়ে যায়। ঘর হলো, এবার ঘরণী হোক—

এ কথায় গোবিন্দ যেন কেমন গম্ভীর হয়ে যায় হঠাৎ। মুখের খাঁজগুলো ফুলে ফুলে ওঠে। গোবিন্দ উনুনের সামনে মুখ নীচু করে একমনে বেগুনি ভাজে।

বললাম—কিন্তু কাঞ্চনকামিনী ? ওই যে, কাঞ্চনকামিনী দেবী ? ও কে ?

—ওর গল্পই তো বলছি। তখন কি জানতাম মশাই।

তা নন্তা ময়রাই বা কেন, কেউই জানতো না। ওই শ্রীপদ হাজরা, চণ্ডী ঘোষ, কটাই সান্যাল, গণেশ পাড়ুই, অনন্ত ভট্‌চার্য্যি, এমনকি কাঁচির মা-ও জানতো না। জানলো পরে, অনেক পরে। যেদিন গাড়ি এসে দাঁড়ালো একটা। বিরাট-গাড়ি। তার ভেতর থেকে নেমে এলো একটি মেয়ে। বিচিত্র সাজগোজ। সিল্কের ফিনফিনে শাড়ি, হাতে কানে নাকে হীরে মুক্তো। ঝল-মল করছে মেয়েটা। একবারে চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেবার মত চেহারা। আর মেয়েমানুষ নয়তো যেন আগুন। যেখানে ছোঁবে, পুড়িয়ে ভস্ম করে দেবে। সে কি মেয়ে! নন্তা ময়রা যেন চিনতে পারলে চেহারাখানা দেখে। যেন রসুলপুরের ছোটবাবুর সঙ্গে গাড়িতে দেখেছে। বাঁশের মাচায় বসেছিল নন্তা ময়রা। গাড়িটা কলকাতা থেকে আর সোজা রসুলপুরের দিকে গেল না। একেবারে কুলুইচণ্ডীর মন্দিরের সামনে বটগাছের তলায় এসেই থামলো। তারপর ড্রাইভার নেমে দরজা খুলে দিলে। ঝপাং করে একটা শব্দও হলো দরজা বন্ধ করার। আর চোখের সামনে যেন জগদ্ধাত্রী মূর্তি। এলো করা চুল, কপালে সিঁদুরের টিপ, সদ্যস্নানকরা চেহারা। দেখলে প্রণাম করতে ইচ্ছে হয়।

নন্তা ময়রা একলা মেয়েমানুষ দেখে এগিয়ে গিয়েছিল। মেয়েটিও তাকে দেখে আসছিল সামনের দিকে। কাঞ্চনকামিনী বললে—এইখানে বসে একজন তেলেভাজা ভাজতো না ?

নন্তা ময়রা বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, কিন্তু—

—এ জমিটা কার ?

তখন কাঞ্চনকামিনীকে দেখে আরো কয়েকজন লোক দৌড়ে এসেছে। হৃদয় হালদার, ন্যাপা হরিপদ, খাঁদা পালিত, অনন্ত ভট্‌চার্য্যি এসে জড়ো হয়েছে। যেন রাজরাণীকে দেখছে।

অনন্ত ভট্টাচার্য্য এগিয়ে এলেন। মুখ সামনে এনে বললেন—মায়ের কোথা থেকে আসা হচ্ছে ?

কাঞ্চনকামিনী কিন্তু সে-কথার উত্তর দিলো না।

বললে—আমি জিজ্ঞেস করছি, এ জমিটা কার ?

অনন্ত ভট্টাচার্য্য বললেন—আজ্ঞে এ জমি, এই কুলুইচণ্ডীর মন্দির, এই বাদামতলা সবই জমিদারের।

কাঞ্চনকামিনী বললে—কোন্ জমিদার ?

অনন্ত ভট্টাচার্য্য বললেন—সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটে থাকেন।

—নাম-ধাম তাঁর ?

নাম-ধাম জেনে নিয়েই চলে গেল কাঞ্চনকামিনী। আর তার কিছুদিন পরেই মিস্ত্রী মজুর এলো। ইট, চুন, সুরকি, শ্বেতপাথর এলো। কিন্তু সে-কথা এখন থাক।

হৃদয় হালদার বললে—চিনতে পারলি হরিপদ ?

খ্যাঁদা পালিত বললে—আমি চিনতে পেরেছি।

গণেশ পাড়ুই বললেন—ওই গোবিন্দই তো সেবার মায়ের মন্দিরের চূড়োয় উঠেছিল শকুন তাড়াতে।

অনন্ত ভট্টাচার্য্য বললেন—তোমরা তখন আমার কথায় কান দাওনি বাবাজি, আমিই বলেছিলাম ওর সর্বনাশ হবে, মহাপাতক হবে ও। মায়ের রাগ যে-সে রাগ নয়—এখন বোঝো।

নন্তা ময়রা বললে—আমার যেন মনে হলো কোথায় দেখেছি মেয়েটাকে—

হৃদয় হালদার বললে—এই বাদামতলাতেই দেখেছি।

—কবে ? কখন ?

তা সত্যিই তখন কেউ ভাবেনি যে এমন কাণ্ড হবে। তখন কেই-বা চিনতো গোবিন্দ সরকারকে! গোবিন্দ সরকার নিজেই যে বলেছিল কেউ নেই তার। সেই কথাই সবাই বিশ্বাস করেছিল।

তেলেভাজা দোকানের সামনে বসে হৃদয় হালদার বলতো—কলকাতা ছেড়ে কেন এখানে এলে গোবিন্দদা ? কি সুখ ?

গোবিন্দ সরকার তেলেভাজা ভাজতে ভাজতে হাসতো শুধু কিছু বলতো না।

—কলকাতায় কত হরেক মজা, কত রস,—আর এখানে একলা ঘরে শুতে তোমার ভাল লাগে—

গোবিন্দ সরকার তবু কিছু বলতো না। আপন মনে বেগুনিগুলো তুলে তুলে চুপড়িতে রাখতো।

খ্যাঁদা পালিত বলতো—চলো গোবিন্দদা, একদিন কলকাতা ঘুরে আসি।

গোবিন্দ বলতো—দূর, তোরা যা, আমি কলকাতায় যাবো না—

—কেন, কলকাতার ওপর তোমার অত রাগ কেন গো ?

গোবিন্দ সরকার কোনও কথা বলতো না। চুপ করে থাকতো।

খ্যাঁদা পালিত বলতো—তোমায় বলতেই হবে, কেন কলকাতার ওপর এত রাগ তোমার—বলতেই হবে—

গোবিন্দ সরকার বলতো—কলকাতায় বাঘ আছে—

—বাঘ ?

অবাক হয়ে যেত খ্যাঁদা পালিত, কাণা হরিপদ আর হৃদয় হালদারের দল। বলতো—বাঘ কোথায় পেলে তুমি কলকাতা শহরে ?

—আছে রে, বাঘ আছে ; সব এক-একটা আস্ত মানুষখেকো বাঘ—

—কাণা হরিপদ বলতো—আমি কালীঘাটে পূজার সময় গেছি ! বাঘ তো দেখিনি !

গোবিন্দ সরকার বলতো—বউ-ছেলেমেয়ে নিয়ে কলকাতায় যাস দেখবি, বাঘে কামড়াবে–তারপর এসে এই বাদামতলায় বসে তখন তেলেভাজা ভাজবি আমার মত।

হৃদয় হালদার বলতো—তোমাকে বাঘে কামড়েছে গোবিন্দদা ?

–ওরে বাবা, বাঘে কামড়ায়নি, বলিস কি ? বুকটা দেখলে বুঝতে পারতিস—

—দেখি তোমার বুক দেখি ?

—সে বুকের একেবারে ভেতরে। দেখাতে পারিনে, কামড়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে।

এরপর আর বেশি কথা বলে না কেউ। নন্তা ময়রার দোকান থেকে সবাই ভাঁড়ে করে চা এনে খেতে শুরু করে। গোবিন্দ সরকারের কথায় চায়ের আমেজটা যেন ভেঙে খান্ খান হয়ে যায়।

হৃদয় হালদার একদিন কথাটা বার করবার জন্যে আস্তে আস্তে বললে—আচ্ছা গোবিন্দদা, তুমি বুঝি বিয়ে করেছিলে -

গোবিন্দ সরকার হৃদয়ের দিকে কটমট করে চাইলে একবার। তারপরেই তেলেভাজার গরম কড়াটা মাটিতে নামিয়ে বললে—মেলা বাজে বকিসনি, আমি তোর ইয়ার ?

বললাম—তারপর ?

নন্তা ময়রা বললে—তা তখনও আমি কাঞ্চনকামিনীকে দেখিনি মশাই। ঠিক সেই সময়। তখন একদিন মেলা বসেছে কুলুইচণ্ডীতলায়। দলে-দলে লোক আসছে গাঁ-গঞ্জ থেকে। ক্ষেত-খামারের কাজ ফেলে চাষীরা আসছে মেলায় সওদা করতে সন্ধ্যেবেলা। মেলা বিকেলের দিকেই পাতলা হয়ে আসে। দূর-দূর থেকে আসে সবাই, রাত বিরেতের অন্ধকারে গাড়ি ফিরতে পারবে না। ওদিকে কালাগঞ্জ, মগরা, বাবুইহাটি, তিলজলা, চিংড়িপোতা থেকে সব হেঁটে-হেঁটে, কেউ বা গরুর গাড়ির মেলা দেখতে এসেছে। বউ-ছেলেমেয়ে নাতি-নাতনি সঙ্গে করে এনেছে। বিক্রি-বাটা তখন একটু

হালকা, খালি পায়ে মাচাটার ওপর বসে সারাদিনের পর একটু হাওয়া খাচ্ছি ওদিক থেকে একজন লোক সামনের দিকে এগিয়ে এলো।

এগিয়ে এসে বললে—পটুয়াখালির গোবিন্দ সরকার এখানে কোথায় থাকে বলতে পারেন ?

খোঁড়া নিতাই তখন মন্দিরের সামনে প্রাণপণে ঢাকের ওপর কাঠি চালাচ্ছে। কথাটা ঠিক যেন শুনতে পেলাম না। আরো কাছে গিয়ে বললাম—কাকে খুঁজছো ?

লোকটার চেহারায় জৌলুস আছে দেখলাম। বোঝা যায় কলকাতা শহরের লোক। চুল ছাঁটা, ফতুয়া পাঞ্জাবি, ছাতি জুতো দেখে আর সন্দেহ থাকে না যে কলকাতা থেকে আসছে লোকটা।

তাই আবার জিজ্ঞেস করলাম—কাকে খুঁজছো বলছো ?

লোকটি বললে—গোবিন্দ, পেটোখালির গোবিন্দ সরকার।

দেখিয়ে দিলাম গোবিন্দ সরকারের চালাখানা। বললাম—বট গাছের ওই পূব-দক্ষিণ কোণের চালাটা—ঠেলো গিয়ে—

লোকটা চলে গেল গোবিন্দর ঘরের দিকে। ওদিকে তখন খোঁড়া নিতাই নেচে নেচে ঢাক বাজিয়ে চলেছে—কুড়ু তাক্ কুড়ু তাক, তাক্‌কুড়্, তাক্—। রাজ্যের লোক এসে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে বাজনা শুনছে। কাঁচির মা নাতি-নাতনি নিয়ে এসেছে। হৃদয় হালদার, কানা হরিপদ আর খ্যাঁদা পাতিলের দল দূরে দাঁড়িয়ে মেয়েছেলেদের দিকে আড়চোখে চেয়ে হাসাহাসি করছে। শ্রীপদ হাজরা হুকো নিয়ে দোকানের সামনে বসে গণেশ পাড়ুই মশাইয়ের সঙ্গে দিনকালের কথা আলোচনা করছেন। অন্ধকার হয়ে আসছে, মাটিতে বেসাতি ছড়িয়ে যারা বিক্রি করছিল, তারা একে একে কুপি জ্বালিয়ে দিয়েছে। মেলা ভেঙেই গেছে। বটফলগুলো লোকের পায়ের চাপে চ্যাপ্টা হয়ে সারা জায়গাটায় ছড়িয়ে আছে। অনন্ত ভট্টাচার্য্য মশাই মন্দিরের বাইরে এসে বাতাসা প্রসাদ বিলোচ্ছেন—

এমন সময়—

এমন সময় হঠাৎ হৈ-চৈ হল্লা সুরু হলো পূর্ব-দক্ষিণ কোণাকুনি।

—বেরো, বেরো হারামজাদা, বেরো এখেন থেকে—

গোবিন্দ সরকারের গলা। গোবিন্দ সরকার তো এমন চেঁচিয়ে কথা বলে না কখনো। নিজের দোকান নিয়েই আছে। হঠাৎ সেই গোবিন্দ এমন ক্ষেপে উঠলো কেন ?

বাঁশের মাচা থেকে লাফিয়ে সামনে গিয়ে দেখি, অবাক কাণ্ড! গোবিন্দর

ঘরের সামনে গোবিন্দ মারমুখী হয়ে তেড়ে এসেছে লোকটার দিকে। লোকটা পালিয়ে যেতে পথ পাচ্ছে না।

গোবিন্দ বলছে—বেরো, বেরো এখেন থেকে। বেরিয়ে যা!

লোকটা বলছে—কথাটা ভালো করে শোনো তুমি, গোবিন্দ।

গোবিন্দ সে-কথা শুনবে না। বলে—আমি শুনতে চাইনে কোনো কথা, সুবাসী আমার কেউ নয়!

—তা সুবাসীর মরার খবরটা তোমাকে দেবো না তো কাকে দেবো?

—সুবাসী আমার কেউ নয়, কেউ ছিল না কোনও কালে—সুবাসীর নাম করতে পারবি না আমার কাছে।

লোকটা বলে—তা খবরটা তোমাকে দেওয়া দরকার মনে হলো তাই এলাম—তা কি এমন অপরাধ করেছি শুনি?

গোবিন্দ বলে—যদি সুবাসীর নাম উচ্চারণ করিস তো তোকে মেরে গুঁড়ো করে ফেলবো অক্ষয়, এই বলে রাখছি—সুবাসী মরুক, ঝরুক; সুবাসী গোল্লায় যাক, জাঁহান্নামে যাক, আমার কি? সুবাসী কে আমার? কেউ নয়—আমার কেউ নেই সংসারে, আমি কলকাতা ছেড়ে বাদামতলায় এসে আছি, তাতেও তোদের সহ্য হচ্ছে না অক্ষয়? আমি কি তোদের জন্যে গলায় দড়ি দেবো বলতে চাস?

—তা তুমি যা ইচ্ছে করো, আমার কি! তোমায় খবরটা দিতে হয়, তাই আসা।

গোবিন্দ বললে—তা এবার বেরিয়ে যা—

অক্ষয় যেন কেমন রেগে উঠলো এবার। বললে—তা তোমার রাগ কেন অত আমার ওপর শুনি?

গোবিন্দ বললে—রাগ হবে না? তোরাই তো যত নষ্টের গোড়া, তোরাই তো সুবাসীকে ফুঁসলে-ফাঁসলে পথে বসালি। রাগ হবে না তোদের ওপর?

—তা সুবাসীকে গান শেখাবার বেলায় মনে ছিল না তখন?

চীৎকারে তখন মেলার লোকজন জড়ো হয়েছে গোবিন্দর ঘরের সামনে। কাণা হরিপদ, খ্যাঁদা পালিত, হৃদয় হালদার সবাই জড়ো হয়েছে শ্রীপদ হাজরা, গণেশ পাড়ুই মশাইও এসে গেছেন। অনন্ত ভট্টাচার্য্যিও নামাবলি গায়ে এসে তাজ্জব ব্যাপার দেখতে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

গোবিন্দ বললে—কি? কি বললি তুই আমায়?

—বলছি, যখন সুবাসীকে নাচ শেখালে, গান শেখালে তখন মনে ছিল না?

গোবিন্দ বললে—তোরাই তো তখন সুবাসীকে নাচিয়ে তুলেছিলি, তখন আমি মানা করলে শুনতো ?

অক্ষয় বললে—তা তুমি কেন গৌর বেটাকে ঘরে আশ্রয় দিলে ? তখন তো ভাবলে বেশ দু'পয়সা আসবে। পরের ঘাড় ভেঙে সংসার চলে যাচ্ছে—

—তোরাই তো বললি, ওর কেউ নেই, তোমার ঘরে থাকতে দাও।

—তা গৌর যদি না থাকতো তোমার ঘরে, তো খেতে কি শুনি ? তুমি তখন তো মুড়ি-তেলেভাজা বেচে চারগণ্ডা পয়সাও রোজগার করতে পারতে না। দু'টি প্রাণীর চলতো কিসে শুনি—আর ওই গুণধরীকে নিয়ে ?

—মুখ সামলে কথা বলবি অক্ষয় সুবাসীকে তুই মা বলে ডাকতিস, পরকালেও তোর গতি হবে না—তা জানিস ?

—পরকালে কি তোমারই গতি হবে ভেবেছো ? সুবাসীর পাপের অন্ন তুমি খাওনি ?

হঠাৎ ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠল গোবিন্দ। দোরের খিলটা খুলে নিয়ে উঁচু করে ধরলে—তোকে আস্ত পুঁতে ফেলতে পারি আমি, জানিস্ ? তোরা কলকাতার ছেলে আর আমি গাঁয়ের মানুষ—

বলে খিলটা অক্ষয়ের মাথা লক্ষ্য করে ফেলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ ধরে ফেললে নন্তা ময়রা।

গোবিন্দ সরকার তখন মরিয়া হয়ে উঠেছে। বললে—ছেড়ে দিন বড়বাবু, ওই অক্ষয় আমাকে এতবড় কথা বলল, আমি সুবাসীর পাপের অন্ন খেয়েছি !

—খেয়েছিসই তো। পাপের অন্ন খাসনি তুই সুবাসীর ? বুকে হাত দিয়ে বলতে পারিস তুই খাসনি ?

গোবিন্দ তখনও হাঁফাচ্ছে। বললে—তোরাই তো আমাকে বাসা দিলি, খাতির করে তোদের পাড়ায় থাকতে দিলি, ব্যবসা করে দিলি—সব তো সুবাসীর জন্যে নয় ?

নন্তা ময়রা তখনও গোবিন্দর হাত দুটো ধরে আছে। কিন্তু কেউ কিছুই বুঝতে পারছিল না।

নন্তা ময়রা গোবিন্দর দিকে চেয়ে বললে—ব্যাপারটা কি ? সুবাসী কে ?

গোবিন্দ সরকার কোনও উত্তর দিলে না। অক্ষয়ের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে নন্তা ময়রা কে হে ? সুবাসী কে ?

অক্ষয় বললে—ওকেই জিজ্ঞেস করুন না বাবু, ও-ই বলুক না সুবাসী

ওর কে ?

গোবিন্দ আবার লাফিয়ে উঠলো।

—তোর মুখ ভেঙে দেব অক্ষয়, মুখ সামলে কথা বলিস—

অক্ষয়ও সোজা লোক নয়। বললে—সুবাসীর পাপের অন্ন খেয়ে তোমার মুখও সোজা থাকবে না গোবিন্দ—এই বলে রাখলাম।

—তা তোরাই তো সুবাসীকে রাতের বেলা বায়োস্কোপ দেখাতে নিয়ে যেতিস, থিয়েটার দেখাতে নিয়ে যেতিস, যেতিস না।

অক্ষয় রুখে উঠলো। বললে—আমি নিয়ে যেতাম না। গৌর, তোমার ঘরের লোক।

—গৌর হলো আমার ঘরের লোক? এই কথা তুই বললি?

গোবিন্দ আবার বললে—গৌর হলো আমার ঘরের লোক? গৌর হলো বামুনের ছেলে—কলকাতার লোক, আমি হলাম কয়েত—পাড়া-গাঁয়ের লোক। গৌর কিসে আমার ঘরের লোক হলো?

অক্ষয় বললে—তা ঘরের লোক না হলে গৌর সুবাসীকে শাড়ী কিনে দিতো কেন?

গোবিন্দর মুখখানা কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেল কথাটা শুনে। যেন হঠাৎ জল পড়বার উপক্রম হলো। মনে হলো, গোবিন্দ যেন এখনি হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেলবে। নন্তা ময়রা সেইদিকে চেয়ে তার হাত দু'টো হঠাৎ ছেড়ে দিলে।

বললে—সুবাসী কে গোবিন্দ?

গোবিন্দ এবারেও সে-কথার উত্তর দিলে না।

অনন্ত ভট্টাচার্য এতক্ষণ সব অবাক হয়ে শুনছিলেন। কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। গণেশ পাড়ুই মশাইও চুপ করে শুনছিলেন সব। হৃদয় হালদার, কাণা হরিপদ, খ্যাঁদা পালিতও শুনছিল। ইটখোলার চণ্ডী ঘোষ এতক্ষণ কিছুই দেখেন নি। হঠাৎ ভীড় দেখে এগিয়ে এলেন। বললেন—এখানে কি হয়েছে হাজরামশাই?

অনন্ত ভট্টাচার্য বললেন—আমি তখনই বলেছিলাম, সর্বনাশ হবে ওর, ঘাতক হবে। মায়ের মন্দিরে চড়েছে। মায়ের রাগ যে-সে রাগ নয়।

-তবু ব্যাপারটা কি শুনি?

অক্ষয়ের দিকে চেয়ে নন্তা ময়রা বললে—সুবাসী কে হে?

গোবিন্দ সরকার তখন আবার চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। হঠাৎ কাঠের খিলটা নিয়ে তেড়ে এলো অক্ষয়ের দিকে। বললে—আমার ঘর জ্বালিয়ে আমাকেই খবর দিতে এসেছে। বেরো হারামজাদা, বেরো এখেন থেকে—

বেরো।

কথাটা বলেই খিলটা নিয়ে তেড়ে এসেছে অক্ষয়ের দিকে। কিন্তু নন্তা ময়রা ধরে ফেলবার আগেই লাঠিটা গিয়ে মাথায় পড়েছে অক্ষয়ের। কিন্তু অক্ষয়ও ততক্ষণে ভিড় ঠেলে একেবারে বাদামতলার বাইরে গিয়ে হাজির।

গণেশ পাড়ুই বললেন—ব্যাপারটা কি হে নন্তা, কিছুই তো বুঝছি না—

নন্তা ময়রা বললে—কি গোবিন্দ, ও লোকটা কে? কোত্থেকে এলো?

অনন্ত ভট্টাচার্য্য বললেন—আমি তোমাদের তখনই বলেছিলাম বাবাজী, ওর মহাঘাতক হবে, সর্বনাশ হবে, হবেই সর্বনাশ, দেখো।

হৃদয় হালদার বললে—সুবাসী কে গো গোবিন্দদা—

গোবিন্দ সরকারের তখন কোনোদিকেই কান নেই। গজগজ করতে করতে বলছে—হারামজাদা আমায় সুবাসীর মরার খবর দিতে এসেছে, সুবাসী মরেছে তা আমার কি! আমার ভারি মাথাব্যাথা সুবাসীর জন্যে, দূর—দূর—

হঠাৎ গোবিন্দ সরকার কেমন ফ্যাকাশে হয়ে হাসতে লাগলো।

নন্তা ময়রা চাইলে শ্রীপদ হাজরার মুখের দিকে। শ্রীপদ চাইলে গণেশ পাড়ুই মহাশয়ের মুখের দিকে। হৃদয় হালদার চাইলে কাণা হরিপদর দিকে। হরিপদ চাইলে খ্যাঁদা পালিতের মুখের দিকে।

অনন্ত ভট্টাচার্য্যই এই নীরবতা ভাঙলেন। বললেন—মায়ের রাগ যে-সে রাগ নয়। তোমাদের বলেছিলাম, তোমরা বিশ্বাস করোনি তখন—

কিন্তু গোবিন্দ সরকার ততক্ষণে নিজের ঘরের ভেতর ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।

* * *

বললাম—কাঞ্চনকামিনী? কাঞ্চনকামিনী দেবী? ওই যে শ্বেতপাথরের স্তম্ভটা করে দিয়েছে? কে-সে?

নন্তা ময়রা বললে—সেই তার কথাই তো বলছি আজ্ঞে। কাঞ্চনকামিনীকে কি আমরাই চিনতাম না চিনতাম, সুবাসীকে। কে-যে সুবাসী আর কে যে কাঞ্চনকামিনী তখন জানি না। আর গোবিন্দও কি কিছু বলে?

কিন্তু আসল কাণ্ডটা তার পরেই ঘটলো কিনা।

আসল ঘটনা ঘটবার আগেই হৃদয় হালদার দৌড়তে দৌড়তে এলো পরদিন। বললে—বড়বাবু, গোবিন্দদা চলে গেছে!

নন্তা ময়রা বললে—সে কি রে? কোথায় চলে গেছে?

সত্যিই গোবিন্দ সরকার চলে যাবার জন্যে তৈরি জিনিসপত্র সব

গুছিয়ে নিয়েছে। জিনিসপত্র বলতে আর কি আছে! দু'খানা ধুতি, গামছা, ফতুয়া একটা। আর মাটি গামলা, উনুন, খুন্তি কড়া ওসব থাকলো। নিয়ে যাবার মত কিছু নয়। সংসার আর করবে না। এখানে এই বাদামতলাতেও সংসার গড়ে উঠেছিল আস্তে আস্তে। কানা হরিপদ, খ্যাঁদা পালিত, হৃদয় হালদার যেমন রোজ আসে ভোরবেলা তেমনই এসেছিল। অন্যদিন ভোরে এসেই তেলেভাজা তৈরী পায়! হাতে গরম, ভিজে গরম তেলেভাজার সঙ্গে সকালবেলাকার জমে উঠে। আজ কিন্তু বাদামতলা ফাঁকা। ভোরবেলাই গোবিন্দ সরকার উঠেছে। কেউ টের পায়নি। অন্য দিনের চেয়ে বেশি ভোরে সকাল থেকেই মেঘলা ছিল। বৃষ্টি বুঝি ভেঙে পড়বে। ডোবার ধারে ব্যাংগুলো সারারাত গলা ফাটিয়ে ডেকেছে। চান সেরে নিয়েছে গোবিন্দলাল সেই সকালে। তারপর ভেবেছিল কুলুইচণ্ডীর মন্দিরে গিয়ে একেবারে মা'কে পেন্নাম করে আসব। দূর! কি হবে পেন্নাম করে! জাগ্রত দেবতা না ছাই। সুবাসী মরুক, কি আসে যায় তাতে। সুবাসী বায়োস্কোপ দেখতে ভালোবাসতো, বায়োস্কোপই দেখুক। এখন মজা করে থিয়েটার দেখুক, বায়োস্কোপ দেখুক। কেউ কিছু বলতে আসবে না। বলা-কওয়ার বাইরে চলে গেছে সে। ওই অক্ষয়, ওই গৌর ওরাই তোর আপনজন হলো রে! ওরাই তোকে খাওয়াক, পরাক, স্বর্গে নিয়ে যাক! কেউ দেখতে আসবে না। শাড়ী পেয়েছে, গয়না পেয়েছে, বাবুদের সঙ্গে হাওয়া-গাড়িতে ঘুরছে। যতদিন যৌবন আছে, দেখুক বায়োস্কোপ। পরুক গয়না-গাঁটি। আমি আর নেই ওতে। আমার সংসারে আর দরকার নেই। ঘেন্না ধরে গেছে। পই-পই করে বারণ করলেও যে শোনে না, তার মরণ হওয়াই ভালো। মরুক, ঝরুক আমার কি? বাতাসীকে যে এসব দেখতে হয়নি, তাই তার কপাল! ধাতুর দেবতা পেন্নাম করে তো রাজা হবে লোক।

ভিজে কাপড়েই ঘরে এলো গোবিন্দ সরকার। বাদামতলায় তখন আবছা আবছা অন্ধকার। নন্তা ময়রা, শ্রীপদ হাজরা মশাই কারো দোকানের ঝাঁপ তখনও খোলেনি। বটগাছের তলায় ঝুড়ি-ঝুড়ি বটফল পড়ে আছে। হঠাৎ দূরে কোথায় মেঘ ডেকে উঠলো। গুড়গুড় করে আওয়াজ হলো একবার দক্ষিণদিকটার আকাশটা কালো হয়ে আছে একেবারে। এখনি বৃষ্টি এলো বলে।

এবার আর শহর-ঘেঁষা জায়গা নয়। এমন জায়গা যেখানে অক্ষয় পৌঁছতে পারবে না, গৌর টের পাবে না। সুবাসীর নাম কেউ জানবে না। সুবাসীর নাম উচ্চারণ করাও পাপ যে! গোবিন্দ তখন বেরিয়ে

পড়েছে দক্ষিণদিকের পথ ধরে, আর তখনই সবাই এসে হাজির।

নন্তা ময়রা বললে—যাবে আর কোথায়, আছে কাছাকাছি—

হৃদয় হালদার বললে—আমি তো অনেকক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে আছি। নিশ্চয়ই চলে গেছে।

শ্রীপদ হাজরাও ছুটে এসেছেন। বললেন—কি হলো?

গণেশ পাড়ুইও এদিকে এসেছিলেন বেড়াতে। শুনে বললে—মায়ের মন্দিরের চুড়োয় উঠেছিল—সে?

অনন্ত ভট্টাচার্য পূজো করতে আসছিলেন, তিনিও দাঁড়িয়ে পড়লেন। বললেন—আমি তখনই তোমাদের বলেছিলাম, মহাঘাতক হবে, সর্বনাশ হবে ওর। তখন তো তোমরা বিশ্বাস করোনি কেউ—মায়ের রাগ কি যে-সে রাগ!

তখন ওদিকে-আরো কালো করে মেঘ করে এসেছে। সেইদিকে চেয়ে শ্রীপদ হাজরা নিজের দোকানের দিকে ছুটলেন। নন্তা ময়রা দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করতে ছুটলো। অনন্ত ভট্টাচার্যি মশাইও মেঘ দেখে নিজের কাজে ছুটলেন। গণেশ পাড়ুই আগেই বাড়ির দিকে ফিরে গেছেন।

কাণা হরিপদ বললে—সুবাসী কে রে খ্যাদা! টের পেলি কিছু?

খ্যাঁদা পালিত বললে—গোবিন্দদা কি বিয়ে করেছিল নাকি রে? বলেছিল কিছু?

হৃদয় হালদার বললে—ও যাবে কোথায়! ও নিশ্চয়ই ফিরে আসবে, দেখিস! ওদিকে তিনদিন ধরে খুব বৃষ্টি হয়ে সব ভেসে গেছে—যাবার তো রাস্তাই নেই।

কাণা হরিপদ বললে—তা কলকাতার দিকের রাস্তা তো খোলা—

—কলকাতা যাবে! ক্ষেপেছিস। কলকাতার ওপর হাড়ে-হাড়ে চটা, জানিস না—ও নিশ্চয়ই রসুলপুরের দিকে গেছে।

আর বলতে না বলতে বৃষ্টি এলো ঝমঝমিয়ে। প্রথমে বটগাছের মাথায় পট্-পট্ শব্দ। তারপর ধুলো উড়িয়ে কাণা করে দিলে চোখ। তীরের ফলার মত বৃষ্টির ফোঁটাগুলো জোরে এসে গায়ে বেঁধে। দিনের বেলাতেই রাজ্যের অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। বাদামতলায় হুড়্ হুড়্ শব্দ করতে করতে জল জমে পুকুর হয়ে এলো। সে এক বৃষ্টি বটে। কাজ-কারবার বন্ধ ক'দিনের জন্যে। কুলুইচণ্ডীর মন্দিরের সামনে পৈঠের নীচে কল্-কল্ করে জলের স্রোত বইতে লাগলো।

হৃদয় হালদার চালার নীচে দাঁড়িয়ে বললে—এমন দিনে গরম তেলে-ভাজা হলে ভারি জমতো রে—

কাণা হরিপদ বললে—গোবিন্দদা কোথায় গেল, বল তো মাইরি—

খ্যাঁদা পালিত বললে—আমার কাছে এখনও তিন টাকা পেতো।

সেই একটা লোক, কেমন করে কিসের জ্বালায় এমন সুখের ব্যবসা ছেড়ে কোথায় গিয়ে রইলো—তাই ভাবতে লাগলো সবাই। কেন গেল? দেনা তো কিছু ছিল না তার, বরং পেতো কিছু-কিছু সকলের কাছেই। তবু আর কিছু না হোক, বৃষ্টির দিনে গরম তেলেভাজার কথা মনে পড়লেই যেন গোবিন্দর কথা মনে পড়া স্বাভাবিক।

নন্তা ময়রা বললে—বোকা মানুষ ছিল বটে লোকটা, কিন্তু তার জন্যে মন কেমন করছে ক্ষেত্তোর—

ক্ষেত্তোর বললে—আমি তো তাই ভাবছি বড়বাবু। লোকটা মন্দ ছিল না—

—কিন্তু এমন না বলে-কয়ে গেল কোথায়?

শ্রীপদ হাজরা তামাক খেতে খেতে বললেন—বৃষ্টি বাদলের দিনে একটা শেয়াল-কুকুরও বাইরে বেরোয় না হে—

ওই লোকটাই যত নষ্টের গোড়া, ওই যে কলকাতা থেকে এসেছিল!

—কিন্তু ওই যে সুবাসী-সুবাসী করছিল, সুবাসী কে বলুন তো বড়বাবু?

—বউ-টউ হবে বোধহয়।

খ্যাঁদা পালিত বললে—আমি বলছি সুবাসী ওরই বউ, পালিয়ে গিয়েছে—

—কার বউ?

খ্যাঁদা পালিত বললে—গোবিন্দদার বউ, আবার কার!

বৃষ্টি ছাড়লো একটু দুপুরবেলার দিকে। তখন বাদাম তলার ডোবার চারপাশে ব্যাংগুলো আরো জোরে ডেকে উঠলো। ডোবার কচুর ডাঁটা-গুলো সতেজ হয়ে উঠলো আরো। প্যাচপেচে পেছল হয়ে উঠলো ডোবার পৈঠের ধাপ ক'টা। নন্তা ময়রা উঁকি মেরে দেখলে বাইরে বাদামতলায় জনপ্রাণী নেই। হৃদয়ের দলটা এতক্ষণ গোবিন্দর চালাটার নীচে বসে বিড়ি খাচ্ছিল, এবার বৃষ্টির ঝাপটা কমতে যে-যার বাড়ি গিয়ে উঠেছে। এ বৃষ্টিতে খদ্দের আর কেউ আসবে না।

জো'র গলায় ডাকলেন—হাজরামশাই আছেন নাকি -

—কে? নন্তা?

হাজরামশাই ঝাঁপের আড়াল থেকে উত্তর দিলেন।

—কি করছেন?

—কি আর করবো, তামাক খাচ্ছি।

নন্তা বললে—খবর শুনেছেন ? রসুলপুরের রাস্তা ভেসে গেছে।

—কে বললে ?

নন্তা ময়রা বললে—ক্ষেত্তোর এলো যে; রাস্তা একেবারে পুকুরসমান হয়ে গেছে। ওদিকের কুলপিতে বান আসতে সব নাকি ডুবে গেছে—

—তা'হলে চণ্ডী ঘোষের ইটখোলা ?

নন্তা ময়রা বললে—ওদিকে কুলপির ধার ঘেঁষে বৈকুণ্ঠপুর অবধি কিছু আর ডুবতে বাকি নেই হাজরামশাই। কটাই সান্যালের পটলের ক্ষেত, চণ্ডী ঘোষের ইটখোলা কিছু আর দেখা যাচ্ছে না, সব শুনছি জলের তলায়—

শ্রীপদ হাজরা বললেন—সেই সেবারের মত হবে নাকি ?

সেবারেও এমনি হয়েছিল। এই বছর-দুই হলো এমনি হচ্ছে। কুলপির জল একটু বৃষ্টি হলেই একেবারে টুই-টুম্বুর হয়ে উঠে। সেই জল প্রথমে বৈকুণ্ঠপুর, তারপর বাঘমারি, তারপর তিলজলা, সব ভাসিয়ে একেবারে বাদামতলার দক্ষিণ-পূর্বের কিনারা পর্যন্ত ডুবিয়ে দেয়। ঘর-বাড়ি সব ছেড়ে লোকজন রসুলপুরের ডাঙায় গিয়ে ওঠে। ওদিকে রসুলপুর আর এদিকে বাদামতলা—এই দুটো জায়গা শুধু জেগে থাকে। মাঝখানে শুধু জল। জলের স্রোতে ভিটে, ভিটের চালা, গাছপালা, গরু-বাছুর কুকুর, ছাগল সব ভেসে আসতে থাকে। এমনি হচ্ছে বছর-দুই ধরে। সেই সময় কংগ্রেসের লোক, লাল-ঝাণ্ডার লোক এসে জড়ো হয়। তারা চিঁড়ে ওষুধপত্র-কাপড় বিলি করে। খালি নৌকো নিয়ে যায় দলে দলে। তারপর নৌকো-ভর্তি লোক নিয়ে আসে ডাঙায়। কতকগুলো উপোসী মানুষের ভীড় জমে যায় যায় সারা অঞ্চল জুড়ে। কলকাতা থেকে ডাক্তার আসে। তাঁবু খাটিয়ে হাসপাতাল হয়। লঙ্গরখানার সামনে টিকিট নিয়ে দলে দলে লোকেরা সার দিয়ে দাঁড়ায়! বান আসার পরেও দু'মাস-তিনমাস ধরে এমনি চলে। তারপর বানের জল যখন নেমে যায়, তখনও চণ্ডী ঘোষের ইঁটখোলা কাদা-মাটিতে বোঝাই হয়ে থাকে। তখন মশার উৎপাত আর রোগের মহামারী বাড়ে। গণেশ পাড়ুইয়ের মেজছেলেটা সেবারে সেই অসুখে মারা গেল। কাঁচির-মা'র ছোট নাতনীটা সেবারেই শোথ হয়ে ভুগে ভুগে মরলো। কাণা হরিপদর ছোট ভাইটা ডোবায় সাঁতার কাটতে-কাটতে ডুবে মরলো সেইবার। এমনি করে কেটেছে দু'-দুটো বছর। বাদামতলার লোক বানের কথা ভাবলেই কেমন একবার আঁতকে ওঠে ভয়ে।

শ্রীপদ হাজারা আবার বললেন—সেই সেবারের মতন অবস্থা হবে নাকি নন্তা ?

সন্ধ্যার দিকে বৃষ্টির তেজ যেন বাড়লো আবার। খবর এলো রসুলপুরের রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে।

বাগান-বাড়ির দু'-চারজন বাবুদের গাড়ি গিয়ে মাঝপথে আটকে গিয়েছিল, তারপর আবার কোনোরকমে ফিরেছে। রসুলপুর ডোবেনি বটে, কিন্তু রাস্তা বন্ধ। কলকাতায় খবর গেছে। বৈকুণ্ঠপুর থেকে লোকজনদেরও সরানোর ব্যবস্থা করতে হবে সোঁ-সোঁ করে কয়েকটা গাড়ি যেন সামনের আলো জ্বালিয়ে চলে গেল। সারা বাদামতলা ঝাঁ-ঝাঁ অন্ধকার। জোনাকির ঝাঁক এসে জমাট বেঁধেছে বটগাছটার তলায়, কুলুইচণ্ডীর মন্দির-গোড়ায়। ডোবাগুলো ভেসে একাকার হয়ে মাঠে ঠেকেছে। তার ওপর কচুগাছগুলো মাথা তুলে হুঁশিয়ার করছে কেবল।

নন্তা ময়রা বললে – কি করছেন হাজরামশাই?

—কি আর করবো, তামাক খাচ্ছি।

—আর কিছু খবর-টবর পেলেন?

হাজরামশাই বললেন – শুনেছো, গণেশ পাড়ুই মশাইয়ের নতুন গোয়াল-শালাটা ধ্বসে পড়েছে।

নন্তা ময়রা বললে—শুনছি, সাড়া সাড়ির বান আসবে নাকি কাল?

— কে বললে?

—ক্ষেত্তোর।

কিন্তু ভোর হতে-না-হতেই কেমন যেন ফরসা হয়ে এলো সেদিন টিনের চালে জল পড়ার শব্দ আর শোনা গেল না। নন্তা ময়রা ঘরের ঘুলঘুলি দিয়ে বাইরের আকাশের পানে চেয়ে দেখলে! তেমন কাল্‌চে ভাব আর নেই আকাশের। কেমন যেন ঘোলাটে নীলচে নীলচে আজ। বৃষ্টি বুঝি থেমে গেল! এক নাগাড়ে ক'দিন ধরে জল পড়ে-পড়ে এখন বুঝি একটু থামলো। ভোর না-হতেই টোকা মাথায় দিয়ে নন্তা এসে দোকানের ঝাঁপ খুললো। তখন বাদামতলা আগের দিনের বৃষ্টির দাপটে থম্‌থম্ করছে। ঝিঁঝিঁ পোকা আর ব্যাং ডাকছে অনবরত। চারদিকে একবার চেয়ে দেখলে নন্তা। শ্রীপদ হাজরা আসেননি এখনো। কুলুইচণ্ডীর মন্দিরগোড়ায় তখনও স্যাঁতসেঁতে জল-কাদা। বটফল আর বটপাতায় সারা জায়গাটা একাকার হয়ে গেছে। ওদিকে গোবিন্দর ঘরখানার সামনে কাদের একটা ছাড়া-গরু বুঝি রাত কাটিয়েছিল, নোংরা করে দিয়েছে জায়গাটা। কালকেই দরজাটায় শেকল লাগিয়ে একটা তালা ঝুলিয়ে দিয়েছিল নন্তা। আর তার ওদিকে ডোবাটার ধার ঘেঁষে ঈশান চৌধুরীর কাঁচা ইঁটের পাঁচিলটা ধ্বসে পড়ে আছে! কখন পড়েছে টের পায়নি কেউ। হঠাৎ মনে হলো—

নন্তা ময়রা আবার ভালো করে চেয়ে দেখলে। ঠিক যেন বিশ্বাস হলো না। ঝাপসা অন্ধকারের সামনের আলোটা দেখে বোঝা গেল একটা মোটরগাড়ি। গাড়িটা চলছে না, কল বিগড়ে খারাপ হয়ে গেছে। এমন সময় গাড়িটা এখানে কেন! আস্তে-আস্তে নন্তা ময়রা এগিয়ে রাস্তায় দিকে গেল। আলো দুটো জ্বালিয়ে বিরাট একখানা গাড়ি রাস্তাটা এড়িয়ে যেন বটগাছের তলায় এসে দাঁড় করিয়েছে।

নন্তা ময়রা আরো সামনে এগিয়ে গেল। ভিতরে যেন সিগ্রেট খাচ্ছে কেউ? দু'জন সিগ্রেট খাচ্ছে।

—কে?

ভেতর থেকে গম্ভীর গলা শোনা গেল। গলাটা শুনেই নন্তা ময়রা চমকে উঠলো।

—ছোটবাবু!

নন্তা ময়রা বললে—আমি নন্তা ময়রা আজ্ঞে—

—নন্তা ময়রা কে?

—আজ্ঞে, আমার ময়রার দোকান আছে এই বাদামতলায় হুজুরকে আমি চিনি খুব হুজুরের হেড মালী মোতিলাল আমার দোকান থেকে সিঙ্গাড়া-কচুরি নিয়ে গেছে। কতবার!

ছোটবাবু গাড়ির ভেতর নড়ে বসলেন। পাশের মেয়েমানুষও নড়ে বসলেন। ছোটবাবু পোড়া সিগারেটটা টেনে বাইরে ফেলে দিলেন। ভিজে জলে পড়ে ছ্যাঁক করে একটা শব্দ হলো। তারপর আবার একটা সিগারেট ধরালেন। এবার দেশলাইয়ের মৃদু আলোকে অন্ধকারটা পাতলা হতেই নন্তা ময়রা ছোটবাবুর মুখটা দেখতে পেলে। পাশের মেয়েমানুষটির মুখও দেখা গেল এক মুহূর্তের জন্য! নতুন মুখ। এ মুখ তো আগে দেখেনি কখনো। একে আবার কবে জোটালেন ছোটবাবু! কালো রং, কিন্তু চটকদার চেহারা। ঠোঁটে রং, কাজল আঁকা ভুরু! কানের দুল জোড়া ঝিকমিক করে উঠলো।

—একটা আলো আনতে পারো তুমি, এই হ্যারিকেন-ট্যারিকেন—

—আজ্ঞে খুব পারি।

নন্তা ময়রা দৌড়লো। রসুলপুরের দিক থেকেই আসছে গাড়িখানা, হয়তো বাগান-বাড়ি থেকে আসবার পথে বানের জলে আটকে গিয়েছিল! দোকানে গিয়ে ডাকলে—ক্ষেত্তোর—

ক্ষেত্তোর ভেতরেই ঘুমোয়। বললে—বড়বাবু?

বৃষ্টি-বাদলের রাতে ঘুমটা একটু গাঢ় হয়েছিল বেশ। শেষরাতেও ঘুম

ভাঙেনি তাই। ধড়-মড় করে জেগে উঠলো।

নন্তা ময়রা বললে—হ্যারিকেনটা জ্বেলে দে তো—

গাড়ির মধ্যে ছোটবাবু বললেন—এবারে ফুর্তিটাই মাটি হয়ে গেল বৃষ্টির জন্যে—কি কাণ্ড বলো দিকিনি। বোতলটায় আছে কিছু, না শেষ হয়ে গেছে ?

ছোটবাবু বোতলটা নিজেই উপুড় করে গলায় ঢেলে দেখলেন। এক ফোঁটাও অবশিষ্ট নেই। দূর হোক ছাই। এবারকার ফুর্তিটাই মাটি ? ছোটবাবু ভেবেছিল কামিনীকে নিয়ে নিরিবিলি বেশ ফুর্তি করবেন ক'টা দিন। কিন্তু এমন বান এলো। শেষে রসুলপুরই ডুবে যেতো আর কি !

কামিনী তখনও ভিজে শপ্ শপ্ করছে। এক কোণে হেলান দিয়ে বললে—গাড়িটা নতুন না পুরানো গো ?

ছোটবাবু বললেন—গাড়ির দোষ কি বলো, জলে যে আটকে পড়িনি এই তো ঢের—অন্য গাড়ি হলে এতক্ষণ—

কামিনী বললে—তা বলে চাল দিয়ে এত জল পড়লো কেন ?

ছোটবাবু বললেন—আজকালকার গাড়িগুলোই এমনি। কমিশন-টমিশন কেটে উনিশ হাজার টাকা গুণে দিয়েছি, জানো !

একটু থেমে ছোটবাবু বললেন—একটু গা ঘেঁষে বসো না। শরীরটা গরম হয়ে যাবে'খন তোমার···

কামিনী খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো অন্ধকারের মধ্যেই। বললে—এত বৃষ্টিতেও তোমার গরম কাটলো না বুঝি ?

—এ গরম কি আর বৃষ্টিতে কাটে ?

ছোটবাবু সরে এলেন একটু। বললেন—মাইরি কামিনী, বৃষ্টির সাধ্যি নেই এই গরম কাটায়—

কামিনী আরো পাশে সরে গেল। হাসতে হাসতে বললে—না বাপু, আমার বাপের সাধ্যি নেই তোমার গরম কাটায়—এ তোমার ওই মালের গরম নিশ্চয়ই—

কামিনী আবার বললে—এখন আজকের মধ্যে বাড়ি পৌঁছতে পারলে বাঁচি।

ছোটবাবু খোসামোদ করে আরো গায়ের কাছে ঘেঁষে এলেন। বললেন—রাগ করলে নাকি ?

—রাগ করবো না ? উনিশ হাজার টাকা দিয়ে পচা-গাড়ি কিনতে পারো, আর আমার বেলাই যত টাকা কম পড়ে তোমার ?

ছোটবাবু তোয়াজ করতে লাগলেন! বললেন—বৃষ্টিতে দেখছি তোমার

মেজাজও বিগড়ে গেছে কামিনী।

কামিনী বললে—না-গো, আমাদের মেজাজ অত পলকা নয়—আমরা তো ঘরের বউ নই, আমাদের আখেরের কথা ভাবতে হয়। তাই দু'টো কড়া কথা বলে ফেলি—

ছোটবাবু বললেন—তা তোমারই বা দোষ কি। আমারই মেজাজ বিগড়ে যাবার জোগাড়—

কামিনী বললে—এখন গাড়ি যদি না চলে? যদি আটকে থাকে।

ছোটবাবু বললেন—একটু সকাল হলেই লোকজন ডেকে ঠেলবার ব্যবস্থা করছি, দাঁড়াও না-

কামিনী বললে—ততক্ষণ বাঁচলে তো!

—বালাই ষাট, এ কথা বলতে আছে মাইরি?

কামিনী বললে—তা তোমার যা কাণ্ড, দেখে ভরসা হয় না। এক কাপ চা পেলেও হতো।

ছোটবাবু বললেন—দাঁড়াও না, লোকটা হ্যারিকেন আনতে গেছে, ওকে দিয়ে চা আনাচ্ছি।

হঠাৎ কামিনী বললে—তোমার সেই রঙ্গলালের কি খবর গো?

—রঙ্গলাল! হঠাৎ রঙ্গলালের কথা মনে পড়লো যে এখন?

—না এমনি, তোমার বন্ধু লোক তো?

—বন্ধু না ছাই, ব্যাটা দালাল, তুমি চিনলে কি করে?

কামিনী খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো—কিন্তু বেশ মজার লোক সত্যি। তখন বয়েস কম ছিল, আমাকে প্রথম প্রথম খুব বায়োস্কোপ দেখাতো, থিয়েটার দেখাতো, ওরই সঙ্গে তো প্রথম এ-লাইনে এলাম।

ছোটবাবু আবার একটা সিগারেট ধরালেন। বললেন—তাই তো বললাম, বেটা হারামজাদার একশেষ, কেবল ভদ্রলোকের মেয়েদের বার করে আনার মতলব—

কামিনী বললে—না, তা ওর কিছু দোষ নেই।

—কেন? রঙ্গলাল আমার কত টাকা খেয়েছে জানো? ওকে পেলে আমি চাবুক মেরে ওর পিঠের চামড়া তুলে দেবো।

হঠাৎ কামিনী চারিদিকে চেয়ে বললেন—হ্যাঁ-গো, এ জায়গাটার নাম কি? যাবার সময় এখেনে গরম তেলেভাজা খেয়েছিলাম, না?

ততক্ষণে নন্তা ময়রা দৌড়তে দৌড়তে হ্যারিকেন নিয়ে হাজির হয়েছে। বললে—একটু দেরি হয়ে গেল হুজুর—হ্যারিকেনে তেল ছিল না।

ছোটবাবু বললেন—তোমাদের এখানে লোকজন পাওয়া যাবে? আমি পয়সা দেবো।

—লোকজন?

এই গাড়িটা জল পার হয়ে এসেছে তো মেশিন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, একটু ঠেলতে হবে।

নন্তা ময়রা বললে—একটু সকাল হোক, আমি লোকজন ডেকে সব জোগাড় করে দেবো হুজুর—আপনি ভাববেন না।

পাশ থেকে কামিনী বললে—একটু চায়ের বন্দোবস্ত করতে পারবে?

—সে কি কথা দিদিমণি, এখুনি করে আনছি।

বলে নন্তা ময়রা আবার দৌড়ে গেল দোকানের দিকে! আবার ডাকলে—ক্ষেত্তোর—টপ করে দু'কাপ চা কর দিকিন—

ক্ষেত্তোর বললে—কে এসেছে বড়বাবু?

সেই যে ছোটবাবু একটা নতুন মেয়েমানুষ জুটিয়েছে, সে এসেছে। বানের জলে গাড়ি আটকে পড়ে গেছে এখেনে।

কামিনী বললে—হ্যাঁ গো, সেই যে সেদিন ভোরে তোমার সঙ্গে তেলে-ভাজা খেয়েছিলাম, সে রকম পাওয়া যায় না?

ছোটবাবু বললেন—দাঁড়াও না, সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি—

—বেশ গরম-গরম আলুর চপ দিয়ে চা খেতে ইচ্ছে হচ্ছে।

হঠাৎ নন্তা ময়রা দৌড়তে দৌড়তে আবার এলো। হাতজোড় করে বললে—চা হয়ে গেছে হুজুর, এখেনে এনে দেবো? যদি অনুমতি করেন—

তারপর গাড়ির ভেতরের অবস্থা দেখে বললে—এখেনে কি চা খাবার সুবিধে হবে দিদিমণির?

কামিনী বললে—তুমি তেলেভাজা খাওয়াতে পারবে আমাদের?

—আজ্ঞে। নন্তা ময়রা কেমন কিন্তু-কিন্তু করতে লাগলো।

ছোটবাবু বললেন—আমি মোটা বকশিস দেবো, সেবার সেই তেলেভাজা খেয়েছিলাম, সেইরকম গরম-গরম—

নন্তা ময়রা একটু বিব্রত হয়ে বললে—আজ্ঞে, সে-রকম তেলেভাজা তো হবে না। যে লোকটি ভাজতো, সে হঠাৎ চলে গেছে।

—চলে গেছে।

নন্তা ময়রা বলে—আপনারা যদি একটু দয়া করে বসেন এসে, আমি সব ব্যবস্থা করে দিতে পারি হুজুর। হুজুরের কোনও কষ্ট হবে না, এখেনে

ওই জলকাদার মধ্যে—

সেই জলকাদার মধ্যেই সেদিন নন্তা ময়রা ছোটবাবু আর কামিনীকে গোবিন্দর ঘরে নিয়ে গিয়ে বসিয়েছিল। মাটির ঘর। তা হোক, একটা তক্তপোষ আছে। শুকনো খটখটে। চাবি খুলে ঘরে বসিয়ে নন্তা বলেছিল—একটু অপেক্ষা করুন হুজুর, আমাদের গাঁয়ে এসেছেন, একটু আপ্যায়ন না করে কি ছাড়তে পারি—

তা শেষ পর্যন্ত ছোটবাবু, ছোটবাবুর মেয়েমানুষ দুজনেই গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে বসেছিল গোবিন্দর ঘরে।

সেদিন তেলেভাজা খাইয়েছিল নন্তা ময়রা। তবে তেমন হয়নি। গোবিন্দর হাতের তেলেভাজার মত হয়নি অবশ্য। কিন্তু ভালো লেগেছিল ছোটবাবুর। দিদিমণি নিজের ব্যাগ খুলে বকশিস দিয়েছিল ক্ষেত্তোরকে। ক্ষেত্তোরই চা-তেলেভাজা নিজে হাতে করে পরিবেশন করেছে, মিষ্টি মিষ্টি কথা বলেছে। ছোটোবাবুর নতুন মেয়েমানুষ। ছোটবাবু রসুলপুরের বড় খদ্দের। তাকে খাতির করলে বাদামতলার ব্যাপারীদের লাভ বই লোকসান নেই।

তক্তপোষের ওপর বসিয়ে নন্তা ময়রা বলেছিল—একটু আয়েস করেই বসুন দিদিমণি, আমি লোকজন ডেকে সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।

একটু ফরসা হতেই সকলে এসে হাজির। শ্রীপদ হাজরা এসে সব দেখে-শুনে বললেন—ভাগ্যিস গোবিন্দর ঘরখানা ছিল, তাই একটু আদর আপ্যায়ন করা গেল—

বৃষ্টিতে তখন বসে-ধ্বসে গেছে চারদিক, রসুলপুরের জল তখনও নামেনি। বৈকুণ্ঠপুর, বাগমারি, তিলজলার জলও কিন্তু আর বাড়েনি বিশেষ। খবর আসতে লাগলো একে একে। ডোবার ধারের পাঁচিলটার যে-টুকু বাকি ছিল, ভোরের দিকে তাও ধ্বসে গেল একেবারে ঝপাং করে। কিন্তু বৃষ্টি ধরে গেছে। শুধু ভিজে মাটির ওপর তখনও বটফল ছড়িয়ে আছে রাজ্য জুড়ে। কুলুইচণ্ডীর মন্দিরের পৈঠের নীচে জল ভরে গেছে। শ্রীপদ হাজরা আবার দোকানের ঝাঁপ খুলেছেন, ক্ষেত্তোর আবার বিরাট কড়াটায় জিলিপি চড়াচ্ছে। হৃদয় হালদার, খ্যাঁদা পালিত, কাণা হরিপদ আবার অভ্যেসমত সকালবেলাই এসে জুটেছে। ছোটবাবুর বিরাট গাড়িটা দেখেই কেমন যেন সন্দেহ হয়েছিল। এমন দিনে ছোটবাবুর গাড়ি এখানে কেন? তবে কি কোনো বিভ্রাট বেধেছে! সঙ্গে মেয়েমানুষ আছে নাকি?

সামনে নন্তা ময়রাকে দেখেই হৃদয় হালদার জিজ্ঞেস করলে—বড়বাবু,

ছোটবাবুর গাড়ি দেখছি যে ?

নন্তা ময়রা তখন একবার দোকান, একবার গোবিন্দর ঘরে যাতায়াত করছে।

—আর দু'টো বেগুনি দেবো দিদিমণি ?

ছোটবাবু বললেন—ওহে, এবার কয়েকটা লোক দরকার হবে, গাড়ি ঠেলবে—

—আজ্ঞে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ততক্ষণ আরাম করে চা খান, আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি দেখুন না—

বলেই নন্তা ময়রা আবার দোকানে ছুটলো।

পথে কানা হরিপদ বললে—বড়বাবু, ছোটবাবুর সঙ্গে কেউ আছে নাকি ?

নন্তা ময়রা বিরক্ত হয়ে হাত নেড়ে বললে—আছে রে বাবা আছে। মেয়েমানুষ ছাড়া ছোটবাবু বাদামতলায় কি নেমতন্ন খেতে এসেছে ?

—কি রকম দেখতে বড়বাবু ?

কাণা হরিপদ বললে—দূর অত অধৈর্য হোস কেন, যখন ঘর থেকে বেরোবে তখন দেখবো—

খ্যাঁদা পালিত বললে—ভাগ্যিস গোবিন্দদা নেই, নইলে বড়বাবু কোথায় বসাতো ওদের ?

নন্তা ময়রা আরো গোটাকতক কচুরি ভাজিয়ে দৌড়তে দৌড়তে দিতে যাচ্ছিল, ওদের দেখে বললে—হ্যাঁরে, তোরা কি মেয়েমানুষ কখনো দেখিসনি ? এত আদেখলেপনা কেন তোদের ?

তারপর একটু থেমে বললে—একটা কাজ করতে পারবি খ্যাঁদা ?

—কি কাজ বড়বাবু ?

—পারবি কিনা তাই বল্ না বাপু! পয়সা পাবি, বকশিস্ দেবে ছোটবাবু—

তা ছোটবাবুর পছন্দর তারিফ আছে বলতে হবে। সকালবেলা আলোতে চেহারাটা আরো ভালো করে দেখা গেল। সত্যি চটকদার চেহারা, কথা বলবার সময় হাঁসের মত ঘাড় নাড়ে। আর কথা বললেই বাহার খোলে মেয়েটার হাতের চুড়ি, কানের দুল, আর শাড়ির আঁচলা সব মিলিয়ে যেন আগুনের হল্‌কা। রং কালো হলে কি হবে, চটকে ফরসা রঙকে হারিয়ে দেয়।

ছোটবাবু বললেন—বেশ কাটলো যা হোক সকালবেলাটা, মনে থাকবে

বহুদিন।

নন্তা ময়রা বললে—আজ্ঞে, আপনার হেডমালী মতিলাল আমাকে চেনে, আমার দোকান থেকে কতবার সিঙ্গাড়া-কচুরি নিয়ে গেছে হুজুরের জন্যে—

—বেশ, আবার তোমার দোকান থেকেই কিনবো! জানা রইলো। নন্তা ময়রা বললে—হুজুর, আমার দোকানে নোন্তা ছাড়া ভালো সন্দেশও পাবেন, আমি কলকাতার নবীন ময়রার কাছে কারিগর হয়ে কাজ শিখেছি, আমার বাবা বৈকুণ্ঠপুরের জমিদারবাবুর পেয়ারের ময়রা ছিল হুজুর। জমিদারবাবু বাবার তৈরি সন্দেশ খেয়ে তবে ভোরবেলা জলগ্রহণ করতেন।

—বেশ—বেশ, ভালো—ভালো।

কামিনী জিজ্ঞেস করলে—এ ঘরটা কার? কে থাকে এতে?

—আজ্ঞে থাকে না কেউ এতে, থাকতো সেই তেলেভাজাওয়ালা।

ওদিকে বৃষ্টির তেজ বুঝি একটু কমলো। একদল লোক জুটে গেছে। তারা গাড়ি ঠেলবে!

খ্যাঁদা পালিত নন্তা ময়রাকে দেখে বললে—বড়বাবু আমরা রেডি, এবার খবর দিন।

কাণা হরিপদ বললে—বড়বাবু, ছোটবাবুকে বলে দিন আমরা তিনজন আলাদা, ওরা সব অন্য ব্যাচ—আমাদের রেট আলাদা কিন্তু—

হৃদয় হালদার বললে—না রে, বক্‌শিস দিক চাই না দিক্, ও-গাড়ি ঠেলতেও তো আনন্দ।

আর তারপর ছোটবাবু বাইরে এলেন। কামিনীও বাইরে এলো একদল লোক যেন গিললো। কামিনী আস্তে-আস্তে গিয়ে গাড়িতে উঠলো। ছোটবাবু হ্যাণ্ডেল ধরলেন।

নন্তা ময়রা সামনে গিয়ে বললে—ঠ্যাল্-ঠ্যাল্ তোরা, আমার কথা মনে রাখবেন হুজুর—

ক্ষেত্তোর পয়সার জন্যে গাড়ি ঠেলতে এসেছিল। চীৎকার করে উঠলো—জয় মা চণ্ডীকে—জগদম্বে—

আর গড়-গড় করে গাড়িখানা চলতে-চলতে একেবারে ডোবার ধার পেরিয়ে চণ্ডী ঘোষের ইঁটখোলা-বরাবর গিয়েই ঘ্যাচাং করে উঠলো। একটা ধাক্কা দিলে হঠাৎ। আর কেমন গুড়-গুড় করে আওয়াজ উঠলো একরকম।

ক্ষেত্তোর বললে—এই চলেছে—চলেছে—

কিন্তু ছোটবাবু চালাতে গিয়েও একবার থামিয়ে দিলেন গাড়িটা। তারপর পাঞ্জাবীর ডান পকেটে হাত দিলেন।

ক্ষেত্তোর উঁচিয়ে ছিল। কিন্তু কাণা হরিপদ তার আগেই ছোঁ মেরে নিয়েছে দশ টাকার নোটটা।

হৃদয় হালদার বললে—তোমাদের সব আট আনা করে, আমাদের এক টাকা।

—কেন? কেন বুঝি একজন প্রতিবাদ করলে।

খ্যাঁদা পালিত বললে—তোমাদের অন্য ব্যাচ্, আমাদের আলাদা।

ক্ষেত্তোর অনেকক্ষণ ধরে গাড়িখানার দিকে চেয়ে রইলো! পলাশডাঙা পর্যন্ত দেখা যায়, তারপর রাস্তাটা বেঁকে গিয়ে বাঁদিকে চলে গেছে। তখন আর দেখা গেল না। সবাই আবার ফিরতে লাগলো বকশিসের জন্যে নয়, কিন্তু সবারই মনে হলো, গাড়িটা চলে না গেলেই যেন ভালো হতো। আরো কিছুক্ষণ ঠেলতে পারা যেত তা'হলে ও-গাড়ি ঠেলতে কষ্ট হলেও যেন আরাম।

গাড়ি চালাতে চালাতে ছোটবাবু একটা সিগারেট ধরালেন। কামিনীকেও একটা ধরিয়ে দিলেন।

কামিনী সিগারেট টান দিয়েই ছুঁড়ে ফেলে দিলে। বললে—দূর কি সিগারেট!

—কেন?

—একেবারে ভিজে গেছে, ও খেয়ে মরবো নাকি?

ছোটবাবু টান দিলেন আর-একটা। ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—নতুন ধরেছো কিনা—আমাদের ভিজে-ভিজেই সই।

—নতুন বোলো না, পাকা ঝুনো হয়ে গেছি।

—কদ্দিন খাচ্ছো?

—সেই রঙ্গলাল ধরিয়েছিল শখ করে। তখন থেকেই চলছে।

তারপর একটু থেমে বললে—অথচ দাদা সিগারেট খেতো বলে বাবা কি বকুনিটাই না দিতো—

—তোমার বাবা?

কামিনী হো হো করে হেসে উঠলো। বললে—অবাক করলে দেখছি, ঘরের বউ নই বলে কি আমার বাবাও থাকতে নেই?

ছোটবাবু বললেন—না, তা বলছি না—

—না গো তুমিতো ভারী বেনের ছেলে, আর আমি বামুনের মেয়ে, তা জানো?

ছোটবাবু হাসলেন। বললেন—তা এতই যখন টান, তখন এ লাইনে

এলে কেন শুনি ?

—আমরা না এলে তোমাদের কি গতি হতো শুনি, পাড়াপড়শীর মেয়ে-বউ নিয়ে তো টানাটানি করতে।

ছোটবাবু বললেন—ও বাবা, এত মাল খেয়েও জ্ঞান তো তোমার দেখছি টনটনে !

—আজ কিন্তু আমার কাছে গাড়ি পাঠিয়ো না—

—কেন ?

—তিনদিন ঘুমোতে দাওনি, আজ আমি ঘুমোবো।

ছোটবাবু বললেন—দর-টর বুঝি না বাপু, টাকার জন্যে তো প্রাণ দিতে পারি না।

গাড়ি এবার বাবুর বাজারের কাছে আসতেই কামিনী হঠাৎ বলে উঠলো—ওই যা—

—কি হলো ?

কামিনী বললে—গাড়ি ফেরাও—গাড়ি ফেরাও—

ছোটবাবু অবাক হয়ে গেলেন ; বললেন—কোথায় ?

কামিনী বললে—বাদামতলায়, শীগগির—

ছোটবাবু গাড়ি ঘুরিয়ে বললেন—বাদামতলায় আবার কেন ?

—চলো না, একটু শীগ্‌গির করে চলো লক্ষ্মীটি।

* * *

আমি বললাম—তারপর ?

নন্তা ময়রা বললে—তারপর সেই কাণ্ড! আমরা তো ওসব জানি না। বৃষ্টি কমলে আমরা তখন দোকান খুলেছি। শ্রীপদ হাজরা দোকানের ঝাঁপটা পুরোপুরি খুলে দিয়েছেন। গণেশ পাড়ুই মশাই কদিন বৃষ্টির জন্যে বেরোতে পারেননি। তিনি এসে তামাক খেতে বসেছেন। খ্যাঁদা পালিতের দলটা ফিরে এসে গেছে। এক টাকার কচুরি কিনে ভাগ করে খেতে বসে গেছে। ক্ষেত্তোর সেই মাত্র জিলিপীর কড়াটা নামিয়ে গজাটা উনুনে বসিয়েছে! একটু পরেই রসে ফেলা হবে। কাঁচির মা নাতনীর হাত ধরে বাতাসা কিনতে এসেছে।

কাণা হরিপদ দৌড়ে এসে খবর দিলে—বড়বাবু, গোবিন্দদা ফিরেছে। চাবিটা দিন—

—গোবিন্দ! কোথায় গেছলো!

কানা হরিপদ আবার দৌড়ে চলে গেল। বললে—কোথায় ছিলে

এতদিন গোবিন্দদা ?

গোবিন্দ সরকারের চেহারা দেখে সবাই অবাক হয়ে গেছে! হাঁটু পর্যন্ত কাদা কয়েকজন লোক ধরাধরি করে এনেছে। বললে—আর-একটু হলে জলে ডুবে যাচ্ছিল, আমরা ধরে তুলেছি। খাওয়া-দাওয়া হয়নি। দেখেছো না, কি রকম শুকিয়ে এসেছে শরীরটা!

তালাটা খুলে গোবিন্দকে ঘরে তোলা হলো।

খ্যাঁদা পালিত বললে—আর-একটু আগে এলে না গোবিন্দদা ?

আগে এলে মজা হোত একটা।

—কেন ?

হৃদয় হালদার বললে—এখনও গন্ধ পাচ্ছি রে—

—কিসের গন্ধ ?

কাণা হরিপদ বললে তোমার এই ঘরে এই তক্তপোষে এতক্ষণ শুয়েছিল, এইখানে বসে বা খেয়েছে, তেলেভাজা খেয়েছে—তুমি আগে এলে দেখতে পেতে—

গোবিন্দসরকার অবাক হয়ে গেছে। বললে—কে ? কে আমার ঘরে এসেছিল ?

হৃদয় হালদার বললে—ছোটবাবুর—

নন্তা ময়রা হঠাৎ ঘরে ঢুকেছে। গোবিন্দ তাকে দেখেই জিজ্ঞেস করলে —আমার ঘরে কে এসেছিল বড়বাবু ?

—আর কে, ছোটবাবু আর ছোটবাবুর মেয়েমানুষ। বৃষ্টিতে ভিজে একশা! বললাম, গোবিন্দ সরকারের ঘরটা রয়েছে ওখানেই বসুন—তা এখানে বসলো, চা খেলো, তেলেভাজা করে দিলাম, তেলেভাজা খেলো—

হৃদয় হালদার বললে—চেহারাটা কি রকম তাই বলুন বড়বাবু!

—রং কালো হলে কি হবে, চটক আছে চেহারার! মিহি গলা, ছোটবাবুর পছন্দ আছে—তোমার নাম করলাম, বললাম, গোবিন্দ একটু বাইরে গেছে, আবার আসবে। তা কোথায় গিছলে তুমি শুনি ?

হৃদয় হালদার বললে—আমরা ভাবলাম, আর বুঝি তুমি ফিরবেই না গোবিন্দদা।

খ্যাঁদা পালিত বললে—আমি তখনই জানতাম ফিরতেই হবে, গোবিন্দদা যাবে কোথায় ? বৈকুণ্ঠপুর বাগমারি, তিলজলা—সব ডুবে গেছে, রাস্তা বন্ধ—আর কলকাতায় তো যাবেই না গোবিন্দদা!

নন্তা ময়রা বললে—দেখে নাও, তোমার ঘর গোবিন্দ—যেমনকে তেমন

আছে—ছোটবাবুর মেয়েমানুষ তোমার ঘর দেখে আমায় জিজ্ঞেস করছিল, কার ঘর এটা। আমি বললাম, পেটোখালির গোবিন্দ সরকারের—আমাদের এখানে তেলেভাজা ভাজে—

তারপর যাবার আগে বললে—তা' হলে কাল থেকে আবার আরম্ভ করে দাও—আবার যেন মাথা খারাপ করে বেরিয়ে যেয়ো না—না-বলে-কয়ে—

গোবিন্দ সরকার নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলে। বললে—তোরা যা এখন, আমি একটু শোবো। কাল সকালে আসিস্।

বললাম— কিন্তু কাঞ্চনকামিনী ?

নন্তা ময়রা বললে—আগে শুনুনই তো। গোবিন্দকে তো তার নিজের ঘরে রেখে আমি চলে এসেছি দোকানে। শ্রীপদ হাজরা মশাই দোকানের খদ্দের নিয়ে ব্যস্ত। ক্ষেত্তোর গজা নামিয়ে তখন বাতাসার গুড়ে জ্বাল দিচ্ছে—এমন সময় হৈ-হৈ কাণ্ড! হল্লা, চিৎকার, মারামারি। আমি তো অবাক হয়ে গেছি।

হৃদয় হালদার তাড়াতাড়ি দৌড়ে এসে ডাকলেন—বড়বাবু, শীগ্‌গির আসুন—

শ্রীপদ হাজরা মশাই চীৎকার করে জিজ্ঞেস করলেন—ওখানে কি হচ্ছে হে ? এত গোলমাল কিসের ?

তা গোবিন্দর তখন সত্যিই মাথার ঠিক ছিল না। মাথা ঠিক রাখার কথাও নয়। এমন হবে কে জানতো! তখন সবে গোবিন্দ ঘরে গিয়ে ঢুকছে। হৃদয় হালদার, কাণা হরিপদ আর খ্যাঁদা পালিত চলে যেতেই গোবিন্দ তক্তপোষটার ওপর একটু গড়িয়ে নিতে গেছে। হঠাৎ নজরে পড়লো। প্রথমটায় কেমন একটু অবাক হতে হলো। মেয়েদের ব্যাগ, এ জিনিস এখানে আসে কি করে! কিন্তু হঠাৎ খেয়াল হলো, ছোটবাবুর মেয়েমানুষ এখানে এসে বসেছিল, বড়বাবু বলেছে। কি খেয়াল হলো ভারী বাহারে ব্যাগ। সুবাসীর হাতে ঠিক এই রকম ব্যাগই দেখেছে।

চীৎকার করে গোবিন্দ বললে—এ ব্যাগ এখানে কার রে খ্যাঁদা ?

ওরা বোধ হয় চলে গিয়েছিল। কোনো সাড়া পেলে না।

একবার মনে হলো—ব্যাগটা বড়বাবুকে দিয়ে আসাই ভালো। যার ব্যাগ সে-ই এসে নন্তা ময়রার দোকান থেকে নিয়ে যাবে।

অক্ষয় বলেছিল—তুমি সুবাসীর পাপের অন্ন খাওনি ?

সর্বাঙ্গ যেন জ্বলে গিয়েছিল অক্ষয়ের কথাটা শুনে। এতবড় কথা বললে অক্ষয়। গৌর বেটা যে বস্তিতে ছিল, গোবিন্দ নিজে নেমতন্ন করে এনেছিল তাকে। মুড়ি ফেরি করে বেড়াতো রাস্তায়—তাতে পয়সা রোজগার করেছে গোবিন্দ দস্তুর মত। ঘরভাড়া, কাপড়জামা, ধোপা নাপিত সবই চালিয়েছে। সংসার কে চালাতো শুনি। কে তার মুখ দেখে পয়সা দিয়েছে! এতবড় কথাটা বললে অক্ষয়। এতবড় কথাটা বলতে পারলে! সুবাসী যে চলে গিয়েছিল—সে-কি গোবিন্দ তাকে বায়োস্কোপ দেখাতে পারেনি বলে, না পেট ভরে খাওয়াতে পারেনি বলে।

গৌর বলেছিল—আমি কিছু জানি না দাদা, সুবাসী কোথায় গেছে, তা আমি কি করে জানবো?

—তা তুই জানিবেন তো কে জানবে? তুই-ই তো ঘরের ভেতর থাকিস! সুবাসীকে গন্ধতেল কিনে দিস, থিয়েটার বায়োস্কোপ দেখাস —দেখাস না?

—তুমি কেন সুবাসীকে যেতে দাও ওর সঙ্গে?

—কখন যায় আমি কি করে টের পাবো? আমাকে কি বলে? কিন্তু আশ্চর্য্য! সুবাসী যাবার সঙ্গে সঙ্গে গৌরও পালালো। তারও আর পাত্তা পাওয়া গেল না কোথাও।

ব্যাগটা আস্তে-আস্তে নাড়াচাড়া করতে-করতে কখন হঠাৎ মুখটা খুলে গেছে। সুবাসীর ব্যাগটায় কখনও হাত দেয়নি গোবিন্দ। কিন্তু মুখটা খুলে যেতেই হঠাৎ কতকগুলো নোট বেরিয়ে এলো। একটা দু'টো নয়, অজস্র! টাকাগুলো তুলতে গিয়েই গোবিন্দ কেমন যেন সাপ দেখে ভয়ে পিছিয়ে এলো। পাপের টাকা! পাপের টাকা এ-গুলো! সুবাসীর পাপের টাকা খেয়েছে সে। এ-ও সেই পাপের টাকা। কলকাতার পাপ, বায়োস্কোপের পাপ! ছোটবাবুর পাপ, ছোটবাবুর মেয়েমানুষের পাপ! সুবাসীর পাপ!

মাথাটা গরম হয়ে এলো গোবিন্দের। মনে হলো, কলকাতার পাপ যেন এই বাদামতলাতেও তার পেছু নিয়েছে! গোবিন্দ ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসতে গেল। হঠাৎ দরজা খুলতেই আর-এক কাণ্ড।

সামনেই সুবাসী দাঁড়িয়ে। সুবাসীই তো! কোনও ভুল নেই, কোনও সন্দেহ নেই। ঠিক সেইরকম খোঁপায় ঝুমকো কাঁটা, রেশমী শাড়ি, পায়ে জুতো, ঠোঁটে রঙ। ওই রঙ মাখা নিয়ে কতদিন সুবাসীর সঙ্গে ঝগড়া করেছে গোবিন্দ। বায়োস্কোপে যাবার সময় এইরকম সাজগোজ করতো

ঠিক সুবাসী! সুবাসীই তো! আর কেউ নয়!

দাওয়ার ওপর থেকে এক লাফে ঝাঁপিয়ে পড়লো গোবিন্দ।

লাফিয়েই চুলের ঝুঁটি ধরে ফেলেছে সুবাসীর।

—হারামজাদী! আমার মুখ পুড়িয়ে আমারই ওপর দরদ দেখাতে এসেছিস তুই। এতবড় আস্পর্ধা—

ছোটবাবু সামনে চীৎকার করে এগিয়ে এলেন।

—এই রাস্কেল?

নন্তা ময়রাও অবাক হয়ে গেছে।

গোবিন্দ কামিনীর চুলের মুঠি তখনও ছাড়েনি। চীৎকার করে বলছে—আমাকে তুই টাকা দেখাস্ সুবাসী, আমার দুঃখ ঘোচাবার জন্যে তুই টাকা দিয়ে গেছিস—তুই ভেবেছিস সুবাসী, আমি তোর টাকার তোয়াক্কা করি—

হৃদয় হালদার এতক্ষণ দেখছিল। বললে—গোবিন্দদা, করছো কি, কাকে মারছো? ছাড়ো—

গোবিন্দর যেন সেকথা কানে গেল না। বললে—তুই ভেবেছিস সুবাসী, তোর পাপের অন্ন আমি খাবো! তুই আমার মেয়ে, একথা ভাবতে পারলি?

ছোটবাবু আর সামলাতে পারলেন না। আবার গিয়ে গোবিন্দকে বাধা দিতে চাইলেন—এই রাস্কেল, উল্লুক কোথাকার, ছাড়্—

কিন্তু কামিনীই বাধা দিয়ে হাত উঁচু করে ইঙ্গিত করলে—থাক্—

কামিনীর মনে হলো—মারুক ও। আরো মারুক তাকে। হোক তার অচেনা—তবু যেন কামিনীর নিজের বাবাই তাকে শাসন করছে আজ। কামিনী ঘাড় গুঁজে মাথা নীচু করে রইলো। তার খোঁপা খুলে গেছে। চুলে টান পড়েছে। থর-থর করে কাঁপছে লোকটা। চোখদুটোও লাল হয়ে উঠেছে রাগে। হয়তো সুবাসী তার মেয়ে। সুবাসীকে হয়তো তার মতই দেখতে! কে জানে! কামিনীর মত সুবাসীও হয়তো বাপকে ছেড়ে পালিয়েছিল।

—বল সুবাসী, তুই কেন পালিয়ে গেলি? আমি তোর গরীব বাপ বলে?

কামিনীর চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগলো ঝর ঝর করে।

—আমি মুড়ি বেচে তোর শাড়ি কিনে দিইনি? বায়োস্কোপ দেখাতে পারতাম না বলে তুই বাপকে ছেড়ে গেলি? তোর এতটুকু মায়া হলো না

রে সুবাসী? তুই কি পাথর? আমি যে তারপর থেকে সাতদিন খাইনি, ঘুমোইনি!

কামিনীর মনে হতে লাগলো, এমনি করে কি তার বাবাও কেঁদেছে! এই লোকটার মত সাত দিন সাত রাত না খেয়ে, না ঘুমিয়ে কাটিয়েছে!

—আমাকে ক্ষমা করো বাবা! আমার মতিচ্ছন্ন হয়েছিল।

—তুই ভেবেছিস আমি তোর পাপের অন্ন খাবো! আমাকে তুই টাকা দেখাতে এসেছিস সুবাসী!

তারপর হঠাৎ কি যে হলো, গোবিন্দ কামিনীর চুল ছেড়ে দিলে। দিয়ে দুই হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলো হাউ হাউ করে।

আর কামিনী গোবিন্দর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

গোবিন্দ সেই মুখ ঢেকেই বলতে লাগলো—তোর জন্যে পাড়ার লোক আমায় গঞ্জনা দেয়—আমি ঘর ছেড়ে বাদামতলায় এলাম। এখানেও তুই আমাকে জ্বালাতে এসেছিস—

—তুই মরলিনি কেন সুবাসী, তাতেও যে আমি এর চেয়ে কম কষ্ট পেতাম। তুই আমার মুখ পোড়ালি কেন মা? আমার যে কলকাতায় যাবার মুখ নেই রে আর—

বলে আবার হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলো গোবিন্দ! কাঁদতে কাঁদতে কখন যে মানুষটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে খেয়াল ছিল না। মনে হলো, গোবিন্দ যেন আর সহ্য করতে পারছে না। এবার পড়ে যাবে। কামিনী উঠে দাঁড়িয়ে বললে—একে আপনারা কেউ একটু ধরে নিয়ে গিয়ে ঘরে শুইয়ে দিন না—

তারপর বললে—এর কেউ নেই এখানে?

নন্তা ময়রা বললে—ও তো একলাই থাকে এখানে দিদিমণি—কে আছে ওর তা-ও কেউ জানি না আমরা—বলেওনি কখনো।

গোবিন্দকে ধরাধরি করে আমরা সবাই শুইয়ে দিয়ে এলাম ঘরে। ছোটবাবুর মেয়েমানুষ হলে কি হবে, কি সেবা-যত্ন করলে গোবিন্দর কি বলবো! ডাক্তার ডাকলে, ওষুধ-পত্তরের ব্যবস্তা করালে। শেষে সন্ধ্যেবেলা চলে গেল।

ছোটবাবু জিজ্ঞেস করলেন—ও কি কেউ হয় তোমার?

কামিনী সে-কথার উত্তর না দিয়ে বললে—চলো, তোমার খুব নাকাল হলো—কি বলো?

ছোটবাবু একটা সিগারেট ধরালেন। কামিনীকে একটা দিতে গেলেন,

কিন্তু কামিনী বললে থাক, এখন খেতে ভালো লাগ ছে না—

নন্তা ময়রা বললে—তা কে যে সুবাসী, কে যে কামিনী তাও আজ পর্যন্ত জানতে পারিনি। পরে গোবিন্দর যখন মাথা খারাপ হয়ে গেল, তখনও উনুনটা নিয়ে বসতো গিয়ে বটগাছতলায়। কেউ গাড়ি থামিয়ে তেলেভাজা কিনতে এলে আমরাই গিয়ে সাবধান করে দিতাম। ছোটবাবু তখন অন্য মেয়েমানুষ নিয়ে রসুলপুরে আসতেন। বারে বারে তার মেয়েমানুষ পাল্টায় —ওটা ছোটবাবুর বরাবরের স্বভাব। কিন্তু কামিনী দিদিমণি একলা আসতেন। এসে গোবিন্দর খাওয়া-দাওয়ার খরচ দিয়ে যেতেন। সে একেবারে অন্যরকম চেহারা তখন। তারপর গোবিন্দ মারা যাবার পর একদিন এলেন? এসে এই জমিটুকু জমিদারের কাছ থেকে কিনে নিয়ে শ্বেতপাথার দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছেন। এখনও আসেন, আপাদমস্তক চাদরে ঢাকা, খালি পা, সে সিগারেট খাওয়া রঙ-মাখা চেহারা আর নেই। আগেকার সেই মানুষকে আর চেনাই যায় না। এসে মাঝে মাঝে ওখানে ফুল ছড়িয়ে দেন, পেন্নাম করেন—তারপর আবার চলে যান।

বললাম—কখনও জিজ্ঞেস করেন নি, গোবিন্দ সরকার ওঁর কে হতো?

—না, তা করিনি। তবে উনি নিজেই বলেছেন।

—কি বলেছেন?

নন্তা ময়রা বললে—কথায় কথায় একদিন বলেছিলেন, নিজের বাবাকে বড় কষ্ট দিয়েছি কিনা, তাই সুবাসীর বাবাকে সেবা করে যদি কছুটা প্রায়শ্চিত্ত হয়।

———

রূপ হ'ল তার অভিশাপ

রা. বি. রা.

রেনাসাঁ যুগের এক পরম বিস্ময় এই নারী। এর রূপের তুলনা নেই। ফ্লোরেন্সের এক অভিজাত বংশে এই তরুণীর জন্ম। নাম রেজাউরা মণ্টালবাণী। এই রূপবতীর কাহিনীই বলছি সংক্ষেপে।

প্রভাতে সে যখন বাতায়নের ধারে এসে দাঁড়াত, পথচারীরা তাকিয়ে থাকত তার দিকে মুগ্ধ-বিস্ময়ে, অপলক দৃষ্টিতে। রাস্তায় জমত ভিড়, গাড়ি আর সিডেন-চেয়ারের গতি হ'ত মন্থর। তরুণীর দিকে তাকিয়ে তারা ভাবত, 'আহা, কি অনুপম এর মুখশ্রী! বিধাতার কি অপূর্ব সৌন্দর্য-সৃষ্টি!'

সে আসত গির্জায় ভজন করতে। কিন্তু এখানেও বহুজনের মুগ্ধ দৃষ্টি পড়ত তার মুখের ওপর। মেরি মাতার নাম ভুলে গিয়ে তারা তাকিয়ে থাকত রূপসী মণ্টালবাণীর দিকে। গির্জার ভজনালয়ে দেখা দিত বিশৃঙ্খলা, চিত্ত চাঞ্চল্য। এত রূপ ছিল এই নারীর।

পথে বেরুলে কী বিপর্যয় ঘটত তার কাহিনী জানা নেই, কিন্তু তার পদার্পণে নগরীর বিপনীও চঞ্চল হয়ে উঠত। এখানেও দেখা দিত বিশৃঙ্খলা। শুধু ক্রেতা নয়, বিক্রেতারাও তাকিয়ে থাকত তার মুখের দিকে, তার চুম্বকপ্রবাহ চোখের দিকে। ভুলে যেত তারা কেনা-বেচার, হিসাব-নিকাশের কথা। কোন জিনিসের দামই তারা চাইতে পারত না তার কাছে, এমন আত্মহারা হয়ে যেত বিক্রেতারা এই মনোহারিণীকে দেখে।

আর যুবকদের তো রেহাই নেই—'পিয়া বিনু হিয়া মোর ফাটিয়া যে যায় রে'। প্রথম দর্শনেই তারা তো দিশেহারা, প্রেম নিবেদন করতে ছুটত তার আঙিনায়। ব্যর্থ প্রেমিকেরা নদীর জলে জীবন বিসর্জন দিত। আরনো নদীতে জেলেরা যখন মাছ ধরতে নামত, তখন তাদের জালে উঠত শুধু মাছ নয়, প্রেমপাগল যুবকদের মৃতদেহও।

যোদ্ধারাও অনুভব করত এই তরুণীর রূপের আকর্ষণ। তারাও প্রেম-নিবেদন করত এই রূপশিখার কাছে। কিন্তু তাদেরও প্রেম বারংবার প্রত্যাখ্যান করেছে সে। বিফল হয়ে তারাও চির বিদায় নিয়েছে এই

জগত থেকে।

কতদিন নগরপ্রহরীরা দেখেছে রাস্তার ধারে পড়ে আছে যোদ্ধাদের ছোরাবিদ্ধ রক্তাপ্লুত মৃতদেহ।

প্রেম-পাগল যুবকদের মাতাপিতার কাছে মণ্টালবাণী আশীর্বাদ নয়, অভিশাপ। তাই তারা নগরীর ধর্মাবতারদের কাছে অভিযোগ জানায়, প্রতিকার দাবী করে। এত বেশি সৌন্দর্য, এত বেশি রূপের অধিকারিণী যে, সে তো সমাজের ও রাষ্ট্রের শত্রু। তার বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই।

জজেরা সব অভিযোগ শোনে। রাষ্ট্রের কল্যাণ কামনাই তো তাদের জীবনাদর্শ। কিন্তু তারা তো অসহায়। এই রূপলাবণ্যময়ী তরুণীর দিকে তাকিয়ে তারাও হয় অভিভূত, তন্ময়। তাদের মধ্যেও দেখা দেয় চিত্ত চাঞ্চল্য, বিহ্বলতা তাই তারা সব অভিযোগ খণ্ডন করে মুক্তি দিল মণ্টালবাণীকে।

নগরীর এক কোষাধ্যক্ষ তহবিল তছরূপ করে ফেলল। বিপুল অর্থ ব্যয় করেও মণ্টালবাণীর মন হরণ করতে পারল না। তাই সে একদিন আত্মহত্যা করল। এবার কিন্তু জজেরা এই তরুণীকে শাস্তি দিতে উদ্যত হ'ল। শাস্তির ব্যবস্থা হ'ল—'পিলরি'।

কিন্তু কে এই দণ্ডাদেশ পালন করবে, কে এই রূপসীকে 'পিলরি'তে চড়াবে?

কোন লোকই রাজী হ'ল না এ কাজ করতে, এই সুন্দরীকে শাস্তি দিতে। কাজেই জজেরা এ ক্ষেত্রেও তাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হ'ল।

একদিন ফ্লোরেন্সের এক তরুণ ডিউক একটা ব্রাশ নিয়ে ছবি আঁকতে ঢুকলো এক ভজনালয়ে। দরজা সব বন্ধ করে, একান্ত নির্জনে সে ছবি আঁকতে লাগল তন্ময় হয়ে। ছবির পর ছবি এঁকে চলেছে এই বন্ধ ঘরে, আহার নেই, নিদ্রা নেই, বিশ্রাম নেই।

এদিকে তার বৃদ্ধ পিতা ব্যাকুল হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে তার পুত্রকে। কোথায় গেল সে? গির্জার দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে যা দেখল তাতে তার চক্ষুস্থির হ'ল। ভজনালয়ের পবিত্র দেওয়ালকে ভরিয়ে দিয়েছে সে বহু চিত্র এঁকে—সাধুসন্ত, দেবদেবী আর লাস্যময়ী পরীদের ছবি। কিন্তু কি আশ্চর্য! সব ছবির মধ্যেই তো মণ্টালবাণীর সেই মুখ, সব চিত্রই তো তার রূপলাবণ্যের প্রতিকৃতি। আর তরুণ ডিউককে দেখা গেল বসে রয়েছে এক বেদীর ওপর, নির্বাক, পাথরের মত নিশ্চল। কেবল চোখ দুটো তার ঘুরে

বেড়াচ্ছে দেওয়ালে আঁকা একটার পর একটা ছবির ওপর। মন্টালবাণীর রূপ যে তাকে পাগল করেছে।

অভিযোগের পর অভিযোগ আসছে মন্টালবাণীর বিরুদ্ধে। জজেরা আর নিশ্চেষ্ট থাকতে পারে না। ওকে এবার চূড়ান্ত শাস্তি দিতে হবে, তা না হলে ওর রূপ তো দেশে প্রলয় ঘটাবে, শান্তি-শৃঙ্খলা বিপন্ন করবে। এত রূপ নিয়ে ওর তো আর সমাজে একদিনও থাকা চলে না। ওকে কঠোর শাস্তি ভোগ করতেই হবে।

তাই এক নির্মম শাস্তির ব্যবস্থা করল বিচারকেরা। তাকে পাঠান হ'ল এক নির্জন কারাগারে। তার মুখের মাপে তৈরি হ'ল এক মৃত্যু-মুখোস। সারা জীবন তাকে কাটাতে হবে এই মৃত্যু-মুখোস প'রে মনুষ্য সমাজ থেকে দূরে। মুখ ঢেকেই তাকে থাকতে হবে সারাজীবন কারান্তরালে! এই অভিশপ্ত মুখ যেন কেউ আর দেখতে না পায় তারই ব্যবস্থা করল ফ্লোরেন্সের এই ধর্মাবতারেরা।

দীর্ঘ উনচল্লিশ বছর কাটল মন্টালবাণীর এই নির্জন কারাগারে। মৃত্যু-মুখোস পরেই কাটাতে হ'ল তাকে এই সুদীর্ঘকাল—ভোগ করতে হ'ল এই নির্যাতন।

এর পর ফ্লোরেন্সের গ্র্যাণ্ড ডিউক কসিমো বসলেন সিংহাসনে। তিনি সব বন্দীদের মুক্তির আদেশ দিলেন। মন্টালবাণীরও দীর্ঘ কারাবাসের অবসান ঘটল।

বন্দীদের বিবরণ পড়তে পড়তে ডিউকের চোখে পড়ল একটি বিস্ময়কর দলিলের পাণ্ডুর পাতা দেখে। যাতে লেখা ছিল সেই মৃত্যু-মুখোস-পরা নারীর কথা! সুন্দরী মন্টালবাণীর রোমাঞ্চকর কাহিনী। গ্র্যাণ্ড ডিউকের আদেশে সেই ভাগ্য-বিড়ম্বিত নারীকে হাজির করা হ'ল তার সামনে।

ডিউকের সামনেই তার মুখোস অপসারিত হ'ল। সেই বীভৎস মুখ দেখে ডিউক আতঙ্কে শিউরে উঠল।

এই কি সেই সুন্দরী, যার রূপ পাগল করেছিল ফ্লোরেন্সকে? এই কি সেই মন্টালবাণী, যার কটাক্ষে সারা দেশ যৌবন-চঞ্চল হয়ে উঠতো?

হায়, হায়। কোথায় গেল এত রূপ, তার সৌন্দর্য, এত রমণীর কান্তি?

ডিউক আর তাকাতে পারল না তার করুণ বীভৎস মুখের দিকে। সেই লোল-চর্ম বিকৃত মুখের দিকে। চোখে নামল তার বেদনার অশ্রুবন্যা। ব্যথাতুর মনে প্রশ্ন জানাল, বিধাতার এই অনবদ্য সৃষ্টিকে কেন নিশ্চিহ্ন করল নর-পিশাচেরা? কেন? কেন?

থাকে শুধু অন্ধকার

অনিল ভৌমিক

রঙ টিলা। নৈনীতাল থেকে হনুমানগড়ি যাওয়ার পথের ধারে এই ছোট্ট জায়গাটা। একটা মানসিক চিকিৎসার হাসপাতাল আছে এখানে। পথে যেতে হাসপাতালের সাইনবোর্ডটা সকলেরই নজরে পড়ে—রঙ্‌ টিলা মেন্ট্রাল এ্যাসাইলাম। নৈনীতাল মুসৌরী এলাকার ধনী লোকজনেরা চাঁদা তুলে এই হাসপাতাল গড়ে তুলেছেন। হাসপাতালের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ডাঃ কল্যাণ মিত্র অনেকদিন এই হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত আছেন। মানসিক রোগের একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে ডাঃ কল্যান মিত্রের খ্যাতি বহুবিস্তৃত।

অনেকটা জায়গা জুড়ে এই হাসপাতাল। হাসপাতালের নার্স এবং অন্যান্য স্টাফদের কোয়ার্টারও রয়েছে।

অরুণা সেন ডাঃ মিত্রের পি. এ.। অরুণা প্রথমে এই হাসপাতালের নার্সদের মেট্রন ছিল। কলকাতা থেকে ও যথেষ্ট যোগ্যতার সঙ্গে নার্সিং পাশ ক'রে এখানে এসেছিল। ওর কর্মক্ষমতা যোগ্যতা সহজেই ডাঃ মিত্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ডাঃ মিত্র ওকে পি এ. ক'রে নেয়। সে হ'য়ে গেল প্রায় বারো চৌদ্দ বছর।

সেদিন সন্ধ্যে থেকেই আকাশে মেঘের আনাগোনা চলছিল। বৃষ্টিও শুরু হ'ল একটু পরেই। পাহাড়ী এলাকার বৃষ্টি। কখন আসে কখন থেমে যায় তার ঠিকঠিকানা নেই।

অরুণা সন্ধ্যের আগেই নিজের কোয়ার্টারে ফিরে এসেছিল। ডঃ কল্যাণ মিত্র লেকচার ট্যুরে উড়িষ্যা গেছেন। কলকাতা হ'য়ে ফিরবেন এ রকম প্রোগ্রাম আছে। কথা আছে কবে ফিরবেন সেটা ডাঃ মিত্র পরে জানাবেন। ডাঃ মিত্র অনুপস্থিত। কাজেই অরুণার একরকম কোন কাজই নেই।

সন্ধ্যের একটু পরেই অরুণা খাওয়া দাওয়া সেরে নিল। তারপর বিছানায় শুয়ে আগাথা ক্রিস্টির একটা বই পড়তে লাগল। খুব যে একটা মন দিয়ে পড়ছিল তা নয়। সময় কাটানো আর কি, বাইরে তখন টিপ্‌ টিপ্‌ বৃষ্টি হচ্ছিল।

একটু পরেই মুষল ধারে বৃষ্টি নামল। সেই সঙ্গে ঘন ঘন বজ্রপাত।

আঁকাবাঁকা বিদ্যুতের উজ্জ্বল রেখা আকাশটাকে যেন চিরে ফেলতে লাগল। অরুণার ঘরের জানালার একটা কাঁচ ভাঙা। সেই ভাঙা জায়গাটা দিয়ে ঘরে জল ঢুকতে লাগল। অরুণা প্রথমে খেয়াল করে নি। যখন খেয়াল হ'ল যে ঐ দিকের জানালাটার কাঁচটা তো ভাঙা তখন একটু দেরিই হ'য়ে গেছে। ঘরের ঐ কোনায় বেশ জল জমে গেছে।

অরুণা লাফিয়ে বিছানা থেকে উঠল। ভাঙা জায়গাটা কী ক'রে আটকানো যায়? ও চারদিকে তাকাতে লাগল। দেখল হোয়াটনটের ওপর একটা পুরোনো ফাইল পড়ে আছে। ও ফাইলটা তুলে নিল। দেখল পুরোনো চিঠি পত্রের ফাইল। ও পোস্টবোর্ডটা ছিঁড়ে নিল। জানালায় ওটা লাগাতে গেল। ভাঙা কাঁচের ফোকর দিয়ে দেখল—রাস্তার আলোগুলো ঝাপসা। বৃষ্টি একটু কমেছে। একটু দূরে ডাঃ মিত্রের কোয়ার্টারটা অন্ধকারে ডুবে আছে। ডাঃ কল্যাণ মিত্রের স্ত্রী রেবেকা অরুণার মামাতো বোন। রেবেকা তো কোয়ার্টারে আজ একাই আছে। ডঃ মিত্র ট্যুরে গেছে। ওদের একমাত্র ছেলে সুশান্তও ভৌয়ালির রেসিডেন্সিয়াল স্কুলে।

পোস্টবোর্ডটা জানালায় লাগাতে লাগাতে ও রেবেকার কথাই ভাবছিল। বছর দশেক আগের কথা। রেবেকা এম. এ. পরীক্ষা দিয়ে বোধ হয় ভাবছিল দক্ষিণে না উত্তরে কোথায় বেড়াতে যাবে। তখনই অরুণা ওকে লিখেছিল—এদিকে বেড়িয়ে যেতে। নৈনীতাল, মুসৌরী, রাণীক্ষেত—অনেক বেড়াবার জায়গা এখানে। ক'দিন পরেই রেবেকার চিঠি পেল—আমি আসছি পনেরো তারিখ। তুমি বাসস্ট্যাণ্ডে থেকো। সেই রেবেকা এখানে প্রথম বেড়াতে আসা।

পোস্টবোর্ডটা ভালভাবে লাগল না। একটু ফাঁক থেকেই গেল। মরুকতো— অরুণা বিছানায় ফিরে এল। ভেবে হাসিই পেল—রেবেকা কী পোশাকে বাস থেকে নামল সেদিন। জীনস্‌এর প্যান্ট। গায়ে কলিদার গাঢ় হলুদ পাঞ্জাবী। মাথার চুল পিঠের ওপর ছাড়া। ওটাই বব্ করে নি। এর কারণ ছিল। রেবেকার বাবা দীর্ঘদিন আমেরিকায় ছিলেন। রেবেকার মাও নিজের রুচি অনুযায়ীই হোক বা স্বামীর সাহেবী রুচির সঙ্গে মানিয়ে চলবার জন্যই হোক—ছিলেন অতি আধুনিকা। রেবেকার বাবা বাড়িতে যে রুচি আবহাওয়া তৈরী করেছিলেন তাতে ছেলেমেয়েরা যে পুরোপুরি সাহেবী দস্তুর শিখবে এটাই স্বাভাবিক। অরুণা এটা ভালো ক'রেই জানত। ওরা তাই রেবেকাদের বাড়ি সম্পর্কে বলত 'ফিরিঙ্গি হাওয়া'।

অরুণা রেবেকার জন্যে আগে থেকেই একটা বাড়তি বিছানা ক'রে রেখেছিল। রেবেকা ওর কোয়ার্টারেই রইল। বাইরে যখন বেরোয় জীন স্ল্যাসক ঢোলা টপ পড়ে। কোয়ার্টারের মধ্যে খাটো ক্যাপ্রি প্যান্ট পরে থাকে। অরুণা বার বার মানা ক'রে দিয়েছে—যাই করিস ঐ প্যান্ট পরে বাইরে যাস্ না।

তখনই ঘটল ঘটনাটা অরুণার ভাবলে আজও হাসি পায়। সেদিন সকালে অরুণার বিছানা ছেড়ে উঠতে আলিস্যি লাগছিল। রেবেকা যথারীতি ক্যাপ্রি প্যান্ট পরে কিচেনে চা টোস্ট করছিল। রেবেকার বাবা খুব ভালো শিখিয়েছেন। রেবেকা সব কাজ নিজের হাতে করে। এমন কি খাওয়ার পর প্লেটটাও ধুয়ে রাখে। অরুণার মানা শোনে না।

সেদিন সকালে ডাঃ কল্যাণ মিত্র অরুণার কোয়ার্টারে এসেছে। মাত্র দিন কয়েক আগে ডাঃ মিত্রকে দিল্লী য়ুনিভার্সিটি মানুষের স্মৃতিভ্রংশের ওপর লেখা তার থিসিসের জন্য ডক্টরেট দিয়েছে। এই উপলক্ষে একটা অনুষ্ঠান করছে ডাঃ মিত্র। তাই নিমন্ত্রন জানাতে আসা।

কড়া নাড়তে রেবেকাই দরজা খুলে দিল। আঁটসাঁট ক্যাপ্রি প্যান্টপরা রেবেকাকে দেখে ডাঃ মিত্র বেশ ভড়কে গেল। কথাই বলতে পারছে না এই অবস্থা। রেবেকা ভুরু কুঁচকে বেশ ধমকের সুরেই ব'লে উঠল—'কাকে চাই?' ডঃ মিত্র কথা বলবে কি? এই বিচিত্ররূপিনীকে দেখে ও ভেবেই পেল না কী বলবে। রেবেকার ভুরু আরো কোঁচকাল। গলার স্বরও সেই সঙ্গে চড়ল—'কী চাই আপনার?' কল্যাণ তাড়াতাড়ি ব'লে উঠল—'মাফ করবেন—আমার বোধ হয়—।' থেমে গেল। রেবেকার চড়া সুরের কথা অরুণার কানে গিয়েছিল। ও আর শুয়ে থাকতে পারল না। তাড়াতাড়ি দরজার দিকে এল। তখনই কল্যাণ ফিরে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। অরুণা তাড়াতাড়ি ব'লে উঠল 'স্যার কী হ'য়েছে?' কল্যাণ ঘুরে দাঁড়িয়ে অরুণাকে দেখে এতক্ষণে স্বস্তির শ্বাস ফেলল। তাড়াতাড়ি ব'লে উঠল—'ইয়ে—মানে—আপনার কাছেই এসেছিলাম।' রেবেকা এতক্ষণে দরজার কাছ থেকে সরে এল। অরুণা বলল—'স্যার আপনি এলেন—মানে আমাকে ডেকে পাঠালেই হ'ত।' কল্যাণ এতক্ষণে যেন সহজ হ'ল। দ্রুত ব'লে উঠল 'ইয়ে হ'য়েছে—মানে—পার্টি মত হবে একটা—মানে আমার ডক্টরেট প্রাপ্তি উপলক্ষে আর কি—আমার কোয়ার্টারেই হবে—আপনাকে মানে—নিমন্ত্রণ—আচ্ছা ইনি কে? রেবেকাকে দেখিয়ে কল্যাণ বলল 'মানে আগে তো দেখি নি।'—ও তো রেবেকা—আমার মামাতো বোন। এখানে কিছুদিনের জন্য বেড়াতে

এসেছে অরুণা বলল।

—তাই বলুন—কল্যাণ যেন হাঁপ ছাড়ল—'আমি ভাবছিলাম কোয়ার্টার ভুল করে ফেলিনি তো!' একটু থেমে বলল 'তা—ইয়ে হ'য়েছে—আপনাদের দু'জনেরই নিমন্ত্রণ রইল।'

—এর জন্যে স্যার—আপনি নিজে কেন আর কষ্ট ক'রে—'অরুণা বলল।

—সোশ্যাল গ্যাদারিং এর নিমন্ত্রণ তো আর অফিসিয়াল লেটার হেডএ করা যায় না—কাজেই নিজেকেই আসতে হ'ল।'

অরুণা বুঝল কল্যাণ মিত্র এতক্ষণে নিজেকে সামলে নিতে পেরেছে। তার সেই বাছা বাছা কথা, রহস্যপ্রিয়তা, উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব, মনোজ্ঞ বাচন-ভঙ্গী আবার ফিরে এসেছে। অরুণা বলল—'স্যার, এসেছেন যখন এক কাপ চা খেয়ে যান।' কল্যাণ কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখল—'খুব তাড়া—অনেক জায়গায় যেতে হবে।'

—ঠিক আছে। এলেন—একটু ব'সে যান।

—চলুন কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি চা খাওয়াতে হবে।

কল্যাণ ঘরে ঢুকে চেয়ারে এসে বসল। ঠিক তখনই চায়ের ট্রে হাতে রেবেকা ঢুকল। রেবেকা এর মধ্যেই শাড়ি পরেছে। একটু পাউডারও বুলিয়েছে মুখে। মাথার চুলগুলোকে বাগ মানিয়েছে। অরুণা কল্যাণের কৌতুকোজ্জ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে বলল—'চা খান স্যার।'

—হু'। চায়ে চুমুক দিয়ে কল্যাণ সপ্রশংস দৃষ্টিতে রেবেকার গম্ভীর শান্ত-শিষ্টমার্কা মুখের দিকে তাকিয়ে বলল—'বাঃ সুন্দর চায়ের হাত তো আপনার।' রেবেকা একবার মৃদু হেসে আবার শান্তশিষ্ট হ'য়ে গেল। অরুণা পাশের চেয়ারটা দেখিয়ে বলল—'রেবেকা বোস্। রেবেকা আস্তে আস্তে বসল। অরুণা বলল 'রেবেকা-ইনি ডঃ কল্যাণ মিত্র। এই রঙটিলা এ্যাসাইলামের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। শুধু এটুকু বললে সব বলা হয় না—উনি এই এ্যাসাই-লামের প্রাণপুরুষ।' কল্যাণ হাত তুলল-'ব্যস্ ব্যস্।'

—নমস্কার।' রেবেকা আলতো হাত তুলে নমস্কার করল। কল্যাণ নমস্কারের ভঙ্গী করল। কিন্তু মুখে কিছু বলল না। চা শেষ ক'রে উঠে দাঁড়াল—মিস সেন—অনেক দূরে দূরে যেতে হবে—আজকে উঠি। ইয়ে—' রেবেকার দিকে ফিরে বলল—'আপনিও আসছেন কিন্তু।' রেবেকা শান্ত ভঙ্গীতে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। তারপর একটু বাধ বাধ স্বরে বলল—'আমার খুব অন্যায় হ'য়ে গেছে। মাফ করবেন।' কল্যাণ দরাজ—গলায় হেসে উঠল—'কী যে বললেন—বরং আমারই উচিত ছিল আমার পরিচয়টা আগেই দিয়ে দেওয়া। আচ্ছা—চলি নমস্কার।'

কল্যাণ চলে যেতে রেবেকা মুখভঙ্গী ক'রে বলল—'অরুণাদি এই নাকি তোমাদের ডাঃ কল্যাণ মিত্র দ্য সেলিব্রেটেড সাইকিয়াট্রিস্ট ? ফুঃ।

—পছন্দ হ'ল না ?' অরুণা হেসে বলল।

—পছন্দ ? গুড গড-আরে আমাদের পাড়ার নিমাই কম্পাউণ্ডারও এর চাইতে অনেক বেশী স্মার্ট।

—আসলে তোর ঐ বিচিত্র পোশাক দেখে কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল।

—ঐ নিরীহ প্যান্ট দেখেই। বিকিনি পরা দেখলে তো ওর জন্মে এ্যাম্বুলেন্স ডাকতে হ'ত।

—হুঁ—ভদ্রলোক একটু বেকায়দায় পড়ে গিয়েছিলেন—নইলে—

—নইলে হোয়াট ?

—কিছু না।' অরুণা আর কথা বাড়াল না।

অরুণার মনে পড়ল সেই পার্টির কথা। হৈ চৈ এর মধ্যে বেশ জমে উঠেছিল পার্টি। অনেক রাত পর্যন্ত খাওয়া দাওয়া নাচগান চলল। নৈনীতাল, মুসৌরী থেকে অনেক নিমন্ত্রিতরা এসেছিলেন। পার্টিতে ব্যাণ্ড এর দল এসেছিল। সারাক্ষণ বাজনা বেজেছিল। কল্যাণের অনুরোধে রেবেকাকে একটা গান গাইতে হ'ল। রেবেকা গাইল একটা বিলিতি পপ গান। মুহূর্তে পার্টি জমে গেল। চারদিক থেকে অনুরোধ আসতে লাগল। কিন্তু রেবেকা আর গাইল না। অরুণা বিব্রত বোধ করল। রেবেকা এরকম একটা চটুল গান ধ'রে বসবে ও ভাবতে পারে নি। নাচের আসরেও রেবেকার জয় জয় কার। ব্যাণ্ড এর তালে তালে ও নাচল। সঙ্গী ছিল একটি পাঞ্জাবী যুবক। সবাই ওর নাচের তারিফ করল। কিন্তু অরুণা যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। ডাঃ মিত্র রেবেকার গান নাচ কী ভাবে নেবে ?

পার্টি শেষ হ'ল। লতাপাতা ফুলে আলোয় সাজানো গেট এর কাছে দাঁড়িয়ে কল্যাণ সবাইকে বিদায় সম্ভাষণ জানাচ্ছে। কাউকে নমস্কার করছে, কারো সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করছে।

অরুণা আর রেবেকা গেট এর সামনে এসে দাঁড়াল। রেবেকাকে দেখে কল্যাণ বলে উঠল—খুব খুশী হলাম আপনি এসেছিলেন।' হাতজোড় ক'রে নমস্কার করল। রেবেকা মৃদু হাসল। নমস্কার করল। অরুণা একটু ইতস্ততঃ করে বলল—'ওর গান কেমন লাগল স্যার ?'

—মন্তব্যটা তোলা থাক।' কল্যাণ হেসে বলল।

—কেন ?' সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে রেবেকা তাকাল।

কল্যাণ আস্তে আস্তে বলল—'শাস্ত্রে বলেছে অপ্রিয় সত্য কথা কদাচ বলিবে না।'

—তার মানে আপনার ভালো লাগে নি—' একটু কঠিন সুরেই রেবেকা কথাটা বলল। ভ্রূকুটি ক'রে বলল—'কথাটা স্পষ্ট বললেই পারতেন। স্পষ্ট কথা শোনার মত মনের জোর আমার আছে।'

—কিন্তু স্পষ্ট কথা বলার মত মনের জোর অন্ততঃ আমার নেই।' কল্যাণ হেসে বলল।

—ওয়েস্টার্ন ম্যুজিকের কী বোঝেন আপনারা ?

কল্যাণ হাসল। বলল—'ফর ইয়োর কাইণ্ড ইনফরমেশন—ও দেশে আমি বছর পাঁচেক কাটিয়ে এসেছি।'

—তাহ'লে তো বিলিতি গানকে এ্যাপ্রিশিয়েট করতে আপনার দ্বিধায় কোন কারণ দেখি না।

—তাহ'লে তো বিলিতি কালার বারকেও এ্যাপ্রিশিয়েট করতে হয় বিকজ দ্যাটস্' ওয়েস্টার্ন।

—রে.বকা—কী হচ্ছে ?'—অরুণা চাপাস্বরে ধমক দিল। রেবেকা একবারক্রোধে আরক্ত মুখে অরুণার মুখের দিকে তাকাল। তারপর দ্রুতপায়ে হাঁটতে শুরু করল। অরুণা অপ্রস্তুত ভঙ্গীতে বলল 'স্যার আপনি ওর ব্যবহারে যেন—।' কল্যাণ বাধা দিয়ে ব লে উঠল—'উহুঁ আমি কিচ্ছু মনে করি নি। আপনি যান—উনি বেশ চটে গেছেন।'

অরুণা রেবেকাকে মাঝপথে ধরল। কিন্তু কিছু বলল না। দেখল রেবেকার রাগ এখনও পড়ে নি। অরুণা ভাবছিল—খুব বাঁচিয়েছে রেবেকা। স্ল্যাক্স্ আর ঢোলা হাতা টপ পরে পার্টিতে আসে নি। অনেক ধ'রে করে বুঝিয়ে সুজিয়ে ওকে শালোয়ার কামিজ পরাতে পেরেছিল।

আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল ওরা। অন্ধকারে অরুণা রেবেকার মুখ দেখতে পাচ্ছে না। ওর মনের অবস্থাটাও তাই বুঝতে পারছে না। তবু পার্টি, কল্যাণ, অতিথিবর্গ এদের সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলল। নিরুৎসাহ ভঙ্গীতে রেবেকা দু'একবার 'হুঁ' 'হাঁ' করল শুধু। অরুণা বুঝল ওর এখনও রাগ পড়ে নি। কাজেই পাশ ফিরে ও ঘুমোবার চেষ্টা করল।

পরের দিন বেশ সকালেই কল্যাণ অরুণার কোয়ার্টারে এল। কড়া নাড়তে অরুণাই দরজা খুলে দিল। তখন রেবেকা কিচেনএ টোস্ট করছে। কল্যান একটু অপ্রস্তুত ভঙ্গীতে বলল—'দেখছি একটু বেশী সকালেই এসে পড়েছি।'

—তা'তে কী—' অরুণা এগিয়ে এসে বলল—'আপনি বসুন স্যার।'

চেয়ারে বসতে বসতে কল্যান বলল—'কাল তো ফিরতে আপনাদের বেশ রাত হ'য়ে গিয়েছিল। তাই ভাবলাম—যাই—কুশল সংবাদটা নিয়ে আসি। কল্যান এই হঠাৎ-আসার পেছনে যে যুক্তি দেখাল সেটা যে মোটেই জোরদার নয় এটা অরুণা যেমন বুঝল, কল্যানও তেমনি বুঝল। দু'জনেই চুপ ক'রে ব'সে রইল। কী বলবে কী করবে বুঝে উঠতে না পেরে কল্যান পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল। একটা সিগারেট বের ক'রে ধরাল। দু'জনেই চুপচাপ। এই নীরবতাটা দু'জনেই বুঝছিল বেশ অস্বস্তিকর। অরুণাই নীরবতা ভঙ্গ করল—

—স্যার আপনি কফি খাবেন?

—উঁ? মন্দ কি। বেশ শীত শীত লাগছে।' কল্যান একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল।

—একটু বসুন। আমি দেখছি।' অরুণা কিচেনের দিকে চলে গেল। কল্যান চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। অরুণা মেয়েটি বেশ গোছালো। যেমন অফিসের কাজে তেমনি একার এই সংসারেও। আশ্চর্য! অরুণা বিয়ে করছে না কেন? হয়তো পরিবারের লোকেরা ওর আয়ের ওপরেই নির্ভরশীল। অথবা হতে পারে মনোমত কোন ছেলে পায় নি। ও এসব সাত পাঁচ ভাবছে—দেখল রেবেকা একটা আটপৌরে শাড়ি পরে ট্রেতে কফির সরঞ্জাম নিয়ে আসছে। মুখ খুব গম্ভীর না হ'লেও হাসিখুশী নয়। তবে একটু মাথা ঝুঁকিয়ে নমস্কারের ভঙ্গী করল। কল্যান মুখে কোন কথা না ব'লে মাথা নুইয়ে নিল। রেবেকা কফি তৈরী করছে তখনই কল্যান মৃদুস্বরে বলল—'আপনি বোধহয় আমার ওপর খুব রেগে আছেন।

—নাঃ। রাগ করবার কী আছে।' রেবেকা সাদা গলায় বলল।

—'আমাকে মাফ করুণ।' কল্যান একটু গলা নামিয়ে বলল।

—'সে কি? না-না।' রেবেকা হেসে ফেলল। পরিবেশটা অনেক সহজ স্বাভাবিক হ'য়ে এল। কল্যান হেসে বলল—'আপনি কিন্তু বড্ড অবুঝ।'

—আপনিও পয়লা নম্বরের ঝগড়াটে।

কল্যান হেসে মাথা শোয়াল—'তথাস্তু।'

কফি তৈরী হ'য়ে গিয়েছিল। কফিতে চুমুক দিতে দিতে কল্যান বলল—। আপনি তো সদ্য ক'লকাতা থেকে আসছেন—ওখানকার খবর বলুন।

—শকিং নিউজ।' রেবেকা হেসে বলল।

—মানে ?

—সারা ক'লকাতা খোঁড়া হচ্ছে—দেখে মনে হবে আর্কিওলজিক্যাল এক্সকাবেশন চলছে। ট্র্যাফিক জ্যাম নিত্যকার ঘটনা। বর্ষার বর্ষনে ক'লকাতা মিনি ভেনিস শুধু গণ্ডোলা মানে নৌকা চলে না। য়ুনিভার্সিটি থেকে কোনদিন রাত সাড়ে সাতটার আগে বাড়ি ফিরতে পারি নি।

—আপনি কীসে পড়ছেন ?

—ইকনমিক্সএ। পরীক্ষা হ'য়ে গেছে এখন রেজাল্ট-এর প্রত্যাশায়।' কল্যান কেমন একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে গেল। কিচেনের পর্দার আড়াল থেকে অরুণা সবই দেখছিল। কল্যান বলল—স্মৃতি ভারাক্রান্ত স্বরে—'জানেন ক'লকাতাতে জীবনের অনেক ক'টা দিন কেটেছে—বড্ড মনে পড়ে—মেডিকেল কলেজ—কলেজ স্ট্রীটের বইপড়া—গোলদীঘি—লেবুতলা অন্ধকার মেসবাড়িটা—।' রেবেকা কোন কথা বলল না। কফিতে চুমুক দিল।

অরুণা এসময় টোস্ট নিয়ে ঘরে ঢুকল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ও। যাক—নতুন ক'রে ঝগড়া শুরু হয় নি।

সেদিন চায়ের টেবিলে গল্পগুজব বেশ জমে উঠল কল্যানের রহস্যালাপে। বিদায় নেবার সময় অরুণা ইচ্ছে ক'রে কিচেনএ ভীষণ ব্যস্ত হ'য়ে পড়ল। অগত্যা দোর গোড়া অব্দি রেবেকাকেই আসতে হ'ল। রেবেকা হাসতে হাসতে বলল—'উঃ আপনি কিন্তু ভীষণ হাসাতে পারেন।' —আবার ঝগড়াও করতে পারি।' কল্যানের কথা বলার ভঙ্গীতে কী ছিল—দু'জনেই সজোরে হেসে উঠল। কিচেন থেকে ওদের এই হাসির শব্দ শুনে অরুণা মৃদু হাসল।

কিছুদিনের মধ্যেই অরুণা রেবেকার মধ্যে এক অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ্য করল। কোথায় গেল রেবেকার কাপ্রি প্যান্ট, ঢোলা পাঞ্জাবী, স্ল্যাকস্, ইংরিজি বুক্‌নি, পপ মুজিক প্রীতি। চলনে বলনে রেবেকা একেবারে পাল্টে গেল। রেবেকা প্রায় মাসখানেক ওখানে ছিল। এরমধ্যে কল্যানেরও অনেক পরিবর্তন হ'ল। সকাল আটটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে যে কল্যান হাসপাতালে জুতোর শব্দ তুলে ঢুকতো তার সময়ের হেরফের হ'য়ে গেল। ও দেরী ক'রে প্রায় লুকিয়ে হাসপাতালে আসতে লাগল। বিকেলের ভিজিটিং আওয়ারটা পাল্টে সন্ধ্যেবেলা ক'রে নিল। কারণ প্রায় প্রতি বিকেলেই কল্যান অরুণা আর রেবেকাকে নিয়ে নৈনীতাল, ভোয়ালিতে হনুমানগড়িতে বেড়াতে লাগল। প্রথম প্রথম প্রথম অরুণা সঙ্গে যেত। পরে অরুণা যাওয়া ছেড়ে দিল। ওরা দু'জনেই যেত। এর মধ্যেই কল্যান আর রেবেকার মন জানাজানির পালা শেষ হ'ল।

কল্যানই রেবেকাকে কলকাতা পৌঁছে দিতে গিয়েছিল। ফেরার সময় রেবেকার বাবার সম্মতিটাও নিয়ে এসেছিল। কিন্তু বিয়ের জন্য অপেক্ষা করতে হ'ল। রেবেকার পরীক্ষার ফল বেরুলো। ওপরের দিকে সেকেণ্ড ক্লাশ পেল রেবেকা। বিয়ে ক'লকাতাতেই হ'ল। রেবেকা এসে কল্যাণের কোয়ার্টারে নতুন ঘর সংসার পাতল। রেবেকার একটি ছেলে হ'ল—সুশান্ত। ভৌয়ালির এক রেসিডেন্সিয়াল স্কুলে থেকে পড়ে। রেবেকা ছুটিছাটায় ওকে বাড়ি নিয়ে আসে। রেবেকা সত্যিই সুখী হ'য়েছে। কল্যাণের মত স্বামী, সুশান্তর মত ছেলে।, অরুণার মত শুভাকাঙ্খিনী, অর্থ, সম্মান প্রতিপত্তি সবই পেয়েছে সে।

হাতের বইটা রেখে দিল অরুণা। এতক্ষণ একটা অক্ষরও পড়া হয় নি। রেবেকার কথাই ভাবছিল এতক্ষণ। আলো নিভিয়ে ঘুমোবার উদ্যোগ করল। বাইরে ঝড় বৃষ্টি তখন থেমে গেছে। তবে মাঝে মাঝে বাজ পড়ছে। দরজা জানালা বন্ধ। কেমন যেন গুমোট লাগছিল। অরুণা উঠে জানালার পাল্লা খুলে দিল। হু হু ক'রে ঠাণ্ডা ভেজা ভেজা হাওয়া ঢুকল ঘরে। অরুণা জানলাটার কাছে দাঁড়াল কিছুক্ষণ। ঠাণ্ডা হাওয়াটা খুব ভালো লাগছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল—আকাশ এখনও পরিষ্কার হয় নি। ডানপাশে হাসপাতাল বাড়িটা অন্ধকারে ডুবে আছে। বাঁদিকের একপ্রান্তে রেবেকাদের কোয়ার্টার এদিকে। দেখল জানালাগুলো বন্ধ। রেবেকা নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছে। ও তো একাই রয়েছে আজকে। কল্যান লেকচারটুরে গেছে। ফেরার প্রোগ্রাম পরে জানাবে। টুরে গিয়ে পর্যন্ত কল্যাণ নাকি একটা চিঠিও দেয় নি। এই নিয়ে রেবেকা অভিমান ক্ষুব্ধস্বরে অরুণার কাছে অনুযোগ ক'রে গেছে। অরুণা আপনমনেই হাসল। জানালার কাছ থেকে স'রে আসবে হঠাৎ দেখল দক্ষিণ দিককার ঘরটায় আলো জ্বলে উঠল। ভেণ্টিলেটারে, কাঁচের জানালায় আলোর স্পষ্ট আভাস। আলো কিছুক্ষণ জ্বলে রইল। রেবেকা এত রাতে দক্ষিণের ঘরে কী করছে? ও ঘরটা তো বিশেষ ব্যবহার করা হয় না। আকাশে বিদ্যুৎ জ্বলে উঠে প্রচণ্ড শব্দে একটা বাজ পড়ল। ঠিক বাজ পড়ার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণের ঘর থেকে একটা গুলীর শব্দ ভেসে এল। অরুণা ভীষণভাবে চমকে উঠল। দু'টো আওয়াজই এত স্বল্পসময়ের ব্যবধানে হ'ল সে অরুণা জানালার কাছে দাঁড়িয়েছিল ব'লেই শব্দ দু'টোর পার্থক্য বুঝতে পারল। অরুণা আর এক মুহূর্ত দাঁড়াল না। দ্রুতপায়ে ছুটল বাইরের সিঁড়ির দিকে।

রেবেকাদের কোয়ার্টারে যখন পৌঁছল তখন হাঁপাচ্ছে ও।

দেখল দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। বাইরের ঘরে আলো জ্বলছে। অরুণা কলিং বেল টিপতে ভরসা পেল না। কী হয়েছে আগে সেটা জানা দরকার। দরজায় মৃদু টোকা দিল। বার তিনেক টোকা দেবার পর ভেতর থেকে রেবেকার ভীত কণ্ঠস্বর ভেসে এল—

—কে ?

—আমি অরুণা। শিগগির দরজা খোল্।' অরুণা চাপাস্বরে বলল।

দরজা খুলে গেল। চুল খোলা, ফ্যাকাশে চোখমুখ, ভীতিবিহ্বল বিপর্যস্ত রেবেকা। এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে অরুণার দিকে তাকিয়ে রইল। অরুণা দ্রুত ব'লে উঠল—'কী হ'য়েছে রেকা ?' রেবেকা কোন উত্তর দিল না। শূন্য দৃষ্টিতে একবার চারদিকে তাকাল শুধু। অরুণা রেবেকাকে দু'হাতে ধ'রে ঝাঁকুনি দিল—'বল্ কী হ'য়েছে ?' রেবেকা নিঃশব্দ অঙ্গুলিসংকেতে দক্ষিণ দিককার ঘরটা দেখাল। অরুণা দ্রুতপায়ে ছুটল সেদিকে। রেবেকা অবশ শরীরে একটা সোফায় এলিয়ে পড়ল।

দক্ষিণের ঘরটায় তখনও আলো জ্বলছিল। সেই আলোয় অরুণা যা দেখল তাতে বিস্ময়ের একটা অস্ফুট আর্তস্বর তার গলা থেকে বেরিয়ে এল। স্যুটপরা একটি যুবক মেঝেয় উপুড় হ'য়ে অসাড়ভাবে পড়ে আছে। যুবকটি স্বাস্থ্যবান। মুখের পাশটা যতটুকু অরুণা দেখতে পেল তাতে বুঝল যুবকটি সুপুরুষ। অরুণা আর একবার ভীষণভাবে চমকে উঠল। যুবকটির বুকের বাঁদিকের মেঝের কাছটা রক্তে ভিজে উঠেছে। মেঝের প্রসারিত ওর ডান হাতটায় একটা পিস্তল ধরা।

অরুণার মাথাটা ঘুরে উঠল। এখন উপায় ? দরজাটায় গা ছেড়ে দিয়ে ও একটু ভর নিল। তারপর তাড়াতাড়ি আলো নিভিয়ে দিল। দ্রুতপায়ে বাইরের ঘরে চলে এল। দেখল—রেবেকা সোফাটায় ব'সে আছে। অনড় উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে।

অরুণা রেবেকাকে ধ'রে দাঁড় করাল। চাপাস্বরে বলল—'রেকা-কী হ'য়েছে ? বল্—কী করেছিস্ তুই ?' রেবেকা একইভাবে তাকিয়ে রইল। অরুণা আবার সজোরে ওকে ঝাঁকুনি দিল। এবার রেবেকার দেহে যেন সাড় এল। দু'হাতে মুখ ঢাকল ও। কান্নার আবেগে ওর সমস্ত দেহটা কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। এতক্ষণে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল রেবেকা। অশ্রু বিকৃতস্বরে ব'লে উঠল—'অরুণাদি' আমাকে বাঁচাও।

—কী হ'য়েছে বলবি তো ?

রেবেকা কাঁদতে কাঁদতে বলল—'সব বলছি তোমাকে। তার আগে ঐ ডেডবডিটা—ওটা সরাও।' একটু থেমে ব'লে উঠল—'অরুণাদি'—

আমাকে বাঁচাও।' এক করুণ আর্তি ফুটে উঠল রেবেকার কণ্ঠস্বরে। ও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। অরুণা মনে করার চেষ্টা করল। মনে পড়ল—ডাঃ মিত্রের খোঁজে যুবকটি এসেছিল। অরুণা বলল—'মনে হচ্ছে ভদ্রলোককে আমি আগে দেখেছি। নজরে পড়ার মত চেহারা—আমার ভুল হবার নয়।'

—হ্যাঁ-ইন্দীবর, ওর পেশেন্ট।

—ওর নাম ইন্দীবর ?

—হ্যাঁ।' রেবেকা আকুলস্বরে ব'লে উঠল—'আর কিছু জিজ্ঞেস করো না। রেবেকা একইভাবে কাঁদতে লাগল। অরুণা সোফাটায় হাত রেখে ঘুরে দাঁড়াল। ব'লে উঠল—'মাথায় হাত দিয়ে ব'সে থাকলে চলবে না। বডিটা সরাতে হবে।' একটু থেমে বলল—'তোদের গাড়ির চাবিটা দে।' রেবেকা চোখ মুছল আঁচলে। তারপর দোতলায় যখন চাবি আনতে যাচ্ছে অরুণা চাপাস্বরে বলল—'তাড়াতাড়ি কর্।' একটু পরেই চাবি হাতে রেবেকা দ্রুতপায়ে নেমে এল। অরুণা চাবিটা নিয়ে বলল—'তোকেও সাহায্য করতে হবে। ভালো কথা দক্ষিণের ঐ ঘরটার পাশেই তো তোদের গ্যারেজ ?'

হ্যাঁ।' রেবেকা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

—যাক। বডিটা বেশীদূর বইতে হবে না। চল্।

দু'জনে দক্ষিণের অন্ধকার ঘরটায় ঢুকল। অন্ধকারে সন্তর্পনে মেঝের পড়ে-থাকা দেহটা পেরিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলল। বাইরে তখন আবার মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ঝোড়া হাওয়ার ঝাপ্টা চলছে। গ্যারেজ থেকে গাড়ী বের করতে বেশী বেগ পেতে হ'ল না। কিন্তু ইন্দীবরের দেহটা ধরাধরি ক'রে গাড়িতে নিয়ে যেতে দু'জনই হিমসিম খেয়ে গেল। গাড়ির দরজা বন্ধ ক'রে অরুণা স্টিয়ারিং এ বসল। পাশে রেবেকা। গাড়িতে স্টার্ট দেবার আগে অরুণা একবার মৃদুস্বরে বলল—'তুই না গেলেও পারতিস্।'

—কেন ? তুমি কী করবে ?

– নির্জন জায়গা দেখে বডিটা গাড়ি থেকে নামিয়ে ফেলে দেব।

—আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারবো।

—আমি একাই পারবো—তুই বরং না গেলি।

—অসম্ভব। একা এই বাড়িতে আমি থাকতে পারবো না।

—বেশ। চল্।

অরুণা গাড়িতে স্টার্ট দিল। গাড়ি চলল। জলঝড়ে হাসপাতালের

কমপাউণ্ডের রাস্তাঘাট যেন মুছে গেছে। অন্ধকারে অল্প গতিতে গাড়ি চলল। হঠাৎ হঠাৎ চম্‌কে-ওঠা বজ্রপাতের আলোই ভরসা। তা'তে যা রাস্তা দেখা যাচ্ছিল। রেবেকা বলল—হেড লাইট জ্বালবে না?

—পাগল হয়েছিস। অরুণা অস্পষ্টস্বরে বলল।

হাসপাতালের মেন গেট বন্ধ: পাশে দারোয়ানের খুপড়ি ঘর। সে ঘর অন্ধকার। দরোয়ান বোধ হয় গভীর ঘুমে। অরুণা গেট এর কাছে গাড়ি থামাল। গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে অরুণা আস্তে আস্তে গেট খুলল। গাড়িতে ফিরে এল। খুব সন্তর্পনে গেট দিয়ে গাড়িটা বাইরে রাস্তায় নিয়ে এল। এবার গাড়ি থামিয়ে বলল—'রেকা যা গেটটা বন্ধ ক'রে দিয়ে আয়। এতক্ষণে রেবেকা অনেকটা সহজ স্বাভাবিক হ'য়েছে। ও গাড়ি থেকে নেমে এক ছুটে গিয়ে গেটটা বন্ধ ক'রে ফিরে এল।

রাস্তায় নেমেই অরুণা গাড়ির গতি বাড়াল। একটু দূরে গিয়ে হেড লাইট জ্বালল। বৃষ্টি আর ঝোড়ো হাওয়ার মাতামাতি চলল গাড়িটাকে ঘিরে।

প্রায় ঘণ্টাখানের পরে গাড়িটা গ্যারেজে রেখে দু'জনে ড্রইংরুমে এল। শাড়ি জামা ভিজে সপ্ সপ্ করছে। অরুণাই ভিজেছে বেশী। শাড়ি পাল্টে দু'জনে দোতলার শোবার ঘরে এসে বসল। অরুণাই একসময় বলে উঠল—হয়তো চিন্তাটা দূর করতেই—'কফি কর্ তো। ভীষণ শীত শীত করছে।

অল্পক্ষণের মধ্যে রেবেকা কফি করে নিয়ে এল। অরুণা একটু ক্লান্তভঙ্গীতে বিছানায় আধশোয়া হ'ল। রেবেকা বালিশে পিঠ দিয়ে বসল। দু'জনে কফি খাচ্ছে। তখনই অরুণা জিজ্ঞেস করল—কী ব্যাপার বল্ তো? এমন একটা সাংঘাতিক কাণ্ড বাঁধালি কী ক'রে? ইন্দীবর নাম শুনে তো মনে হচ্ছে অবাঙালী। তোর সঙ্গে ওর পরিচয় হ'ল কী ক'রে?' রেবেকা এক মুহূর্ত অরুণার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলতে লাগল—'ইন্দীবর শুক্লা অবাঙালী। গোয়ালিয়রের এক জমিদার বংশের ছেলে ও। কলকাতায় আর্ট কলেজে পড়েছে কয়েক বছর। ছেড়ে দিয়ে পরে কমার্স পড়েছে। কলকাতাতেই সব পড়াশুনা। কাজেই মোটামুটি বাংলা বলতে পারে।' একটু থেমে রেবেকা বলতে লাগল—'আমার সঙ্গে পরিচয়টা অদ্ভুতভাবে ঘটেছে। দিন কুড়ি আগের কথা। একদিন সকালে কল্যাণকে ড্রয়িংরুমে কাদের সঙ্গে কথা বলতে শুনলাম। এমন তো কত লোকই আসে। ওকে চা খেতে আসতে বলতে হয়। নইলে চা ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে। আমি নিজেই গেলাম ওকে

ডাকতে। দোতলার সিঁড়ি বারান্দা থেকেই দেখলাম—এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক ওকে কী বলছেন। বৃদ্ধ ভদ্রলোকের পাশে ইন্দীবর বসে আছে। আমি ওদের কাছাকাছি হ'লাম। বললাম—'চা ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছে। ওর ভদ্রতাজ্ঞান তো জানো। আমি সামনে থাকলে সবার সঙ্গেই ও আমাকে পরিচয় করিয়ে দেয়। এ ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হ'ল না। ও ইন্দীবর আর তার কাকার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। পরে ওর কাছেই শুনেছি এক অদ্ভুত মানসিক রোগে ইন্দীবর ভুগছে। এমনিতে ইন্দীবর সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ। মাঝে মাঝে কোন কারণে মনে কোন তীব্র আবেগে আক্রান্ত হ'ল ওর স্মৃতি লোপ পায়। এই নিয়ে বেশ কয়েকবার এ রকম নাকি ঘটেছে। তবে এই স্মৃতিভ্রংশতা সাময়িক। কিছুদিন পরেই আস্তে আস্তে পুরোনো স্মৃতিগুলো ফিরে আসে। সব মনে পড়ে যায় ওর। ও সুস্থ ও স্বাভাবিক হ'য়ে ওঠে।'

—আচ্ছা—' অরুণা বলল 'যখন ওর স্মৃতিভ্রংশতার পিরিয়ডটা চলে তখন কি ও কোন অস্বাভাবিক আচরণ করে? ওর কাছে শুনেছিলাম —ঐ পিরিয়ডে ইন্দীবর নাকি কথায় বার্তায় আচরণে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক মানুষই থাকে। কিন্তু আগের কথা কিছুই মনে করতে পারে না। ওর এই স্মৃতি ভ্রংশতা সবচেয়ে বেশিদিন চলেছিল ওর মা'র মৃত্যুর পর। ওর বাবা নেই। কাকাই ওদের জমিদারি দেখা শুনা করে। কাকাই ইন্দীবরকে ওর কাছে নিয়ে এসেছিল চিকিৎসার জন্যে। কল্যাণ কথায় কথায় ব'লেছিল—কেসটা খুব ইন্টারেস্টিং। লেকচার ট্যুর থেকে ফিরে এসে এই কেসটা হাতে নেবে—এই রকমই একটা কথা ও বলেছিল। ইন্দীবরের কাকাকে ও বোধ হয় সেই কথাই ব'লে গিয়েছিল। সপ্তাহখানেক পরে ওদের এখানে আসার কথা ছিল।'

একটু থেমে রেবেকা বলতে শুরু করল—'দিন সাতেক পরের কথা। সুশান্ত কয়েকদিনের ছুটিতে এসেছিল। সেই দিনই ফিরে যাবে। ওকে বেলা দশটার মধ্যে নৈনীতাল পৌঁছে দিতে হবে। সলভেশন আর্মির অফিসের সামনে ওদের স্কুলের গাড়ি অপেক্ষা করবে। ঘুম থেকে উঠে স্কুলের ইউনির্ফর্ম পরে সুশান্ত সারা কোয়ার্টার চষে বেড়াচ্ছিল। বেলা তখন সাড়ে আটটা মত হবে। আমিও ব্যস্ত। সুশান্তর খাবার দাবার তৈরী হ'য়ে গিয়েছিল। এবার ওকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে নিজে তৈরী হচ্ছিলাম। শুনলাম ড্রইংরুমে সুশান্ত ক'ার সঙ্গে বকর বকর করছে। মাঝে মাঝে সুশান্তর হাসি শুনতে পাচ্ছিলাম। সেই সঙ্গে আর কারো উচ্চকণ্ঠের হাসি। দোতলার সিঁড়িবারান্দা থেকে নেমে আসার সময়

দেখলাম ইন্দীবর শুক্লা খুব মনোযোগ দিয়ে সুশান্তর স্কেচ আঁকছে ওর স্কেচ খাতায়। সুশান্তর মুখচোখ দেখে বুঝলাম এর মধ্যেই দু'জনের বেশ ভাবসাব হ'য়ে গেছে। আমাকে নামতে দেখে সুশান্ত চেঁচিয়ে বলল —মা দেখ কী সুন্দর।' টেবিলের ওপর থেকে একটা প্যাকেট নিয়ে আমার কাছে ছুটে এল। ইন্দীবর উঠে দাড়িয়ে নমস্কার করল। প্রতিনমস্কার ক'রে আমি প্যাকেটটা খুললাম। মুখে বললাম—'বসুন না।' প্যাকেট থেকে বেরোল বাঘের চামড়া দিয়ে তৈরী একজোড়া চটি জুতো। রয়াল বেঙ্গল নয় প্যানথার জাতীয় বাঘের চামড়া। দেখতে বড় সুন্দর জুতো জোড়াটা সুদৃশ্য কারুকাজ করা চারপাশে। ইন্দীবর হেসে বলল— 'ওটা ডাঃ মিত্রকে কাকা প্রেজেন্ট করেছেন। অবশ্য জিনিসটা আমিই জোগাড় করেছি। নৈনীতে আমার এক বন্ধুর পার্সোনাল জু আছে। সেই দিয়েছে।' লক্ষ্য করলাম ইন্দীবরের বাংলা কথাগুলো মোটামুটি পরিস্কার। ও যে ক'লকাতা বেশ কয়েকবছর কাটিয়েছে এটা বোঝা গেল।'

একটু থেমে রেবেকা ব'লে চলল—'এই সময় সুশান্ত আনন্দে হাততালি দিয়ে ব'লে উঠল—'মা আমি জু দেখতে যাবো। ওখানে নাকি বাঘ পাইথন হরিণ চিতা সব আছে।' বুঝলাম এতক্ষণ ওদের দু'জনের মধ্যে এই সব নিয়েই কথাবার্তা হচ্ছিল। একটু হেসে বললাম —'আজকে তো তোমাকে স্কুলে যেতে হবে। আজকে হবে না। সামনের ছুটিতে এসে দেখতে যেও।'

সুশান্ত অভিমান ক্ষুব্ধ স্বরে বলল—'না—না—আজকেই যাবো। বললাম—

—লক্ষ্মীটি কথার অবাধ্য হয়ো না।

ইন্দীবর বলল—'ঠিক আছে সুশান্তবাবু—পরে কোনদিন তোমাকে নিয়ে যাবো।'

আমি স্কেচখাতাটা দেখিয়ে বললাম—'কী ব্যাপার? সুশান্তর স্কেচ করা হচ্ছিল নাকি?' ইন্দীবর হেসে স্কেচখাতাটা এগিয়ে দিল। বলল— 'ভালো আসে নি। আর একবার আঁকতে হবে।' স্কেচটা দেখলাম। পেন্সিলের টানাগুলো বেশ পাকা হাতের। মোটামুটি অবয়বটা এসেছে। কিন্তু মুখের আদলটা স্পষ্ট আসে নি। খাতাটা ফিরিয়ে দিলাম। ইন্দীবর বলল—'সুসান্তবাবু-পরে একটা সিটিং দেবে। চুপ ক'রে ব'সে থাকতে হবে কিন্তু। মুখ নাড়বে না—কেমন?

সুপান্ত মাথা নাড়ল—'বেশ।'

আমি একটু ব্যস্ততার সঙ্গে বললাম—'ইয়ে হ'য়েছে—মানে আমাদের

এক্ষুণি বেরোতে হবে।' এঃ মিছিমিছি আপনাদের দেরী করিয়ে দিলাম। ডাঃ মিত্র তো ফেরেন নি?

—না—আমি বললাম।

—কবে নাগাদ ফিরবেন কিছু খবর পেয়েছেন?

—ঠিক কিছু জানায় নি। ক'লকাতা এসে জানাবে। আরো এক সপ্তাহ লাগাতে পারে।

—ও। তাহ'লে একসপ্তাহ বাদেই আসবো। আচ্ছা নমস্কার।' ইন্দীবর ধীর পায়ে চলে গেল।' একটু থামল রেবেকা। তারপর আবার বলতে লাগল—

'সুশান্তর জিনিসপত্র সব গোছানোই ছিল। গাড়িতে তোলা হ'ল সে সব। সুশান্ত আমার পাশেই বসল। গাড়িতে স্টার্ট দিলাম। হাসপাতালের কমপাউণ্ড ছাড়িয়ে গাড়ি বাইরের রাস্তায় পড়ল। গাড়ি চালাচ্ছি। হঠাৎ সুশান্ত চেঁচিয়ে উঠল—'মা—ঐ যে আর্টিস্ট।' তাকালাম সেদিকে দেখলাম ইন্দীবর বাসস্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে আছে। নৈনীতাল যেতে হলে বাস ট্যাক্সি ভরসা। এখনও কোনকিছু পায় নি বোধ হয়। সুশান্ত এবার চেঁচিয়ে ডাকল—'হ্যালো আর্টিস্ট?' ইন্দীবর ঘুরে দাঁড়াল। আমাদের চিনতে পেরে হাত নাড়ল।

—মা—আর্টিস্টকে নিয়ে চলো না। উনিও তো নৈনীতাল যাবেন।' সুশান্ত বলল। গাড়িটা ততক্ষণে ইন্দীবরকে ছাড়িয়ে কিছুটা চলে এসেছিল। একবার ভাবলাম কী দরকার ঝামেলা বাড়িয়ে। এক্ষুণি একটা কিছু পেয়ে যাবে ও। কিন্তু নিজের অজানতেই আমি গাড়ি থামিয়ে ফেলেছিলাম। সুশান্ত ইন্দীবরকে হাতছানি দিয়ে ডাকতে লাগল। ইন্দীবর হাসতে হাসতে—এগিয়ে এল। এবার ইন্দীবরকে ভালো ক'রে দেখলাম। সত্যিই ইন্দীবর সুপুরুষ। ঘি-রঙের সুটটা ওকে বড় সুন্দর মানিয়েছে। হাওয়ায় মাথার কিছু চুল কপালে এসে পড়েছে। আমি চোখ ফিরিয়ে সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। সুশান্ত আনন্দে হাততালি দিয়ে ডাকল—'কাম অন-আর্টিষ্ট।' ইন্দীবর হেসে আঙ্গুল নেড়ে অসম্মতি জানাল। এটা আমি একবার চকিতে মুখ ফিরিয়ে লক্ষ্য করলাম। আমি মৃদুস্বরে বললাম—'আপনি নৈনী যাচ্ছেন?

—হ্যাঁ।

—আপনাকে একটা লিফ্‌ট দিতে কোন অসুবিধে হবে না।'

ইন্দীবর এক মুহূর্ত কী ভাবল। তারপর গাড়ির দরজা খুলে পেছনের সীটে বসল। পীচঢালা পথ বেয়ে গাড়ি চলল। সময় হাতে খুব বেশী

নেই। আমি গাড়ির স্পীড বাড়ালাম। সুশান্ত ডাকল—'আর্টিষ্ট ?

—ইয়েস ?

—জু দেখাবেন তো ?

—অব কোর্স। কিন্তু আজকে তো তুমি স্কুলে যাচ্ছো। পরে হবে একদিন।

—বাঃ আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে কী ক'রে ?

—হবে সুশান্তবাবু দেখা হবে।

—কী ক'রে ?

একটু থেমে ইন্দীবর যেন আপন মনে বলল—আমাকে হয়তো তোমাদের ওখানকার ঐ হাসপাতালেই থাকতে হবে। কতদিন আমার ট্রিটমেন্ট চলবে কে জানে।

কথাটার মধ্যে যে গভীর বেদনা ছিল সেটা আমার মন স্পর্শ করল। কিছু বলা উচিত হবে কি না বুঝে উঠতে পারলাম না। আবার চুপ ক'রে থাকতেও কেমন অভদ্রতা মনে হচ্ছিল। কতকটা সান্ত্বনার সুরেই বললাম 'আপনার অসুখটা এমন কিছু নয়।' ইন্দীবর বোধ হয় বেশ আশ্চর্য হ'ল। ওর মুখ না দেখেও সেটা বুঝলাম যখন ও বলল—'ইয়ে— মানে আপনি জানলেন কী ক'রে ?

—আপনার হবু চিকিৎসকির কাছ থেকে।

ও 'হবু' কথাটার অর্থ ধরতে পারল না। বলল 'হবু' মানে কী ? আমি হাসলাম। বললাম—। ডাঃ কল্যাণ মিত্র যিনি আপনার ট্রিটমেন্ট করবেন।

—ও। তাই বলুন।' ইন্দীবর হাসল। একটু থেমে বলল—'আচ্ছা ডাঃ মিত্র আমার সম্বন্ধে কী বলেছেন ?

—বলেছেন আপনার কেসটা খুব ইন্টারেস্টিং। ট্যুর থেকে ফিরে টেক আপ করবেন।'

ইন্দীবর আর কিছু বলল না। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। তারপর কখনো মুখ ফিরিয়ে সুশান্তর সঙ্গে দু' একটা কথা বলতে লাগল। বেশ অন্যমনস্ক মনে হচ্ছিল ওকে। এক সময় আমি বললাম—'আপনি তো অবাঙালী ?

—হ্যাঁ।' মৃদু হাসির শব্দ পেলাম।

—কিন্তু বেশ বাঙলা বলেন আপনি।

—ক'লকাতায় আমার জন্ম। পড়াশুনোও ওখানেই। আর্ট কলেজে পড়েছিলাম কয়েক বছর। কাকার আপত্তিতে শেষে আর্ট কলেজ ছেড়ে কমার্স পড়তে হ'ল।

—বাবা – আর্ট থেকে কমার্স ?' হেসেই বললাম আমি।

—আজ্ঞে হ্যাঁ—অনর্থের জগৎ থেকে একেবারে অর্থের জগতে—রঙ্ থেকে বেরঙে।' ইন্দীবর হাসতে বলল।

পরে সারা রাস্তা আমার সঙ্গে বিশেষ কোন কথা হ'ল না। ও সুশান্তর সঙ্গে যা কথাটথা বলল।'

একটু থেমে রেবেকা বলতে লাগল 'নৈনীতাল পৌঁছে গেলাম। সলভেশন আর্মির অফিসের সামনে গাড়ি দাঁড় করালাম। খোঁজ করতে গিয়ে জানলাম সুশান্তদের স্কুলের গাড়ি তখনও আসে নি। অপেক্ষা করতে হবে। আরো কয়েকজন অভিভাবক তাঁদের ছেলেদের নিয়ে এসেছিলেন। সকলেই অপেক্ষা করছি। কিন্তু স্কুলের বাসের দেখা নেই। আমি অধৈর্য হ'য়ে উঠলাম। প্রায় এগারোটা বাজতে চলল। ইন্দীবর বলল—'কতক্ষণ আর বাসের জন্যে অপেক্ষা করবেন ?' 'ও তখনও চলে যেতে পারে নি। সুশান্ত বারবার বলছিল—আমাকে সী অফ ক'রে তবে যাবেন। তাই ও যায় নি।

—উপায় কি ?' আমি বললাম!

—ওখানে একটা ফোন করলে হয় না ?

—ঠিক বলেছেন ?—আমি বললাম—'কথাটা এতক্ষণ আমার মনেই হয় নি। কিন্তু স্কুলের ফোন নাম্বারটা তো—দাঁড়ান—দাঁড়ান। সুশান্ত তোর আইডেন্টিটি কার্ডটা দে তো।' আইডেন্টিটি কার্ডে ফোন নম্বর পাওয়া গেল। ইন্দীবর বলল—'চলুন--ফোন কার ব্যাপারটা জেনে নেবেন।'

—তাই ভালো। চলুন।

কাছেই পোস্ট অফিস থেকে ফোন করলাম। স্কুলের রেক্টারকে পেলাম। উনি বললেন—'স্কুলের দু'টো বাসই খারাপ হ'য়ে গেছে। মেরামতি চলছে। এখনও সঠিক কিছু বলা যাচ্ছে না কবে নাগাদ ছাত্রদের নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। সুশান্ত সব শুনে খুশীতে হাততালি দিয়ে ব'লে উঠল—'তাহলে মা—জু দেখতে চল। 'আমি আপত্তি করলাম—'না আজকে নয়—অনেক বেলা হ'য়ে গেছে।, সুশান্ত শুনতে চাইল না। বারবারই বলতে লাগল—আজকে চলো।

—ঠিক আছে।' আমি বললাম—'কালকে তোমাকে জু দেখাতে নিয়ে আসবো।

—ঠিক।

—ঠিক।,

ইন্দীবর এগিয়ে এল। বলল—'তাহ'লে মিসেস মিত্র। আমি চলি।'

—সে কি। আপনার বন্ধুর বাড়িটা মানে আপনার বর্তমান আস্তানাট

দেখে যেতে হবে না ? কালকে এসে কোথায় খুঁজবো আপনাকে ?

—তা ঠিক। কিন্তু তাহ'লে তো আপনার গাড়িতেই আমাকে যেতে হবে।

—তাই যাবেন বৈ কি। আসুন।

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বললাম—'আপনার বন্ধুর বাড়িটা কোনদিকে ?

— ঐ যে বাঁদিকের মোড় ছাড়িয়ে।'

গাড়ি চলল। একটা বাঁক ঘুরতেই নৈনীতালের লেকটা কাছে থেকে দেখা গেল। গাড়ির গতি বাড়ালাম। দু'টো মোড় পেরোতে ইন্দীবর বলল— 'ঐ সামনের হলদে বাড়িটা।

—ওটাই আপনার বন্ধুর বাড়ি ?

—হ্যাঁ।'

হলদে বাড়িটার সামনে গাড়ি থামালাম। চারদিকে দেয়ালঘেরা বেশ বড় বাড়ি। গাড়ি থামতে বাড়ির বিরাট লোহার গেট এর সামনে টুলেবসা দরোয়ান উঠে দাঁড়াল। ইন্দীবর বলল—

— আপনি লিফট না দিলে কী দুর্ভোগ কপালে ছিল কে জানে। অনেক ধন্যবাদ।'

—না-না—এতে ধন্যবাদ দেবার কী আছে।

—সুশান্তবাবু।' গাড়ির জানলা দিয়ে বাড়ানো সুশান্তর হাত ও জড়িয়ে ধরল দু'হাতে।

—ইয়েস।' সুশান্ত বলল।

—ফির মিলেঙ্গে—আবার দেখা হবে।

—কালকে জু দেখাবেন কিন্তু।

—অব কোর্স। কালকে কখন আসবে ?

উত্তরটা আমিই দিলাম। বললাম—'কালকে বিকেলের দিকে ওকে নিয়ে আসবো।'

—চারটে নাগাদ আসুন। আমার বন্ধুটি অবশ্য বিজনেস ট্যুরে দিল্লী গেছে। তা হ'লেও কোন অসুবিধে হবে না।

—ঠিক আছে। ঐ সময়েই আসা যাবে।' আমি বললাম।

একসিলারেটরে চাপ দিলাম। গাড়ি চলতে শুরু করল। ইন্দীবর দু'হাত তুলে নমস্কার করল। আমি একটা হাত তুললাম। গাড়ি চালালাম লেক এর দিকে। ওখান দিয়ে গিয়ে রঙটিলার রাস্তা ধরবো।' রেবেকা থামল। অরুণা চুপ ক'রে রইল। কোন কথা বলল না। রেবেকা আবার বলতে লাগল—

"পরের দিন সকালবেলা। কিছুক্ষণ আগে আমাদের ব্রেকফাস্ট খাওয়া শেষ হ'য়েছে। সুশান্ত ঘুম থেকে উঠেই জীনসএর কাউবয় পোশাক পরে, মাথায় টেক্সাসমার্কা বড় ঘেরঅলা টুপী পরে, হাতে খেলনা নিয়ে সারা বাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছিল। দু'একবার আমাকে আর কাজের লোক দুর্গার মাকে পিস্তল দিয়ে ভয় দেখিয়ে গেছে। আমি দুর্গার মাকে কী কী রান্না হবে তার ফিরিস্তি দিচ্ছিলাম। হঠাৎ শুনলাম—নীচে সুশান্ত চেঁচিয়ে উঠল—'হ্যাণ্ডস্ আপ।' বুঝলাম নকল পিস্তল দেখিয়ে কাউকে ভয় দেখাচ্ছে। পরক্ষণেই চমকে উঠলাম। ড্রইংরুমের দেরাজে রাখা আসল পিস্তলটা বার করেনি তো? কল্যাণ পিস্তলটা নেপাল থেকে এনেছিল। পিস্তলটার বৈশিষ্ট্য হ'ল যে ওটার ম্যাগাজিন খুলে রাখা যায়। আমি কল্যাণকে কত বলেছি দেরাজটায় চাবি দিয়ে রেখো—কিন্তু ওর যুক্তি প্রয়োজনের সময় চাবি দিয়ে দেরাজ খুলে পিস্তল বার করতে করতে পিস্তলের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে। সুশান্ত আগে একদিন ঐ পিস্তলটা বের করেছিল। ভাগ্যিস কল্যাণ কাছেই ছিল। ওর হাত থেকে কেড়ে নিয়েছিল ওটা। কেমন অস্বস্তিবোধ করলাম। আজকে আবার ওটা বের করেনি তো? ভয়ই বা দেখাচ্ছে কাকে?

নীচে নেমে এলাম। দেখি দরজার কাছে বাইরে সুশান্ত পিস্তল ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরে দরজার কাছে ইন্দীবর দু'হাত উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। ডান হাতে একটা প্যাকেট। আমি সুশান্তর কান ধ'রে শাসন করতে যাবো ব'লে এগিয়েই সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়ালাম। একী? সুশান্তর হাতে যে আসল নেপালী পিস্তলটা। চমকে তাকালাম দেরাজটার দিকে। দেরাজ হাঁ ক'রে খোলা। সুশান্ত তখনও আমাকে দেখে নি। আমি সঙ্গে সঙ্গে দরজার আড়ালে চলে এলাম। আমাকে দেখলে সুশান্ত নিশ্চয়ই পালাতে যাবে। তখন গুলী ছুটে যাওয়া বিচিত্র নয়।

আমি যেন বুকে দম পাচ্ছিলাম না। সময় বয়ে যাচ্ছে। আমি দরজার আড়াল থেকে ইন্দীবরকে লক্ষ্য ক'রে চাপাস্বরে বললাম—পিস্তলটা আসল। ইট'স্ লোডেড।' ইন্দীবরের হাস্যোজ্জ্বল মুখ শুকিয়ে গেল। ও আমার দিকে তাকাবে বলে ঘাড় ফেরাচ্ছে আমি চাপাস্বরে দ্রুত ব'লে উঠলাম—আমার দিকে তাকাবেন না।' ইন্দীবর একটু ভেবে নিয়ে জোরে ব'লে উঠল-'হু আর য়ু?—আয়াম ফান্টম।' সুশান্তর হাতে পিস্তলটা তখন নড়ছে। আমার সমস্ত শরীর যেন অসাড় হ'য়ে গেল। আমি দু'হাতে চোখ ঢাকলাম। শুনলাম ইন্দীবর বলছে—' ঐ দেখ ভিভা তিক্কা আসছে।' সুশান্ত বোধহয় পিছু ফিরে তাকাল। আমিও তাকালাম। দেখলাম

ইন্দীবর খুব দ্রুত ঝাঁপিয়ে পড়ে সুশান্তর হাত থেকে পিস্তলটা কেড়ে নিল। সুশান্ত চীৎকার ক'রে কাঁদতে লাগল। আমি অবশ্য শরীরটা নিয়ে কোনরকমে এসে সোফায় ব'সে পড়লাম। সুশান্তকে শাসন করবো কি আমার কথা বলার শক্তি লোপ পেয়ে গেছে। আন সম্বিত ফিরে পেয়ে দেখি ইন্দীবর আমার সামনে দাঁড়িয়ে। বলল—'এরকম ফায়ার আর্মস আপনারা বাচ্চাদের হাতের কাছে রাখেন?' আমি দুর্বলস্বরে বললাম —'অনেকদিন বলেছি ওঁকে কিন্তু—।'

—দাঁড়ান।' এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে ইন্দীবর দক্ষিণের ঘরটা দেখিয়ে বলল—ও ঘরে আপনারা কী রাখেন?

—বাতিল জিনিসপত্র।

—আপনি একটু আসতে পারবেন?' ইন্দীবর ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলো।

আমি দুর্বল শরীরটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। দক্ষিণের ঘরটায় ঢুকলাম দু'জনে। ইন্দীবর একটা বড় বাতিল কাঠের আলমারী দেখিয়ে বলল— 'এটার মাথায় রেখে দিচ্ছি। ম্যাগাজিনটা আলাদা ক'রে রাখলাম। সুশান্ত আর নাগাল পাবে না।' আলমারীর মাথায় রেখে ইন্দীবর হাত ঝেড়ে বলল—'কী সাংঘাতিক কাণ্ড!'

ড্রইংরুমে ফিরে এসে বসলাম দু'জনে। ধারে কাছে সুশান্ত কোথাও নেই। কোথাও লুকিয়েছে বোধহয়। ইন্দীবর উঠে দাঁড়িয়ে বলল— 'আমার বন্ধু দিল্লী থেকে কাল রাত্রেই ফিরেছে। ও একটা সুন্দর জয়পুরী ভাসা এনেছে। আপনাকে প্রেজেন্ট করার লোভ সামলাতে পারলাম না।' কথাটা ব'লে ইন্দীবর টেবিলে রাখা প্যাকেটটা খুলল। সত্যি অপূর্ব ভাসটা। কালোর ওপর সোনালি লতাপাতার কাজ করা। মৃদু আপত্তি করলাম।' বললাম—এসবের কোন প্রয়োজন ছিল না। ইন্দীবর কোন কথা না বলে নমস্কার করল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পিছু ফিরে বলল —সুশান্তবাবুকে যেন বকবেন না।

আমি হাসলাম—'বেশ।'

—আমি চারটের সময় আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করবো।'

চ'লে গেল।' ইন্দীবর

রেবেকা থামল। হয়তো পরের ঘটনাগুলো ভাবতে লাগল। অরুণা তাড়া দিল—'তারপর কী হ'ল বল।' রেবেকা ব'লে চলল—'দুপুর নাগাদ সুশান্তর স্কুল থেকে ফোন এল। বাস মেরামত হ'য়ে গেছে। সেই সল-ভেশন আর্মির অফিসের সামনেই স্কুলের বাস অপেক্ষা করবে। ছাড়বে ঠিক সওয়া চারটেয়। হাতে সময় কম। তাড়াতাড়ি আবার সব গোছ-

গাছ ক'রে নিতে হ'ল। সুশান্ত বারবার অভিমান ক্ষুব্ধস্বরে বলতে লাগল- 'জু দেখা হ'ল না।' সত্যিই ও খুব আশা ক'রে বসেছিল।

সুশান্তকে ঠিক চারটের সময় স্কুলের বাসে তুলে দিলাম। এবার গাড়ী চালালাম ইন্দীবরের বন্ধুর বাড়ির দিকে। ইন্দীবরকে খবরটা দিয়ে যেতে হয়। নইলে ও বেচারা কী ভাববে?

দূর থেকেই উইণ্ড স্ক্রীন দিয়ে দেখতে পেলাম ইন্দীবর হলদে বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। পরে একটু অসহিষ্ণু ভঙ্গীতে পায়চারী করছে লক্ষ্য করলাম।

আকাশে মেঘলা ভাবটা সেদিন কেটে গেছে। চারদিকে রোদ্দুরের ছড়াছড়ি। ইন্দীবরের পরনে খয়েরী স্যুট। গলায় ফুলতোলা মোটা টাই। দেখতে ওকে খুব প্রাণবন্ত মনে হচ্ছিল। আমার গাড়িটা দেখে ওকে বেশ খুশী হ'য়ে উঠতে দেখলাম। গাড়ি থামাতে ও এগিয়ে এল। বোধহয় আশা করেছিল সুশান্তর উৎফুল্ল কণ্ঠস্বর—'হ্যাল্লো আর্টিস্ট?' কিন্তু গাড়িতে সুশান্তকে না দেখে ও সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। আমি বললাম—সুশান্তকে আনতে পারি নি।

—কেন? ওর শরীর ভালো তো?' একটু চিন্তিত মুখে ও বলল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ ভালো। দুপুরে টেলিফোন পেলাম ওর স্কুল থেকে। স্কুলের গাড়ির মেরামতি হ'য়ে গেছে। এইমাত্র ওকে স্কুলের গাড়িতে তুলে দিয়ে এলাম।'

—ও।' একটু থেমে বলল –'তাহলে তো সুকান্তবাবু খুব মনখারাপি নিয়ে গেছে।

—সে আর বলতে। আমি হাসলাম। দুজনেই চুপ ক'রে রইলাম। বোধহয় দু'জনে কেউ কথা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ ইন্দীবর ব'লে উঠল 'আপনি যখন এসেছেন—ভেতরে আসবেন না? অন্ততঃ এক কাপ চা।'

—না—না।' আমি ব'লে উঠলাম—'বরং বাইরে কোথাও খাওয়া যেতে পারে।' আসল কথা ঘরের বদ্ধতায় ফিরে যেতে আমার ভালো লাগছিল না। দু'তিন দিন মেঘ বৃষ্টি ঝড়ের পরে সেদিনই দুপুর থেকে ঝক্‌ঝকে রোদ উঠেছিল। চারদিক ঝলমল করছিল রোদে। দূরের পাহাড়ের সারিগুলো সেদিন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল অনেক দূর পর্যন্ত। শরীরমন বেশ চাঙা হ'য়ে, উঠেছিল যেন। শুধু উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছে করছিল। ইন্দীবরকেও সতেজ সপ্রতিভ মনে হচ্ছিল। হয় তো ওর সান্নিধ্যটা আমার মনে অনুরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটিয়ে থাকবে। তাই

বাইরে কোথাও গিয়ে চা খাওয়ার প্রস্তাবটা নির্দ্বিধায় ক'রে বসলাম। ইন্দীবর সঙ্গে সঙ্গে রাজী হ'ল। গাড়ির দরজা খুলে পেছনে উঠে বসল। গাড়ি চালালাম লেকএর দিকে। এদিকটায় লোকজনের ভীড়। বেশীরভাগই ট্যুরিস্টর দল। এখন অবশ্য সীজন না,। কাজেই মাত্রাছাড়ানো ভীড় এখনও হয় নি। ইন্দীবর বলল একসময়—'চলুন লেক ভিউ রেস্তোরাঁয় যাওয়া যাক।' লেক ভিউ রেস্তোরাঁটার সামনে এসে দেখি বেশ ভীড় ওখানে। বললাম—এখানে বড্ড ভীড়। বরং ফাঁকা কোন রেস্তোরায় যাওয়া যাক।'

আসল কথা নৈনীতাল এলে কল্যাণের সঙ্গে বরাবর এই লেক ভিউ রেস্তোরাঁতেই খেতে আসি। সেদিন কেন জানি ওখানে যেতে মন সরল না। কারণটা তলিয়ে ভাববার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কোন সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে পারছিলাম না। একবার ভাবলাম ইন্দীবরকে কোথাও নামিয়ে দিয়ে বরং একা একা ঘুরে বেড়াই: আমার স্বামীর পেশেন্ট। এর বেশী কী-ই বা সম্পর্ক ওর সঙ্গে! পরিচয়ও তো মাত্র দু'দিনের। হয় তো তেমনি কিছু একটা বলার জন্যে মুখ ফেরালাম—পেছনের সীটের দিকে। এক মুহূর্তের জন্যে। দেখি ইন্দীবর এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমাব দিকে তাকিয়ে আছে। কোলের—কাছে স্কেচ খাতাটা খোলা। বললাম —'কিছু আঁকছেন নাকি?'—

আপনাকে।' এত স্পষ্ট স্বীকৃতি আশা করি নি। মনে মনে রাগ হ'ল। তো কম নয়। আমাকে আগে বলবার প্রয়োজন পর্যন্ত মনে করল না। সাহসের সাথে মনের ভাবটা গোপন না ক'রেই বললাম—'আগে অনুমতি নেওয়াটা কিন্তু ভদ্রতা।' ইন্দীবর বেশ অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়ল বুঝলাম। ফস্ ক'রে পাতা ছেঁড়ার শব্দ পেলাম। কাগজটা দলা পাকিয়ে বাইরে ফেলে দিল বোধ হয়। আস্তে বলল—'আমাকে মাপ করবেন।' আমি কোন কথা বললাম না।

গাড়ি চালালাম লেকএর ধারের রাস্তাটা দিয়ে। একটু পরে ও বলল—'ঐ গাছটার কাছে পার্ক করুন।' ওর নির্দেশিত জায়গাটাতেই গাড়ি থামালাম। সত্যি কথা বলতে কি বেশ দ্বিধা বোধ করছিলাম। নামবো কি নামবো না। কিন্তু এখন পিছিয়ে যাওয়াটা অভদ্রতা হবে! আমাদের মধ্যে কোন কথা হ'ল না আর।

গাড়ি থেকে নামলাম। রেস্তোরাটায় ঢুকলাম দু'জনে। যেখানে বসলাম সেখান থেকে লেক এর জল দেখা যায় না। কিন্তু শূন্যতাটা দেখা যায় আর পাহাড়ের সারিগুলো।

রেস্তোরাঁটায় কী খেয়েছিলাম সেদিন ভালো ক'রে মনে করতেও পারবো না। শুধু মনে আছে খাওয়া শেষ ক'রে বাইরে বেরোলাম যখন তখন সূর্যটা পশ্চিমের পাহাড়ের মাথায়। যেতে যেতে কোন কথাই হয় নি আমাদের মধ্যে। আমি ছিলাম আমার চিন্তা নিয়ে। একজন সদ্য পরিচিত পুরুষ। তার সঙ্গে ঘুরে বেড়ানো খাওয়া দাওয়া করাটা কতটা উচিত হচ্ছে আমার পক্ষে। কল্যাণ, তুমি—তোমরা শুনলে কী ভাবে নেবে ব্যাপারটাকে।

বাইরে গাড়ির কাছে এসে ইন্দীবর বলল—'মাত্র কয়েকদিনের মেয়াদে এখানে এসেছি। কালপরশুর মধ্যেই চ'লে যেতে হবে। কাকা তাগাদা দিয়ে চিঠি লিখেছে।' একটু থেমে বলল—'তবু আপনার দয়ায় কিছু ঘোরা হ'ল।' কথাগুলোর মধ্যে কেমন একটা গভীর বেদনা বোধ করলাম। সেই বেদনার স্বরটা আমাকে বেশ বিচলিত করল। মুহূর্তে সব ভুলে গেলাম। বুঝলাম ইন্দীবর আমার সাহচর্য চাইছে। এটা একটা অনুভূতির ব্যাপার—ঠিক ব্যাখ্যা ক'রে বোঝাবার মত নয়। আমি জানতে চাইলাম—' এখন কোথায় যাবেন আপনি?

—হনুমানজীর মন্দিরে।'

হনুমান কথাটা শুনে আমার হাসি পেল। হেসে ফেললাম। ইন্দীবর বলল—কী ব্যাপার! হাসছেন?

আমি সাবধান হলাম। ওর পক্ষে হনুমানজীর ভক্ত হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়। কিন্তু হনুমান কথাটার সঙ্গে যে হাস্যরস জড়িয়ে আছে তার তত্ত্বটা ওকে বোঝানো যাবে না। কাজেই পাশ কাটালাম। বললাম—'একেবারে মন্দিরে চ'লে যাবেন শুনে হাসি পেল। সন্ন্যাসী হবার বাসনা নেই তো?'

—ও না না।—মন্দিরটার একটা স্কেচ করব।' তারপর কেমন একটা অদ্ভুত বিষাদের সঙ্গে বলল—'হ'লে একদিন হয় তো উন্মাদ হ'য়ে যেতে পারি কিন্তু সন্ন্যাসী হব না।'

—কী বলছেন যা তা।' একটু ধমকের সুরেই বললাম। গাড়ির দরজা খুলে বললাম—'উঠে আসুন। রাস্তাটা আমি কিন্তু ঠিক চিনি না।'

হনুমানজীর মন্দিরে পৌঁছতে বেশ দেরীই হ'ল। ইন্দীবর ঘুরে ঘুরে নানা দৃষ্টিকোন থেকে মন্দিরটা দেখল। তারপর পছন্দমত একটা জায়গা বেছে নিয়ে স্কেচ খাতা খুলে স্কেচ করতে লাগল। একটু পরেই স্কেচখাতা বন্ধ ক'রে আমার কাছে এল। বলল—'স্কেচ করতে ভালো লাগছে না।' অগত্যা মন্দিরটার চারপাশে ঘুরে ঘুরে বেড়ালাম। পাহাড়ী

নদীটার ধারে বসলাম কিছুক্ষণ। কথাবার্তা বিশেষ কিছুই হল না। কিন্তু হঠাৎ কখনো মুখ ফিরিয়ে ইন্দীবরের দিকে তাকালে দেখতে পাচ্ছিলাম ও মুগ্ধদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। রূপস্তুতির স্পষ্ট চিহ্ন সেই দৃষ্টিতে। ব্যাপারটা আমি যে একেবারেই উপভোগ করছিলাম না তা, নয়। তবে নিজেকে শাসনও করছিলাম। আবার ভাবছিলাম—একদিন বৈ তো নয়। তারপর কোথায় থাকবে ও কোথায় থাকবো আমি। হয়তো আর জীবনে দেখাই হবে না।

সেদিন ফেরার পথে ওকে ওর বন্ধুর বাড়ির সামনে নামিয়ে দিলাম। ও হাসিমুখে আমাকে নমস্কার করল। তারপর আমি সারা রাস্তা যে কথাগুলো বলবো বলে স্থির ক'রে এসেছিলাম উইণ্ডস্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে সেই কথাগুলো বললাম—'ইন্দীবরবাবু।'

—বলুন।' ও আগ্রহভরে এগিয়ে এল। এই প্রথম ওকে আমি নাম ধ'রে ডাকলাম।

—দেখুন—আমি আমার স্বামীকে ভালোবাসি।' একটু থেমে বললাম—'আমি চাই না আপনার সঙ্গে আমার আর দেখা হয়।' কথাটা শেষ ক'রে গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে এক পলক ওর দিকে তাকিয়ে দেখেছিলাম। ওর মুখের হাসি নিভে গেছে। মুখ পাণ্ডুর ব্যথাহত।'

আমি চলে এলাম। নিজেকে ধিক্কার দিতে দিতে এলাম। কী প্রয়োজন ছিল এসবের? কেন এর মধ্যে নিজেকে জড়ালাম? অনেক আগেই আমি স'রে আসতে পারতাম।'

একটু থেমে রেবেকা বলতে লাগল—'অরুণাদি তুমি কালকে তাল্লিমলে ট্যাক্সির জন্য দাঁড়িয়েছিলে। তোমাকে দেখতে পেয়ে গাড়িতে তুলে নিয়েছিলাম। তোমার সঙ্গে বেশী কথা বলতে পারিনি। তুমি আমার অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করেছিলে। জানতে চেয়েছিলে আমার শরীর ভালো আছে কিনা।' রেবেকা থামতে অরুণা বলল—'সত্যি তোর কালকের ব্যবহারটা আমার কাছে দুর্বোধ্য লেগেছিল। পরে ভেবেছিলাম—কল্যানের চিঠিপত্র পাস্ নি। এজন্যে তোর মেজাজ বিগড়ে আছে বোধহয়।'

রেবেকা ধীরে ধীরে বলতে লাগল—'অদ্ভুত মানুষের মন। যে আমি নিষ্ঠুরের মত ইন্দীবরের মুখ ম্লান ক'রে দিলাম সেই আমিই কিন্তু পরকীয়া প্রেমের রসস্বাদটা বেশ উপভোগ করছিলাম। আমার মনকে বোঝাচ্ছিলাম অন্যকথা। দুর্বলতা যে আমি একেবারেই দেখাই নি এ কথা সত্য নয়। তবে এরপরে যা কিছুই ঘটেছে তার জন্যে আমি যতটা না দায়ী তার চেয়ে অনেক বেশী দায়ী পরিবেশ। তার প্রভাবকে এড়ানো কঠিন। অন্ততঃ

আমি এড়াতে পারি নি। নিজেকে সংযত করবার চেষ্টা করেছি—সংযত করেছিও—কিন্তু বাঁধ যখন ভাঙল তখন বন্যার জল সবকিছু ভাসিয়ে দিল। তা রোধ করার কোন উপায় ছিল না।'

একটু থেমে রেবেকা বলতে লাগল—'আজকে দুপুর নাগাদ কলিং বেল বেজে উঠল। খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে বিছানায় শুয়ে গল্পের বই পড়ছিলাম। খুব একটা মন দিয়ে পড়তে পারছিলাম না। চোখের দৃষ্টিটা মাঝে মাঝেই বাইরের দিকে চলে যাচ্ছিল। আকাশটা পরিষ্কার। গভীর নীল। সাদা মেঘের স্তুপ এখানে ওখানে। মাঝে মাঝে ধোঁয়ার মত কালো মেঘ উড়ে যাচ্ছিল। রোদ একটু ম্লান হ'য়েই আবার উজ্জ্বল হ'য়ে উঠছিল। নানা চিন্তা ঘুরে ফিরে আসছিল। তারমধ্যে ইন্দীবরের কথাও যে দু'একবার চিন্তার ভীড়ে উঁকি দেয় নি এখন নয়। কলিং বেলএর শব্দ হ'তে নীচে নেমে এলাম। এখন আবার কে এলো? ভাবলাম তুমিই হয় তো খোঁজ-খবর নিতে এসেছো। আবার ভাবলাম—ইন্দীবর নয় তো? অথবা কল্যানও হ'তে পারে। আগে থেকে কোন খবর না দিয়ে আমাকে চমকে দেবার জন্যে চ'লে এসেছে।

'দরজা খুলে দেখি—ইন্দীবর দাঁড়িয়ে। মাথার চুল অবিন্যস্ত। মুখের সেই উজ্জ্বল ভাবটা নেই। চোখের নীচে কালচে ভাব। বোধহয় ভালো ঘুম হয় নি। পরণে সেই খয়েরী স্যুট। গলায় ফুল তোলা সেই নেকটাই। ওর হাতে বাচ্চাদের একটা ক্যারাম বোর্ড।

একটু অবাকই হলাম। ও বোর্ডটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল—'সুশান্তকে দেবেন। আমি একটু মৃদু আপত্তির সুরে বললাম—'এটা নিয়ে যান।' ও একটুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর মৃদুস্বরে বলল—'আপনার বোধহয় পছন্দ হয়নি।'

—এটা সুশান্তর পছন্দের ব্যাপার—আমার নয়।

—তাহ'লে সুশান্ত যদি অপছন্দ করে—ফিরিয়ে নিয়ে যাব।' গলায় বেশ জোর দিয়ে ও কথাগুলো বলল।

আমার একটু রাগই হ'ল। ও হয়তো সেটা আমার মুখভঙ্গীতে লক্ষ্য ক'রে থাকবে। মৃদুস্বরে বলল—'কালকেই গোয়ালিয়র ফিরে যাচ্ছি। যাবার আগে একবার দেখা ক'রে গেলাম।' আমি কোন কথা বললাম না। তবে কথাটা শুনে আমার মন একটু দুর্বল হ'ল। বললাম—'কাকার জরুরী তলব? —হ্যাঁ।' এতক্ষণে ইন্দীবর মৃদু হাসল। নমস্কার ক'রে বলল—'আচ্ছা চলি।' ইন্দীবর আমার হাতে বোর্ডটা দিয়ে যাবার জন্য পা বাড়াল। আমার কী যে হল। একটা গভীর সহানুভূতি বোধ করলাম ওর জন্যে।

যদি না ওর অসুস্থতার কথা জানতাম—তাহ'লে হয় তো আমার এই সহানুভূতিবোধ আসতো না। অথবা ওর সঙ্গ চাইছিলাম কিনা—ভালো লাগছিল কিনা দুপুরের নৈঃশব্দ—বাইরের ঝকৃঝকে রোদে উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়ানোর ইচ্ছে—বাইরের চলমান জগৎ, বাধাবন্ধহারা গতিময় সময়—ভগবান জানে কী মনে হয়েছিল আমার—তবে ঘরের আলস্যে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছিল না—এটা অনুভব করেছিলাম। নিজের অজ্ঞানতেই ব'লে বসলাম—'বসুন—আমি বেরুবো।' ও প্রথমে কথাটা বুঝতে পারে নি। বেশ অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর একটু ইতস্ততঃ ক'রে বলল—'মানে—আমি ঠিক—'

—আমার সঙ্গে বেরুতে আপনার আপত্তি আছে? বললাম।

—না—না—সে কথা নয়।' ও তাড়াতাড়ি ব'লে উঠল—'মানে—আমি তো—'

—ভেতরে এসে লক্ষ্মী ছেলের মত বসুন। আমি এক্ষুণি তৈরী হ'য়ে আসছি।' ক্যারামবোর্ডটা সোফার পাশে রেখে আমি ওপরে উঠে এলাম।

আবার নৈনীতাল। লেকএর পাশে পাশে উদ্দেশ্যহীন গাড়ি চালিয়ে বেড়ানো। একসময় গাড়ি থেকে নেমে যে ঘাটে নৌকো ভাড়া পাওয়া যায় সেখানে বসলাম। ইন্দীবর পকেট থেকে স্কেচখাতা বের করল। নিবিষ্ট মনে স্কেচ করল কয়েকটা। তাল্লিমলের সদাব্যস্ত পথ, নৌকোভাড়ার ঘাট, নৌকো, লোকজন ওপারের পাহাড় এইসব। আবার সেই রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসলাম। বেশ খিদে পেয়েছিল। নিঃশব্দে খাচ্ছিলাম। একসময় দেখি ও এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। সেই রূপমুগ্ধ দৃষ্টি। ওটা একেবারেই উপভোগ করছিলাম না—এমন নয়। মৃদুস্বরে বললাম—'কী দেখছেন অমন করে?

—আপনাকে।' ইন্দীবরের কণ্ঠস্বর একটু যেন কেঁপে উঠল। আমি খেতে লাগলাম। কোন কথা বললাম না।

—আপনি সত্যি বড় সুন্দর।' ও মন্ত্রমুগ্ধের মত বলল কথাটা। বুঝলাম ও কী বলছে—এসব বলা উচিত কিনা—তার অর্থই বা কী—এসব কিছু না ভেবেই ও কথাটা বলল। আমারও কী হ'ল। মৃদুস্বরে বললাম—

—আপনিই বা কম যান কীসে?' মৃদু হাসল ও। তারপর আমাকে মুসলমানী ঢং এ আদাব ক'রে বলল—'যদি অনুমতি করেন তবে একটা উর্দু শায়েরী বলি।

—বলুন।' আমি হেসে বললাম। বেশ উপভোগ করছিলাম ব্যাপারটা। বেশ শুদ্ধ উচ্চারণে ও একটা উর্দু শায়েরী বলল। বাংলা

করলে তার অর্থ দাঁড়ায়—কী হবে সেই রূপে যদি না তা কারো চোখে স্তুতির আলো জ্বালল? কী হবে সেই করবীতে যদি না তা কারো পুষ্পসজ্জায় সার্থক হ'ল?' শায়েরীটা বেশ উপভোগ করলাম। একটু ঠাট্টার লোভ সামলাতে পারলাম না। বললাম—

—দাগা খেয়েছেন মনে হচ্ছে।

ইন্দীবর ম্লান হাসল।

তারামঠ দেখতে যাওয়ার প্রস্তাবটা আমিই করলাম। তারামঠ গিয়ে যখন পৌঁছলাম তখন বিকেল হ'য়ে গেছে। পথে যেতে যেতে আমি বেশ আগ্রহ প্রকাশ করাতে ইন্দীবর ওর প্রথম প্রেমের সেই চিরন্তন কাহিনী শোনাল। শুরু ও শেষ সেই এক ছকে বাঁধা। আর্ট কলেজেরই এক বাঙালী সহপাঠিনী। বিয়ের প্রস্তাবের মুখোমুখি হ'তে পিছিয়ে গেল। শুধু পিছিয়ে গেল না ইন্দীবরের সঙ্গে পরিচয়টুকু পর্যন্ত অস্বীকার ক'রে বসল। পরে নাকি সে এক টাকপড়া জাঁদরেল অফিসারকে বিয়ে ক'রে দিল্লী পাড়ি দিয়েছিল। উৎসুক চোখে মুখে শ্রদ্ধা আর বিস্ময় নিয়ে যে মেয়েটি ইন্দীবরের কাছে পল গর্গা, ভ্যান গক আর লোত্রার্কের বিচিত্র প্রণয়কাহিনী শুনেছে—সে-ই ঠিক সময়মত সব ভুলে গেছে। অর্থ, নিরাপত্তা আরাম আর পাঁচটা মেয়ের মতই চেয়েছে। হৃদয়ের সব ভালোবাসা উজাড় ক'রে দিয়েও ইন্দীবর তাকে ফেরাতে পারে নি।

তারামঠের স্কেচ করতে লাগল ইন্দীবর। আমি ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। তারামঠে কল্যাণের সঙ্গে বার কয়েক এসেছি। সবই দেখা আমার। একেবারে সাদা রঙের পরিষ্কার তকতকে মন্দিরটা। মেঝেটা শ্বেতপাথরে বাঁধানো। একটা ছোট্ট টিলার ওপরে মন্দিরটি। ঠিক নীচেই একটা ক্ষুদ্রকায় পাহাড়ী নদী বয়ে চলেছে। চারদিকে উঁচু উঁচু পাহাড়ের প্রহরা।

তখন সূর্য অস্ত যায় যায়। লালচে আলো পড়েছে মন্দিরের চূড়োয়। মন্দিরের প্রাঙ্গণ থেকে এক ঝাঁক পায়রা উড়ে গেল উপরে। আকাশে জটলা পাকিয়ে উড়তে লাগল। ওগুলোর পাখায় পড়ন্ত আলো পড়ে মনে হচ্ছিল যেন সোনালি ডানা। একপাশের পাহাড়গুলার চূড়োয় স্বর্ণাভ দীপ্তি। যেন আকাশে মাটিতে সর্বত্র সোনা ছড়ানো।

কখন ইন্দীবর স্কেচ আঁকা শেষ ক'রে আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে বুঝতে পারিনি। বুঝলাম ওর কথা শুনে।

—আচ্ছা মিসেস মিত্র—যা কিছু আমাদের ভালো লাগে সেসব আমরা ধ'রে রাখতে পারি না কেন?

—ঠিক বুঝলাম না।' আমি ওর দিকে ফিরে তাকালাম।

—ধরুন যাকে আমার ভালো লাগে তাকে চিরদিনের জন্যে কাছে কাছে পাই না কেন?

—সমস্যা আছে যে।

—সমস্যা?

—হুঁ, যাকে ভালো লাগে তাকে চিরদিনের জন্যে পেলে সেই ভালো লাগায় ভাঁটা পড়তে পারে।

—কখনো না।

—ওটা আবেগ—যুক্তি নয়।

—এই যে ক'টা দিন আপনার সঙ্গে কাটলো—আপনাকে তো আমি—

বাধা দিয়ে বললাম—'ঐ দেখুন—কী সুন্দর দৃশ্য।' পায়রাগুলো এখন কিছুটা নেমে এসেছে। পাহাড়ের চুড়োগুলো তখনও স্বর্ণাভ। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ইন্দীবর ব'লে উঠল—স্পেল্‌নডিড।' ও এতই অভিভূত হ'য়ে পড়েছিল যে আর কিছু বলতে পারল না। বললাম—আজকে রোদের তেজ কম। নইলে দেখতেন একেবারে গোল্ডেন বার্ডস্। সোনালি কবুতর সব। ওদের পাখনায় যেন সোনার আলো ঝল্‌সে উঠ্‌ছে।'

—তাহ'লে এর আগেও আপনি এই দৃশ্য দেখেছেন?

—হ্যাঁ—নইলে বললাম কী করে।

যেন আপনমনেই ইন্দীবর বলল—'বোধহয় আপনার হাজবেণ্ডএর সঙ্গে।

—বলাই বাহুল্য।

ইন্দীবরের মুখটা যেন একটু ম্লান হ'য়ে গেল। স্বামীর প্রসঙ্গটা এড়াতে পারতাম। কিন্তু ইচ্ছে ক'রেই এড়ালাম না। এতে ইন্দীবরকে সংযত করতে চাইছিলাম। সুরে বাঁধা তারটা যেন ছিঁড়ে গেল। আমরা দু'জনে দু'দিকে তাকিয়ে রইলাম। কতক্ষণ দু'জনে চুপ করে ব'সে রইলাম জানি না। বুঝতেও পারিনি কখন চারদিক অন্ধকার হ'য়ে এল। ইন্দীবরই একসময় বলল—চলুন।

আমি নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালাম।

গাড়ি চলল চড়াই উৎরাই পেরিয়ে। একসময়ে বহুদূরে নৈনীতালের আলোর মালাপরা শহরটা ক্ষীণ দেখা গেল। একটা উৎরাইয়ের মুখে সে দৃশ্যটা আড়াল পড়ল। তারপর আর দেখা গেল না। কারণ ততক্ষণে আকাশ মেঘে মেঘে অন্ধকার হয়ে গেছে। রাঙাটিলার কাছাকাছি আসতেই প্রবল বেগে বাতাস ছুটল। চারদিক নিকষ অন্ধকার। গাছের পাতা

ধুলোবালিতে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। গাড়ির স্পীড অনেক কমিয়ে দিয়ে হেডলাইট জ্বেলে দিলাম। দেখ্‌তে দেখতে বৃষ্টি শুরু হ'ল। ঝোড়ো বাতাসের গোঁ গোঁ শব্দ। সেইসঙ্গে মুহুর্মুহু বাজ পড়ার প্রচণ্ড শব্দ। আমাদের হাসপাতালের চৌহদ্দী তখন নজরের মধ্যে। ভাবলাম এই দুর্যোগে ইন্দীবর কী ক'রে ফিরবে? ওকে যদি রাস্তায় নামিয়ে দি ও কাকভেজা হ'য়ে যাবে। বাস বা ট্যাক্সি পাওয়া এখন প্রায় অসম্ভব। এসব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে হাসপাতালের সামনে এলাম।

হাসপাতালের মেন গেট আধখোলা। হর্ণ বাজালাম। দরোয়ান এসে দরজা সবটা খুলে দিল। ইন্দীবর কী ভাবছিল ভগবান জানে।

হাসপাতালের কম্পাউণ্ডে গাড়ি ঢুকতে দেখে ও বোধহয় সম্বিত ফিরে পেল। ব'লে উঠল—'কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?

—গরীবের কুটিরে।' আমি সামনের দিকে চোখ রেখে বললাম।

—কিন্তু—এটা কি ভালো হবে?

—তাহ'লে কি এই ঝড়বৃষ্টিতে আপনাকে রাস্তায় নামিয়ে দিলেই আপনি খুশী হতেন?

—তা নয়। তবে—মানে--

—আমাদের ওখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিন। ঝড়জল কমে গেলেই চলে যাবেন।

—না—ভাবছিলাম।

—সেই ভাবনাটা ড্রইংরুমে গিয়ে ব'সে ব'সে ভাবুন। যান।

—আপনি?

—গাড়িটা গ্যারেজ ক'রে আসছি। এই নিন ঘরের চাবি।

গ্যারেজ থেকে ফিরে আসতে বেশ ভিজে গেলাম। ড্রইংরুমে ঢুকে দেখি ইন্দীবর জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। বললাম—'ভেজেন নি তো? ইন্দীবর চমকে ঘুরে তাকাল। খুব গভীরভাবে কিছু ভাবছিল ও।

—ন্নাঃ—' ও একটু মৃদু হাসল। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল—'কিন্তু আপনি তো বেশ ভিজে গেছেন।' কথাটা বলতে বলতে ওর চোখের দৃষ্টি তীব্র হ'য়ে উঠল। আমার বুকে পিঠে গায়ে শাড়ি ভিজে লেপ্‌টে আছে। এতে নারীদেহের রহস্যময়তা হয়তো দুর্বোধ্যতায় গিয়ে পৌঁছোয়। এমন অবস্থায় কল্যাণকে দেখেছি তীব্র আবেগে আমাকে জড়িয়ে ধরতে। ইন্দীবরও পুরুষ। কাজেই সহজাত আত্মরক্ষা প্রবৃত্তি আমাকে সজাগ ক'রে দিল। আমি দ্রুত পায়ে স'রে এলাম। হয়তো আমার ব্যবহারের এই

অভদ্র চেহারাটা ইন্দীবরের কাছে প্রকট হ'য়ে উঠে থাকবে তাই সহজ আবহাওয়া গড়ে তুলতে আমি দোতলার সিঁড়িবারান্দা থেকে বললাম—'কী খাবেন? চা না কফি?

—কফি, তবে একটা কথা।

—শুনছি।

—যদি অনুমতি কয়েন তাহ'লে কফিটা আমিই তৈরী করছি।

—সানন্দে অনুমতি দিলাম।' কিচেনটা দেখিয়ে বললাম—'সোজা চলে যান। সেফএ সব পাবেন।'

বাইরে তখন মুহুর্মুহু বজ্রপাত আর ঝড় চলছে। ইন্দীবরই কফি তৈরী ক'রে নিয়ে এল। চুমুক দিয়ে বুঝলাম ওর এসব বানাবার অভ্যেস আসে।

কফি খেতে খেতে কথাবার্তা বলতে লাগলাম। দু'একটা এটা ওটা কথাবার্তার পর ঝড়ের প্রসঙ্গ উঠল। কে কত ভীষণ ঝড় দেখেছি তারই অভিজ্ঞতা বর্ণনা চলল কিছুক্ষণ। হিসেব ক'রে দেখলাম যা কিছু ভীষণ ঝড় দেখেছি আমরা সেসবই ছেলেবেলায় দেখা। এখন নাকি তেমন সাংঘাতিক ঝড় হয় না। আমি একসময় হেসে বললাম—

—একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছেন?

—কী?

—যাঁকেই জিজ্ঞেস করুণ সে-ই বলবে তাঁরা ছেলেবেলায় যেমন প্রচণ্ড ঝড় দেখেছে এখন আর তেমনটি দেখেন না।

—সত্যিই তো।' ইন্দীবর বলল।

—না সত্যি নয়। আসল কথা-ছেলেবেলায় প্রথম পৃথিবী দেখার বিস্ময় নিয়ে আমরা সবকিছুকেই বড় ক'রে দেখি। বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে সেই বিস্ময় কমে আসে। সবকিছু তখন তাদের বড়ত্ব হারিয়ে ফেলে।

—ঠিক বুঝলাম না।' ইন্দীবর মাথা দুলিয়ে বলল।

—উদাহরণ দিয়ে বলছি। ধরুণ যে শহরে আপনার ছেলেবেলা কেটেছে অনেকদিন বাইরে কাটিয়ে বড় হ'য়ে সেই শহরে ফিরে এলেন। দেখবেন ছেলেবেলায় যে রাস্তাগুলোকে কত বড় ব'লে মনে হ'ত—তখন সেগুলো অনেক ছোট ব'লে মনে হচ্ছে।

ইন্দীবর চুপ ক'রে কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর মৃদুস্বরে বলল—'আপনি সত্যিই বুদ্ধিমতী।

—প্রশংসার জন্যে ধন্যবাদ।' আমি মাথা ঝুঁকিয়ে হাসলাম।

বেশ শীত শীত করছিল। একে বৃষ্টিতে ভিজেছি তার ওপর ঠাণ্ডা ঝোড়ো হাওয়া। বললাম—'আপনার শীত করছে না?

—তা একটু করছে। যখন ভাবছি বাইরে বেরোতে হবে—অনেকটা পথ যেতে হবে—শীতটা তখন যেন বেড়ে যাচ্ছে।

দাঁড়ান—' আমি বললাম—'আপনার জন্যে একটু ব্র্যাণ্ডি নিয়ে আসছি। ঠাণ্ডা পড়লেই ও গরম দুধের সঙ্গে দু'এক চামচ ব্র্যাণ্ডি মিশিয়ে খায়। খুঁজে দেখি আছে কিনা।

—দুধের সঙ্গে দেবেন না যেন।' ও ব'লে উঠল।

—দুধের সঙ্গে খেলেই তো ভালো।

—না- দুধটুধ খেলে কেমন নিজেকে বাচ্চাছেলে ব'লে মনে হয়।

—বাব্বাঃ—

—বরং একটু গরম জলের সঙ্গে মিশিয়ে—

—আপনার অভিরুচি।' আমি কিচেনে গেলাম।

ব্র্যাণ্ডির শিশিটা পেলাম। একটু খোঁজাখুঁজি করতে হ'ল অবশ্য। দু'চামচে ব্র্যাণ্ডি গরমজলে মিশিয়ে নিয়ে আর শোবার ঘর থেকে একটা কম্বল নিয়ে ড্রইংরুমে এলাম। কম্বলটা পায়ে জড়িয়ে আরাম ক'রে বসলাম। ইন্দীবর ব্র্যাণ্ডি মেশানো গরম জলটুকু খেয়ে নিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ইন্দীবর বেশ উচ্ছল হ'য়ে উঠল। ঘরটার এ মাথা থেকে ও মাথা দু'একবার পায়চারী ক'রে নিল। তারপর বলল 'ঝড়বৃষ্টির যা চেহারা দেখেছি তা'তে ঘণ্টাখানের এদিকে আর কমছে না।' একটু থেমে বলল—'সময়টা তো কাটাতে হবে। আসুন না একটু ক্যারাম খেলা যাক।' ইন্দীবরের সুশান্তকে উপহার দেওয়া ঝকঝকে ক্যারামবোর্ডটা একটা সোফার গায়ে দাঁড় করানো ছিল। বাচ্চাদের খেলার ছোট্ট বোর্ড। সেটাই টেবিলে পেতে দু'জনে দু'পাশে সোফা টেনে নিয়ে বসলাম। দু'জনেই ক্যারাম খেলায় আনাড়ী। তার মধ্যে আমি তবু দু'একটা ঘুঁটি পকেটস্থ করতে পারছিলাম ইন্দীবর তাও পারছিল না। আনাড়ীপনা সত্ত্বেও খেলা বেশ জমে উঠল। কিছুক্ষণ খেলা চলার পরই ইন্দীবরের দুষ্টবুদ্ধি মাথায় চাপল। ও লাল ঘুঁটিটা বোর্ড থেকে আমার চোখের আড়ালে তুলে নিতে লাগল। তারপর যথারীতি লাল ঘুঁটি সে ফেলেছে সোচ্চারে এই দাবী তুলে পাঁচ পয়েন্ট ক'রে নিতে লাগল। আমি তক্কে তক্কে রইলাম। কোথায় লুকোয় লাল ঘুঁটিটা।' একবার স্ট্রাইক ক'রেই ও চেঁচিয়ে উঠল—'ঐ দেখুন বৃষ্টির ছাঁটে সব ভিজে গেল।' আমি জানতাম সব জানালা বন্ধ। তবু ও কী করে দেখবার জন্যে পেছন ফিরে তাকাবার ভান করেই দ্রুত ওর দিকে ফিরে তাকালাম। ও তখন লাল ঘুঁটিটা পকেটে পুরছে। আমি মুহূর্তে সব ভুলে গেলাম। লুকোচুরির মজাটা যেন আমাকে পেয়ে বসল। আমি প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে

ওর কোটের পকেটে হাত ঢোকাতে গেলাম। চেঁচিয়ে উঠলাম—'তবে রে—চোরামি হচ্ছে?

ইন্দীবর হাসতে হাসতে আমার বাড়ানো ডান হাতটা চেপে ধরল। আমি তখন মরীয়া হ'য়ে উঠেছি। ঘুঁটিটা পকেট থেকে বের করবই। বাঁ হাত বাড়ালাম। সেই হাতটা ও চেপে ধরল। হাত দু'টো ছাড়াতে গিয়ে আমি প্রায় ওর গায়ে গিয়ে পড়লাম। ঠিক তখনই ইন্দীবর দু'হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরল। আমি চমকে উঠলাম। এ কী করছে ও? আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই গভীর আবেগে ও আমার মুখচুম্বন করল। আমার সমস্ত অনুভূতি যেন লোপ পেয়ে গেল। বিদ্যুৎচমকের মত ঝলসে উঠল কয়েকটা সত্য—রাত হয়েছে, বাইরে ঝড়বৃষ্টি, বাড়িতে তৃতীয় প্রাণী কেউ নেই—আমি অরক্ষিত অসহায়। ইন্দীবরের মুখের দিকে তাকালাম। আশ্চর্য সুখপরিতৃপ্ত ওর চোখমুখ। সেখানে উদগ্র কামনার চিহ্নটুকু পর্যন্ত নেই। যেন এক বহু-আকাঙ্খিত বস্তু ও পেয়েছে। অধিকার হিসেবেই পেয়েছে। সে যা করল তা'তে অন্যায় যেন কিছু নেই। নীতিহীনতার অনুশোচনা বা অনাধিকারের বিন্দুমাত্র দ্বিধা লজ্জার বোধটুকুও সেখানে অনুপস্থিত।

—বেরিয়ে যান।' আমি দৃঢ়স্বরে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম। প্রথমে ও বুঝতে পারে নি আবার একইস্বরে বললাম—'বেরিয়ে যান এখান থেকে।' স্পষ্ট বুঝলাম আমাকে জড়িয়ে ধরা ওর হাতদু'টো শিথিল হ'য়ে এল। এক ঝট্‌কায় ওকে সরিয়ে দিয়ে আমি উঠে দাঁড়ালাম। আঙ্গুল দিয়ে দরজা দেখিয়ে বললাম—'এক্ষুণি বেরিয়ে যান। ইতরামো আমার বরদাস্ত হয় না।' ইন্দীবর দ্রুত উঠে দাঁড়াল। ওর দু'চোখে যেন আগুন জ্বলে উঠল। মুখটা ফ্যাকাসে। এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে দাঁড়চাপাস্বরে ব'লে উঠল—'আমি ইতর—ইতর আমি?' কথাটা ব'লে ও উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল। তারপর হঠাৎ আমার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলল—'আপনি কী? বেশ্যাদের তবু চেনা যায়। আপনাদের মত ওদের কোন প্রিটেন্স নেই—ভড়ং নেই।'

ইন্দীবর আমাকে এমন নীচভাষায় আক্রমন করবে এ আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। বেশ্যা শব্দটা শুনে অপমানের জ্বালায় ক্রোধে দুঃখে আমার সারা শরীর থর্ থর্ ক'রে কাঁপতে লাগল। আমি চীৎকার ক'রে বললাম —আর একটি কথাও নয়—বেরিয়ে যান।' ইন্দীবর কিন্তু একই ভঙ্গীতে ব'লে যেতে লাগল—'ছেলেটাকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন—স্বামীও বিদেশে যা খুশী ক'রে বেড়াচ্ছেন। এই নিয়ে ক'টা ভদ্র যুবকের মাথা খেয়েছেন শুনি।'

আমার আর সহ্য হ'ল না। আমার চোখের সামনে সবকিছু যেন মুছে গেল। গলা বুঁজে এল। চোখ জ্বালা ক'রে জল বেরিয়ে এল। পাশে সোফাটার ওপর ভর রেখে আমি দু'হাতে মুখ ঢাকলাম। একটা শব্দ পর্যন্ত উচ্চারণ করতে ইচ্ছে করছিল না। কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে ছিলাম জানি না' হঠাৎ ইন্দীবরের অশ্রুবিকৃত কণ্ঠস্বর শুনলাম। কেমন একটা স্বপ্নের ঘোরে ও ব'লে চলেছে—'রেবেকা আমি তোমাকে অপমান করেছি—আমি যা-খুশী তাই বলেছি—রেবেকা—আমাকে ক্ষমা কর'।

এ কী বললাম তোমাকে—এ কী করলাম—এ আমার কী হ'ল। এমন কথা তোমাকে আমি বলতে পারলাম—রেবেকা—।' আমি এতক্ষণে ওর দিকে তাকালাম। দেখি দু'হাতে সোফায় ভর দিয়ে ও মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। স্পষ্ট বুঝলাম—ও কাঁদছে। ওর শরীরটা কান্নার আবেগে কেঁপে কেঁপে উঠছে। একটুক্ষণ। হঠাৎ ইন্দীবর মুখ তুলে তাকাল। স্থির কোন লক্ষ্যের দিকে নয়। ওর দৃষ্টি এদিক ওদিক ঘুরছে। ওর অশ্রুসিক্ত চোখে প্রতিজ্ঞার এক দৃঢ় সংকল্প ফুটে উঠতে দেখলাম। ও যেন আপনমনেই বলতে লাগল—'কাউকে ভালোবাসার, কারোর ভালো-পাবার কোনরকম যোগ্যতা আমার নেই। আমার বেঁচে থাকার কোন মানে নেই। মৃত্যু—হ্যাঁ মুছে ফেলব নিজের অস্তিত্বটাকে। অর্থহীন এই বেঁচে থাকা—মিনিংলেস।' মাথায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ও দ্রুতপায়ে দক্ষিণের ঘরটার দিকে ছুটল। বিদ্যুৎচমকের মত একটা ভয়াবহ পরিণতির চিন্তা আমাকে প্রায় অবশ ক'রে ফেলল। আশঙ্কায় আমি এক দুর্বোধ্য ভাষায় চীৎকার ক'রে উঠলাম। পরক্ষণেই ছুটলাম ঐ ঘরের দিকে। যা আশঙ্কা করেছিলাম তাই। সেদিন যে পিস্তলটা ও খুলে আলাদা ক'রে রেখেছিল আলমারীর মাথায় সেই দু'টোই ও এর মধ্যে তুলে নিয়েছে। শুধু তাই নয় ম্যাগাজিনটাও লাগানো হ'য়ে গেছে। এখন শুধু ট্রিগার টেপার অপেক্ষামাত্র। আমি ছুটে গিয়ে ওর হাতটা ধরতে গেলাম। প্রায় চীৎকার ক'রে বললাম—'এ কী করছেন আপনি?' ও এক ঝটকায় আমাকে সরিয়ে দিল। তবু বাধা দিতে আপ্রাণ চেষ্টা করলাম। ও এখন এক অন্য মানুষ। পারলাম না, যা হবার তাই হ'ল। গুলী ছুটে গেল। কোথায় গুলী লাগল সেটা আর দেখার ধৈর্য আমার তখন নেই। শুধু দেখলাম ইন্দীবর মেঝেতে উপুড় হ'য়ে গড়িয়ে পড়ল। আমি সে দৃশ্য সহ্য করতে পারলাম না। ঘরের লাইটটা না নিভিয়েই ড্রইংরুমে চলে এলাম।' একটু পরে রেবেকা বলল—'এই পর্যন্তই আমি মনে করতে পারছি। তারপর তুমি এসে ডাকলে। আমি দরজা খুলে দিলাম।'

হু'জনেই অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইল, কেউ কোন কথা বলল না।
একসময় রেবেকা বলল —আচ্ছা অরুণাদি—ওর গুলীটা কোথায় লেগেছে?

—বুকে।

—ও কি সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেছে?

—তাই তো মনে হয়। হাতে মুখে হাত দিয়ে দেখেছি। ঠাণ্ডা, তাড়াহুড়োতে বুকে হাত দিয়ে দেখতে পারি নি। তবে গুলীটা তো বুকে লেগেছে। বেঁচে থাকার কোন আশা নেই।

অরুণা সে রাত্রে নিজের কোয়ার্টারে ফিরে গেল না। রেবেকার কাছেই রইল। হু'জনের কেউই অনেকক্ষণ ঘুমুতে পারল না। শেষ রাত্রের দিকে অরুণা তবু একটু চোখ বুঁজতে পেরেছিল। ঘুমই এসে গিয়েছিল। কিন্তু মনের এই তোলপাড় অবস্থায় রেবেকা হু'চোখ এক করতে পারল না। একটা চিন্তাই ঘুরে ঘুরে আসছে। হয় তো এতক্ষণে ইন্দীবরের দেহ আবিষ্কৃত হ'য়েছে। হয় তো পুলিশে খবর গেছে। খোঁজ পড়ে গেছে চারিদিকে। অথবা এই জলঝড়ে ওর দেহটা এখনও কেউ দেখে নি। নৈনীতাল যাওয়ার রাস্তার ধারে একটা পুরোনো ছোট্ট শিবমন্দির। মন্দিরটাকে একটা বটগাছ আস্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। রাস্তা থেকে ঢালু জমি। তারপর বুনো ঝোপঝাড়ের জঙ্গল। তারপরেই মন্দিরটা। এখনো দেহটা ঐ ঝোপঝাড় জঙ্গলের আড়ালে পড়ে আছে বোধহয়। কেউ দেখেনি এখনো। পাহাড়ী জমিতে বৃষ্টির জল দাঁড়ায় না। জায়গাটায় পায়ের ছাপ পড়ার কথা নয়। কারণ দেহটা ওরা রাস্তা থেকে ঢালু জমিতে গড়িয়ে ফেলে দিয়েছিল। ওর অতন্দ্র চোখের দৃষ্টির সামনে আস্তে আস্তে কাঁচের জানালায় আলো ফুটে উঠল। হু'টো পাখির ডাক শোনা গেল। তারপর আরো পাখির ডাক। জানালার কাঁচে আলো আরো স্পষ্ট হ'ল। ভোর হ'ল।

কলিং বেলএর শব্দে রেবেকা চমকে উঠে বসল। অরুণারও ঘুম ভেঙে গেল। রেবেকার দিকে তাকাল। বলল—'কে এলো রে?

—দুর্গার মা এসেছে বোধহয়।' হঠাৎ অরুণার মনে পড়ল—চমকে উঠে বসল। বলল—'রেবেকা—দক্ষিণের ঘরটা?

—হ্যাঁ কী হ'য়েছে?

—মেঝেটা পরিষ্কার করেছিস্?

—না—তো।

—সর্বনাশ। তুই শিগগির যা দুর্গার মাকে ও ঘরে ঢুকতে দিস না। অন্য কাজে আটকে রাখ। আমি যাচ্ছি।' অরুণা হাতমুখ ধোবার

আগেই জল ন্যাকড়া নিয়ে দক্ষিণের ঘরে ঢুকল। দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে ভালো ক'রে ঘষে ঘষে মেঝে থেকে রক্তের দাগ তুলে ফেলল। বেলা ন'টা নাগাদ খবরের কাগজ এল। দু'জনেই উদ্‌গ্রীব হ'য়ে অপেক্ষা করছিল খবরের কাগজের জন্যে। কিন্তু যে জন্যে ওদের এত অধীর প্রতীক্ষা উদ্বেগ মানসিক অশান্তি তার কোন সুরাহাই হ'ল না। কোন মৃতদেহ প্রাপ্তির খবর নেই। তন্ন তন্ন ক'রে কাগজটা খুঁজেও সেরকম কোন খবর পেল না। রোমহর্ষক খুনের জল্পনা কল্পনাও নেই। পুলিশী বিবৃতি নেই। গতরাতের ঝড়ে পাহাড়ী এলাকায় বাড়ি ধ্বসে পড়া আর বজ্রাঘাতে দু'টো গরু মরে যাওয়ার খবর আছে শুধু এক কোনায়। ইন্দীবরের কোন হদিশ সম্পর্কে সংবাদপত্র নীরব।

চারদিন কেটে গেল উৎকণ্ঠায় উদ্বেগে। মৃতদেহপ্রাপ্তি সম্পর্কে কোন খবর নেই। রেবেকা যথারীতি সংসারের কাজকর্ম ক'রে যাচ্ছে। শুধু কলিং বেল বাজলে ও চমকে চমকে ওঠে। কে এলো? পুলিশ? নাকি কল্যাণই চ'লে এলো কোন খবর না দিয়ে। অরুণা নিয়মিত ডিউটিতে হাজিরা দিচ্ছে। ও ক'দিন ধরে রেবেকার কোয়ার্টারেই আছে। রাতের খাওয়া দাওয়ার পর দুজনে শোবার ঘরে মুখোমুখি বসে' আকাশ-পাতাল ভাবে। কথা বলে। নানা সম্ভাবনার কথা ওঠে। তারপর একসময় কোন থৈ না পেয়ে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ে। ঘুম আসতে চায় না। অপরাধবোধটা ওদের দু'জনের বুকের ওপর চেপে ব'সে থাকে। ভালো ক'রে শ্বাস নিতেও কষ্ট হয়। সেদিন দুপুরে রেবেকা একাই বেরুলো গাড়িটা নিয়ে। একা একা ঘরে ব'সে থাকতে থাকতে দম বন্ধ হ'য়ে আসে যেন। চলল নৈনীতালের দিকে। কিছু দরকারী কেনাকাটা আছে। পথে পড়ল সেই বটগাছ—জড়ানো ছোট্ট শিবমন্দিরটা। কিন্তু রেবেকা সেদিকে তাকাতে সাহস করল না। কেমন গা শির্ শির্ করা একটা ভয়। সমান গতিতে গাড়িটা চালিয়ে জায়গাটা পেরোল।

নৈনীতাল পৌঁছে দরকারী কেনাকাটা সারল। তারপর ঝকঝকে রোদে লেকএর চারপাশে উদ্দেশ্যহীন গাড়ি নিয়ে ঘুরল কিছুক্ষণ। সেই ছোট রেস্তোরাটায় যেতে পা সরল না। চা টা খেল অন্য একটা রেস্তোরায়।

একসময় রঙটিলার দিকে ফিরে চলল। ফেরার পথে সেই বটগাছ-জড়ানো ছোট্ট শিবমন্দিরটা কাছে এসে গাড়ি থামাল। ও ভেবেছিল সমান স্পীড রেখে ও জায়গাটা পেরিয়ে আসবে। কিন্তু পাবল না। নিজের অজ্ঞানতেই গাড়ির গতি কমাল। গাড়িটা থামলও একসময়। ঝড়জলে জায়গাটা ভালোভাবে দেখা হয় নি। শুধু কয়েকবার বিদ্যুৎ

চমকে উঠেছিল ব'লে মন্দিরটা দেখেছিল শুধু। যে বড় রুমালটায় মাথা ঢেকে গাড়ি চালাচ্ছিল সেটা ইচ্ছে ক'রে গাড়ি থেকে আলগোছে রাস্তায় ফেলে দিল। তারপর গাড়িটা থামাল। গাড়ি থেকে নেমে রুমালটা তুলে নিল। তারপর রুমালটা হাতে জড়াতে জড়াতে মন্দিরটার কাছে ঠিক যেখানে ইন্দীবরের দেহটা গড়িয়ে ফেলে দিয়েছিল সেখানটায় এসে দাঁড়াল। গোগোর ফাঁকে নীচে তাকিয়ে দেখে নিল। তারপর মাথা উঁচু ক'রে দূরের পাহাড়ের দৃশ্য দেখার ভান করতে লাগল। ঠিক তখনই নীচে ঢালু জায়গাটা থেকে কে যেন ব'লে উঠল – রিয়েলি—এ ওয়াণ্ডারফুল সাইট।'

সচকিত হ'য়ে রেবেকা চারদিকে তাকাতে লাগল। দেখল—নীচের ঝোপঝাড়ের জঙ্গল ঠেলে একজন স্যুটকোটপরা ভদ্রলোক উঠে আসছে। ভদ্রলোক মধ্য-বয়স্ক। মাথায় সামনের দিকে টাক। রোদে ভদ্রলোকের চোখমুখ বেশ লাল হ'য়ে উঠেছে। ঢালু জমিটুকু ধীর পায়ে পার হ'য়ে রাস্তায় এসে উঠল। মুখ দিয়ে জোরে শ্রান্তির শ্বাস ফেলে বলল—'নমস্তে। রেবেকা মাথাটা একবার একটু নুইয়ে সপ্রশ্নদৃষ্টিতে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে রইল। ভদ্রলোক হেসে বলল—'আয়াম মিস্টার শর্মা। আই. বি. ইন্সপেক্টার।' কথাটা শুনে একটু চমকাল রেবেকা। ভীতির একটা শিহরণ ওর সর্বাঙ্গে নাড়া দিয়ে গেল। কিন্তু রেবেকা তার বহিঃপ্রকাশ গোপন করল। খুব স্বাভাবিক স্বরে বলল—'ও—নমস্কার।' রেবেকা কাষ্ঠহাসি হাসল। তারপর আর একটিও কথা না বাড়িয়ে গাড়িতে এসে উঠে বসল। স্টার্ট দিল গাড়িতে। মিঃ শর্মারও কোন আগ্রহ দেখা গেল না কথা বলার। যেতে যেতে পেছন ফিরে এক ঝলক দেখে নিল রেবেকা। মিঃ শর্মা নীচু হ'য়ে জুতোয় ফিতে বাঁধছে। একটু এগোতেই মোড়ের মাথায় একটা পুলিশ ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পেল। রেবেকা গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দিল। মাইলখানেক চ'লে আসার পর ও যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। যাক—আর পুলিসী জেরার মুখোমুখি হবার ভয় নেই। এতক্ষণে রেবেকা যেন সহজে শ্বাস নিতে পারল।

সন্ধ্যে হ'য়ে গেছে তখন। অরুণা ডিউটি থেকে এখানে এসে খোঁজখবর নিয়ে নিজের কোয়ার্টারে গেছে ধড়াচুড়া ছেড়ে আসতে। রেবেকা শোবার ঘরে একটা বই হাতে আধশোয়া হ'য়ে আকাশপাতাল ভাবছে। এমন সময় কলিং বেল বেজে উঠল। রেবেকা ভাবল—অরুণাদি' এসেছে বোধহয়। কিন্তু দুর্গার মাকে কিছুক্ষণ পুরুষকণ্ঠে যেন জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে মনে হ'ল। এ তবে অরুণাদি নয়। কে এলো? দুর্গার মা ততক্ষণে শোবার ঘরে এল। বলল—'মেমসাব—কোই সাহাব আয়া। মালিকসে বাৎ করনে চাহতা।'

—ডাক্তার সাহেব নেই বলেছিস্ তো ?

—জী হাঁ। লেকিন ও যাতেই নহী। বোলতা হ্যায় কি মেমসাহেবকো সাথহী বাৎচিৎ করুঙ্গা।

—ও। যেয়ে বল্—আমি আসছি।

কে এলো আবার ? রেবেকা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল ঠিক করল। মুখে পাউডার পাফটা বুলিয়ে নিল। তারপর সিঁড়ি বারান্দার দিকে চলল। ওখান থেকেই লক্ষ্য করল একজন সাহেবী পোষাকপরা ভদ্রলোক সোফাটায় উল্টোমুখী হ'য়ে বসে আছে। ভদ্রলোকের মুখের পাশটা দেখা যাচ্ছে। আর মাথার টাকটা। মুহূর্তে রেবেকার পা ছু'টো অসাড় হ'য়ে এল। ও ভীষণভাবে চমকে উঠল। মিঃ শর্মা বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করেছে ? রেবেকা দাঁড়িয়ে পড়ল সিঁড়ির মুখটায়। ভুর। লপেটা ঘষটানোর ক্ষীণ শব্দটাও মিঃ শর্মার কান এড়ায় নি। ওরা বোধহয় পেশাগত ভাবেই সজাগ থাকে। মিঃ শর্মা সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর রেবেকার দিকে তাকাল। মৃদু হেসে ছু'হাত জড়ো করল—'নমস্তে মিসেস মিট্টার্।' অগত্যা রেবেকাকেও হেসে প্রতিনমস্কার করতে হ'ল। কাছে এসে বলল—'বসুন—দাঁড়িয়ে কেন ?'

—সুক্রিয়া। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলতে হামার ভালো লাগে।' ভাঙা ভাঙা বাংলায় মিষ্টার শর্মা বলল।

তাহ'লে আমি বসছি।' রেবেকা সোফায় বসল।

—অব কোর্স।' একটু থেমে বলল মিঃ শর্মা—'হামি বাংলা খুব ভাল বলতে পারি না। তবে বুঝি—আই ক্যান আণ্ডারস্ট্যাণ্ড।

—আপনার বাংলা ভালোই—আমার বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না।' একটু থেমে রেবেকা বলল—'তা বলছিলাম আপনার শুভাগমনের হেতুটা কী ?' কথাটার মধ্যে যে শ্লেষ ছিল মিঃ শর্মা সেটা গায়ে মাখল না।' সহজসুরে বলল—'একটা কেস এর সিলসিলে মে—মানে—কেস এর বেপারে এসেছি।'

—আমার কাছে নিশ্চয়ই নয়।

—উঁহুঁ—হাপনাকেও প্রয়োজন আছে—বাট ইন এনাদার ওয়ে—অন্যভাবে।

—ঠিক বোধগম্য হ'ল না।

—ওনলি য়ু ক্যান টেল কারক্টলি—ডাঃ মিট্র কবে ওয়াপস আসবেন।

—দুঃখিত—সরি—আপনাকে হতাশ হ'তে হবে।

—কেনো ? হোয়াই ?

—কারন আমিও জানি না উনি কবে ফিরবেন।

—স্টিল—গেস্ করুণ।

—গেস্ ক'রে আর কী বলবো। তবে মনে মনে হয় ক্যালকাটা য়ুনিভার্সিটির ট্যুরটা যদি ক্যানসেল হয় তবে কালপরশুর মধ্যেই ফিরবেন। যদি ওটা ক্যানসেল না হয় তবে পাঁচ ছ'দিন দেরী হবে।

—ডাঃ মিট্র কবে ট্যুরে বেরিয়েছেন ?

—তা' দিন পনেরো হবে।

—তাহ'লে আপনি এখানে এ্যালোন—ইয়ানে—একাই আছেন।

—বলাই বাহুল্য।

—স্টিল—এই টাইমের মধ্যে কেউ কি আসে নাই।

—ও হ্যাঁ—সুশান্ত মানে আমার ছেলেটি কয়েকদিনের ছুটিতে এসেছিল।

—ছেলে চলে গেছে ?

—হ্যাঁ।

—ওয়েল—' একটু কেশে নিল শর্মা। তারপর বলল—'ডাঃ মিট্র্ যখন এখানে ছিলেন তখন ইন্দীবর শুক্লা নামে কোন ইয়ংম্যান এখানে এসেছিলেন ?

ইন্দীবরের নামটা কানে যেতেই রেবেকা সচকিত হ'ল। কিন্তু ও সামলে নিল। ওরে মুখের কোন পরিবর্তন মিঃ শর্মার দৃষ্টি এড়াবে না এটা ও ভালো ক'রেই বুঝল। কাজেই সাবধান হ'ল। সহজ ভঙ্গীতেই ও জানতে চাইল—'উনি কি আমার স্বামীর বন্ধু ?

—না-না। একজন মেণ্টাল ডিজিজ এর পেসেণ্ট।

—কতই তো পেসেণ্ট আসে। তাদের সকলের সঙ্গেই আমায় পরিচয় থাকবে—ইজ্ ইট পসিব্‌ল ?

—রাইট।' মিঃ শর্মা জুতোর হীলএ ভর রেখে একবার একটু ঘুরে নিয়ে বলল-'বাট প্রোবাবল্—ইন্দীবর শুক্লা আপনার সঙ্গে পরিচিত হ'য়েছিলেন।

—মে বি।' রেবেকা কাঁধ ঝাঁকাল।

—ইন্দীবর শুক্লার সঙ্গে তাঁর অঙ্কল ছিলেন—এ গুডলুকিং ওল্ড জেণ্টল্-ম্যান। কথাটা ঐ অঙ্কলই আমাদের বলেছেন।

রেবেকা বুঝল ও কোনঠাসা হ'য়ে পড়ছে। ইন্দীবরের সঙ্গে তার পরিচয়ের কথাটা অস্বীকার করার উপায় নেই আর। সুতরাং স্বীকার করতেই হয়। একেবারে এড়িয়ে গেলে ব্যাপারটা আরো জটিল হ'য়ে যাবে। রেবেকা একটু চিন্তার ভান ক'রে বলল—'ও—আই ক্যান রিমেম্বার নাউ।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক বোধ হয় গোয়ালিয়র থেকে এসেছিলেন। সঙ্গে একটি-ইয়ংম্যান—মে বি তার নাম ইন্দীবর শুক্লা।

মিঃ শর্মা সব জানতার হাসি হাসল। বলল—'ইট্‌স্ সো কুইক – বেশ জলদি মনে পড়ল হাপনার। ভেবেছিলাম সময় নেবেন।

—ইট হ্যাজ গট এ রিজন। দ্যাট ইয়ংম্যান—তার মেন্টাল ডিজিজটা একটু অদ্ভুত ধরনের। ডাঃ মিত্র বলেছিলেন – কেসটা ইন্টারেস্টিং। সেইজন্যে তাড়াতাড়ি মনে পড়ল।

—তাহ'লে কেসটা কী তাও জানেন—আই হোপ সো।

—ন্যাচারালি। শুধু ইন্টারেস্টিং শুনে আমরা ক্ষান্ত থাকি না। কেন ইন্টারেস্টিং সেটাও জানবার কিউরিয়াসিটি হয় বৈ কি।

—হুঁ। ওয়েল—হাপনি ছাড়া আর কোন লেডি কি এখানে থাকেন? আই মিন—আপনার কিথ এণ্ড কিন—সাম আদার—

—নাঃ।

—ঐ সোফাটার সামনে দেখুন—এ পেয়ার অব চপ্পল। মেড অব রাবার আই থিঙ্ক।

—ওটা তো আমারও হ'তে পারে।

—দ্যাট কান্ট বি।

—হোয়াই?

—আপনার পায়ের মাপের চেয়ে—ঐ পেয়ার এক সাইজ বড়।

রেবেকা একটু অবাক হ'য়ে মিঃ শর্মার দিকে তাকাল। ভদ্রলোকের নজর বেশ তীক্ষ্ণ। মনে পড়ল ঐ চপ্পল জোড়া অরুণাদির। একটু হেসে বলল—'হাউ ফানি। চপ্পল জোড়া অরুণাদির। ভুলে ফেলে গেছে বোধ হয়।

—আপনার রিলেটিভ?

—হ্যাঁ—দিদি।

—তিনি এখানে থাকেন?

—না-তার কোয়ার্টার আছে এই কম্পাউণ্ডের মধ্যে।

—উনি কি এখানে কাজ করেন?

—হ্যাঁ-আমার হাজব্যাণ্ডের পি· এ·।

—ও আই সি'। মিঃ শর্মা পকেট থেকে একটা সিগারেট লাইটারের বের ক'রে হাতে ঘোরাতে লাগল। সিগারেট বের করল না। রেবেকা একটু চুপ ক'রে থেকে বলল—'ওয়েল মিঃ শর্মা—মে আই আস্‌ক সামথিং?

—অব কোর্স।

—আপনার প্রশ্নগুলো কিন্তু পুলিশী জেরার মত লাগছে।

—ভেরি সরি—আয়াম হেল্পলেস। মিঃ ইন্দীবর শুক্লার গত কয়েক-দিনের গতিবিধি -মানে—কোথায় কোথায় গিয়েছিলেন কা'র কা'র সঙ্গে দেখা করেছেন—এসব ইন ডিটেলস্ জানাই হামার এইম।' একটু থেমে মিঃ শর্মা ব'লে উঠল—'ওয়েল—মিসেস মিট্রর—নমস্তে—হাপনাকে আর বিরক্ত করব না। সরি—দিস ইজ আওয়ার জব।' মিঃ শর্মা সিগারেট বের করল। লাইটার জ্বেলে সিগারেট ধরাল। তারপর ধীরে পায়ে চলে গেল।

একটা একাকীত্ব বোধ যেন রেবেকাকে পেয়ে বসল। বড় বেশী ক'রে মনে পড়তে লাগল কল্যানের কথা। ও এখানে থাকলে এমনি একটা ঘটনার সঙ্গে রেবেকাকে জড়িয়ে পড়তে হ'ত না। কল্যাণের ওপর একটা অভিমান হ'ল। কল্যাণ যাবার আগে একথাটা একবারও ভেবে দেখল না যে বেশ ক'টা দিন ওকে একা একা থাকতে হবে। ট্যুরটাই ওর কাছে বড় হ'য়ে উঠল। অথচ আশ্চর্য এই—রেবেকাকে কোয়ার্টারে একা রেখে কল্যাণের ট্যুরে বাইরে যাওয়া বা হাসপাতালের কাজে বাইরে যাওয়া নতুন কিছু নয়। এর আগেও এরকম ঘটেছে। অনেকদিন ওকে একা থাকতে হ'য়েছে। কিন্তু আজকেই ওর সবচেয়ে বেশী অভিমান হ'ল। রেবেকা অপেক্ষা করতে লাগল কখন অরুণা আসে। সন্ধ্যের পরেই অরুণা এল। রেবেকা সব বলল তাকে। অরুণা মন দিয়ে শুনল সব কথা। তারপর একটু চিন্তিতস্বরে বলল—'ঠিক বুঝতে পারছিনা মিঃ শর্মার উদ্দেশ্যটা কি?

—আমিও বুঝতে পারলাম না। সমস্ত ব্যাপারটাই আমার কাছে ধোঁয়াটে লাগছে।

—মিঃ শর্মাকে পষ্টাপষ্টি জিজ্ঞেস করলেই পারতিস্।

—তখন ওকে আমি এড়াতে পারলে বাঁচি।

—পাগল।' অরুণা হাসল—'পুলিশ যখন এ ব্যাপারে নাক গলিয়েছে তখন দেখতে হবে না—প্রাণ অতিষ্ঠ ক'রে তুলবে।' একটু থেমে বলল-যাক গে বোঝা যাচ্ছে মিঃ শর্মা এ ব্যাপারে খুব এগোতে পারে নি। অন্ধকারেই হাতড়াচ্ছে। এখন কল্যাণ কবে আসবে বল্। অভিমান ক্ষুব্ধস্বরে রেবেকা বলল-ভগবান জানে। দিনগুলো আমার কীভাবে কাটছে সে শুধু আমিই জানি। আর ও নিশ্চিন্তমনে হিল্লী দিল্লী ক'রে বেড়াচ্ছে।'

—দ্যাখ্ না—, অরুণা সান্ত্বনা দিল—'হয় তো আজকালের মধ্যেই চলে আসতে পারে।'

—সেটা কী ক'রে হবে?

—ক'লকাতার ট্যুরটা তো ফিক্স্‌ড্‌ হয় নি।

—না—তা' হয় নি।

—তবে?' রেবেকা অসহিষ্ণু ভঙ্গীতে মাথা নাড়ল—'কিছুই ভাবতে পারছি না আমি।' তারপর বিছানা থেকে উঠে ঘরময় পায়চারী করতে লাগল। অরুণা কিছুক্ষণ ওর পায়চারী করা দেখল। তারপর একটা বালিস টেনে নিয়ে বিছানায় আধশোয়া হ'ল।

পরদিন দুপুরে খাওয়া দাওয়া হ'য়ে গেছে। ঘরে একা একা শুয়ে শুয়ে ভালো লাগে না রেবেকার। দুপুরের এই নিঃসঙ্গ সময়টা যেন আরো অসহ্য। ভালো লাগছে না। একটু বেড়িয়ে এলে হয়। নৈনীতাল যাওয়া যাক। জানালা দরজার জন্যে নেট কাপড়ের পর্দা সেদিন দেখে এসেছিল। আজকে কাপড়টা কিনে আনলে হয়। কিন্তু যখনই ও ভাবছে ঐ শিবমন্দিরটার কথা তখনই বেড়াতে যাবার উৎসাহে ভাঁটা পড়ে যাচ্ছে। ঐ শিবমন্দিরটার ধার দিয়ে যেতে হবে। ফিরতেও হবে ঐ পথেই—ওটার ধার দিয়েই। অপরাধবোধের দমবন্ধকরা অনুভূতিটা ওকে যেন পেয়ে বসে। তবু রেবেকা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল একসময়। অন্ততঃ দুশ্চিন্তা উদ্বেগের হাত থেকে কিছুক্ষণের জন্যে তো রেহাই পাওয়া যাবে। গাড়ি চলল। শিবমন্দিরটার দিকে রেবেকা তাকাল না পর্যন্ত। ফুল স্পীডে ঐ পথটুকু অতিক্রম ক'রে গেল। নৈনীতাল যখন পৌঁছল তখন বিকেল বিকেল। বিস্কুট, জেলী, পাঁপড় ফুরিয়ে গিয়েছিল—কিনল সেসব। আরো কিছু টুকিটাকি কেনা সেরে লেকএর ধারে ধারে রাস্তায় রাস্তায় কিছুক্ষণ উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়াল। ঠিক তখনই লক্ষ্য করল একটা বাদামী রঙের এ্যাম্বাসেডার গাড়ি কিছুতেই গাড়ির পেছন-ছাড়া হচ্ছে না। রেবেকা প্রথমে ব্যাপারটাকে তেমন গুরুত্ব দিল না। বাদামী রঙের গাড়িঅলাও বোধহয় ওর মতই উদ্দেশ্য-হীন ঘোরার আনন্দেই ঘুরছে। কিন্তু রেবেকা কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝল —ওরই গাড়ির পেছনে পেছনে ঐ গাড়িটার আসা আকস্মিক কিছু নয় ইচ্ছাকৃত ব্যাপার এটা। রেবেকা প্রথমে অস্বস্তি বোধ করল। তারপর ভীত হ'ল। ও একটু দ্রুত গাড়ি চালিয়ে লেক ভিউ রেস্তোরাঁর সামনে এসে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে নামবার ফাঁকে আড় চোখে তাকিয়ে এব নজরে দেখে নিল বাদামী গাড়িটার চালক কে? চোখে গগল্‌স মাথায় টুপী পরা মধ্যবয়স্ক এক ভদ্রলোক নির্বিকার মুখে সিগারেট টানছে' গাড়িটা আর ওখানে দাঁড়াল না। সমান গতিতে সোজা বেরিয়ে গেল।

একটু চিন্তান্বিত মনেই রেবেকা রেস্তোরাটায় ঢুকল। দেখল ট্যুরিস্টদের

ভীড়। হাসি কথা—খুশীর ফোয়ারা ছুটছে। প্যাট বুনএর একটা গান বাজছে। কেউ শুনছে ব'লে মনে হচ্ছে না! ও মনে মনে হাসল। প্যাট বুনএর নতুন রেকর্ড বেরুলে ও একসময় পাগলের মত সেটা জোগাড় করতে ছুটত। ওর সবচেয়ে প্রিয় শিল্পী ছিল অবশ্য এলভিস প্রিস্টলে। নিগ্রো স্পিরিচয়ালসেরও ভালো কালেকশন ছিল ওদের। এসব বাবা ভালোবাসত। আজ কত দূরে স'রে এসেছে রেবেকা। কফি খেতে খেতে এসব সাত পাঁচ ভাবছিল রেবেকা। কিন্তু এত মানুষের ভীড়, গুনগুন, রাস্তার ব্যস্ততার মধ্যেও নিজের নিঃসঙ্গতাবোধ থেকে মুক্তি পেল না ও। দুশ্চিন্তা উদ্বেগের হাত থেকেও না। কফি শেষ ক'রে কিছুক্ষণ ব'সে রইল। লোকজনের ভীড়ের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর উঠে পড়ল। কিছুই ভালো লাগছে না। বাড়ি ফেরা যাক।

ফেরার পথে রেবেকা অন্যমনস্কভাবে গাড়ি চালাচ্ছিল। চোখের সম্মুখে পথ ঘাট, বাড়িঘর মানুষজন দ্রুত স'রে স'রে যাচ্ছে। এই দৃশ্যটা ওর মনে একসময় বিস্ময় আর আনন্দের সঞ্চার করত—যখন ও নতুন গাড়ি চালাতে শিখেছিল। কল্যাণ ওকে নিজের হাতে ড্রাইভ করা শিখিয়েছিল। অরুণাদি-কেও। কল্যাণ বলে—সম্ভাব্য সমস্ত প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করবার জন্যে আমাদের তৈরী থাকা উচিত। এইজন্যে যত কিছু শেখা সম্ভব সুযোগ পেলেই তা' শিখে রাখা উচিত। কল্যাণের এই এক অদ্ভুত যুক্তি। ও নিজে টাইপিস্টের কাছ থেকে টাইপ করা শিখেছে, ফোন অপারেটরের কাছ থেকে পি বি. এক্স বোর্ড চালানো শিখেছে। ইদানিং মোটর মেকানিজম নিয়ে পড়েছে। এও শিখে ফেলবে। সেলাইয়ের কল কিনে দিয়েছে রেবেকাকে। নিজেও সেলাইকল চালানো শিখেছে। পরিচিত দর্জির কাছে গিয়ে কাটছাঁট শিখেছে। নিজের একটা বেঢপ শার্ট বানিয়েছে। ভালোভাবে আরো বানাবার ইচ্ছে ছিল। রেবেকা তা' হ'তে দেয় নি। রেবেকা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বড় বেশী ক'রে মনে পড়ছে কল্যাণের কথা।

গাড়ি চলছে। রেবেকার অন্যমনস্ক মনটা হঠাৎ নাড়া খেল। একটা মোড় ঘোরার সময় গ্লাসএ তাকাতেই দেখল পেছনে সেই বাদামী রঙের এ্যামবাসেডারটা। রেবেকা গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দিল। কিছুক্ষণ পরে রঙটিলা যাওয়ার রাস্তার মোড়টা এল। ও স্টিয়ারিং ঘোরাল। বেশ জোর স্পীডে রঙটিলার রাস্তাটা ধ'রে কিছুটা এগিয়ে এসে গ্লাসএর দিকে তাকাল। দেখল পেছনের রাস্তাটা ফাঁকা। গাড়িটা নেই। এতক্ষণের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা কেটে যেতে নিজেকে বড় ক্লান্ত মনে হল রেবেকার।

কোয়ার্টারে ফিরে অরুণাকে ড্রইংরুমে ব'সে থাকতে দেখে ও বেশ

অবাকই হ'ল। শোবার ঘরে না ব'সে এখানে ব'সে আছে কেন? অরুণাদির ডিউটি শেষ হ'তে তো এখনো ঘণ্টাখানেক বাকী। অসময়ে হাসপাতাল থেকে চলে এসেছে। হাসপাতালের কাপড়চোপড়ও ছাড়েনি। রেবেকা মনে মনে বেশ বিচলিত হ'ল। ওকে দেখে অরুণা একটু দ্রুতই এগিয়ে এল। চাপাস্বরে বলল—'টেলিগ্রাম এসেছে।'

—টেলিগ্রাম?' রেবেকার কণ্ঠস্বর উদ্বেগকাতর।

—কল্যাণ কালকেই আসছে।' টেলিগ্রামটা হাতে নিয়ে রেবেকা পড়ল। ক'লকাতার ট্যুর ক্যানসেল হ'য়ে গেছে। সোমবার রওনা হচ্ছে। তার মানে—রেবেকা মনে মনে হিসেব করল—কাল সকালেই আসছে। নৈনীতাল পৌঁছতে ন'টা সাড়ে ন'টা হবে।

—তুই গাড়ি নিয়ে নৈনীতাল যাবি তো?' অরুণা বলল।

—হ্যাঁ। তুমিও চল না।

—ডিউটি রয়েছে যে। বোনাই হ'লে হবে কি ডিউটিতে ফাঁকি দিলে চেপে ধরবে। তখনকার চেহারাই আলাদা।

—তাহ'লে তো আমাকে একাই যেতে হচ্ছে।

—তাই যাবি।'

কী এক দুর্জ্ঞেয় ব্যথা রেবেকাকে অবশ ক'রে দিল। ও হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল—'অরুণাদি' আমার ভীষণ ভয় করছে।' অরুণা ওর কাঁধে হাত রাখল। সান্ত্বনার সুরে বলল—'যা ঘটে গেছে তা'তে তোর কোন হাত ছিল না। তবে তোর ভয় কীসের?

পরদিন একটু সকাল সকালই রওনা হ'ল রেবেকা। গাড়ির গতিও খুব বাড়াল না। আকাশ পরিষ্কার নীল। মাঝে মাঝে কালো ধোঁয়ার মত মেঘ সূর্যকে ঢেকে দিচ্ছে। রোদের তেজ একটু ম্লান হচ্ছে। মেঘ স'রে যেতেই আবার উজ্জ্বল আলোর জোয়ার। সকালের হাওয়া রোদ চারপাশে উজ্জ্বল রঙে আঁকা যেন পাহাড় বন। ভালোই লাগছিল। তবু মাঝে মাঝে নানা চিন্তা ওকে অন্যমনস্ক ক'রে দিচ্ছিল। ইন্দীবরের কোন খোঁজই পাওয়া গেল না। মিঃ শর্মা কিছু একটা সন্দেহ করেছে। এখন সন্দেহটা যাচাই করারার জন্যে সময় নিচ্ছে। একটা লোক ওকে ফলো করছে। মাঝে মাঝে একটা অপরাধবোধ ওকে অস্বস্তির নাগপাশে জড়িয়ে ধরছিল। ম্লান হ'য়ে যাচ্ছিল চারপাশের উজ্জ্বল রঙে আঁকা প্রকৃতি। কল্যাণ আসছে। ওকে কি সব কথা খুলে বলবো? অরুণাদি বলেছিল আগে থেকেই কিছু বলার প্রয়োজন নেই। অন্ততঃ আগ বাড়িয়ে কিছু না বলাই ভালো। দেখা যাক না কিছুদিন অপেক্ষা ক'রে। অরুণাদি' বলছিল

—ন্যায়ত তোর কোন দোষ নেই। ইন্দীবরের মৃত্যুটা আকস্মিক—একটা এ্যাকসিডেন্ট। এ জন্যে তুই নিজেকে অপরাধী ভাবতে যাবি কেন ?

এসব ভাবতে ভাবতে রেবেকা যখন নৈনীতাল পৌঁছল তখন সাড়ে আটটা বাজে। বাসস্ট্যাণ্ডের কাছে গাড়ি পার্ক ক'রে ও কল্যানের বাসের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

কল্যাণের বাস এলো সাড়ে ন'টা নাগাদ। দূর থেকে গাড়িটা দেখে কল্যাণ হাত নাড়তে লাগল। কুলীর মাথায় মালপত্র চাপিয়ে কল্যাণ হাসি-মুখে গাড়ির কাছে এগিয়ে এল। মালপত্র গাড়িতে তোলা হ'ল। দু'জনে পাশাপাশি বসল। কল্যাণই স্টিয়ারিং এ বসল। আড়চোখে রেবেকার দিকে তাকিয়ে নিয়ে ছদ্ম গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলল—'চেহারাটা যে বেশ খারাপ ক'রে ফেলেছো। জ্বালাটা কি বিরহের না অন্য কিছুর ?' রেবেকা হেসে উঠল। কিছু বলতে গেল। কিন্তু পারল না। চমকে উঠে দেখল সেই বাদামী রঙের গাড়িটা মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে আছে। আরোহী সেই গগলস পরা ভদ্রলোক। আজকে শুধু কোটের রঙটা কালো। মাথায় টুপীটা নেই। ঝাকড়া চুল কপাল অব্দি নেমে এসেছে।

—কী হ'ল ?' এ্যাকসিলারেটারে চাপ দিয়ে কল্যান বলল।

—কই কিছু না।' রেবেকা সহজ হবার চেষ্টা করল। ব'লে উঠল—'তোমার হাল তো দেখছি বেহাল।'

—যা বলেছো—চর্‌কির মত পাক খেয়েছি ক'টা দিন। লেকচারের এডইস জোগাড় করা, তৈরী করা, পেপার্স লেখা. ডেলিভারি, নানাজনের কঠিন কঠিন সব প্রশ্নের, সমস্যার জবাব দেওয়া। এর মধ্যে আবার একটা দুষ্টু মেয়ে কাছে নেই তার কথাও ভাবতে হ'য়েছে।

—মিথ্যুক।' রেবেকা হেসে বলল। তারপর যেন চারপাশের দৃশ্য দেখছে এই ভঙ্গীতে এপাশ ওপাশ দেখে পেছনেও দেখে নিল। সেই বাদামী রঙের গাড়িটা সমান গতিতে আসছে। রেবেকা কী করবে কী বলবে বুঝে উঠতে পারল না। শুধু মাঝে মাঝে কল্যাণের দৃঢ়-চোয়াল মুখের দিকে আড় চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। কী নিশ্চিন্ত ও। যেন সবকিছু যেমনটি রেখে গিয়েছিল সব তেমনি আছে। নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব ওর সেই পুরোনো সংসারের মাঝখানে ফিরে যাচ্ছে। সব আগের মত ঠিক আছে। অথচ। যে প্রচণ্ড ঝড় এরমধ্যে সেখানে ব'য়ে গেছে তার কোন চিহ্নই কল্যাণ খুঁজে পাবে না। পাওয়ার কথাও নয়।

সামনেই রঙটিলা যাওয়ার রাস্তার মোড়। মোড়টা পেরিয়ে গিয়ে একবার চারদিক দেখার ছলে পেছনে তাকিয়ে নিল। রেবেকা। বাদামী

রঙের গাড়িটা নেই। একটা সবুজ রঙের ট্রাক পেছনে। রেবেকা চিন্তান্বিত হ'ল—কী উদ্দেশ্য ঐ ভদ্রলোকের? কেন ওকে অনুসরণ করছে? ঐ ভদ্রলোক কি সব ঘটনা জানে? না কি শুধু সন্দেহ মাত্র? কল্যাণের কথা ওর ভাবনার জাল ছিঁড়ে দিল।

—দেখ রেবেকা—কাণ্ডটা দেখ।

—কী হ'ল?' ও সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে কল্যাণের দিকে তাকাল।

শিবমন্দিরের গায়ে লাগা বট গাছটা—একদম কেটে ফেলেছে। মন্দিরটা কেমন ন্যাড়া ন্যাড়া লাগছে। জায়গাটার চার্মই নষ্ট হ'য়ে গেছে।

—হুঁ।

—হুঁ নয় রেবেকা। ইট্‌স এ ক্রাইম।' কল্যাণের কণ্ঠস্বর বেশ। উত্তেজিত।

—ক্রাইম?

—তা ছাড়া কি? প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে হত্যা করা নরহত্যার চেয়ে কম কীসে?' রেবেকা আর কোন কথা বলল না। নিজের চিন্তায় ডুবে গেল। ক্রাইম? ক্রিমিন্যাল? আমি ক্রিমিন্যাল? নরহত্যার অপরাধ। এ মার্ডারার? খুনের আসামী? খুনের বিচার? ট্রায়াল? রেবেকা আর ভাবতে পারল না। বুকটা যেন শূন্য হ'য়ে গেল। অবসাদে ভেঙে পড়তে চাইছে সমস্ত দেহটা। রেবেকা অসীম ক্লান্তিতে চোখ বুঁজল।

কতক্ষণ পরে ও জানে না। শুনল কল্যান বলছে—

—ঘুমিয়ে পড়লে নাকি? এঁ্যা?

—উঁ?' রেবেকা চোখ খুলল। কোয়ার্টারে এসে গেছে। জিনিসপত্র নামানো হচ্ছে।

ড্রইংরুমে একটা সোফায় এসে বসল রেবেকা। শরীরটা এত ক্লান্ত লাগছে কেন? কল্যাণ একটা স্যুটকেস হাতে ঘরে ঢুকল। স্যুটকেসটা টেবিলে রেখে চাবিটা দিয়ে খুলতে খুলতে বলল—'তোমার জন্যে কী এনেছি দেখ।' ঠিক তখনই ফোন বেজে উঠল। কল্যাণ সশব্দে স্যুটকেসের ডালাটা বন্ধ করে বিরক্তির স্বরে ব'লে উঠল—'আঃ' ঘরে এসে ঢুকতে না ঢুকতেই জ্বালাতন শুরু হ'ল। ব'লে দাও যে আমি এখনো ফিরি নি।'

—তাও কি হয়।' রেবেকা হাসল—'বালিতে মুখ গুঁজে কি ঝড়কে এড়ানো যায়?

—যায় না বুঝি?' কল্যাণ ফোনের দিকে এগোতে এগোতে বলল। ফোনে কী কথাবার্তা হ'ল। কল্যাণকে বেশ চিন্তিত দেখা গেল। ফোন রেখে

দিয়ে এসে বলল—'রেবেকা-আই.—বি অফিসার মিঃ শর্মা ফোন করেছিল। জরুরী ব্যাপার। আমাকে এক্ষুনি একবার বেরুতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসছি। মোচার ঘণ্টটা মেনুর মধ্যে যেন অবশ্যই থাকে। রান্নাটাও তোমার হাতে হ'তে হবে। আমি ফিরে এসে সব গোছগাছ করবো।' বেশ দ্রুত পায়েই কল্যাণ বেরিয়ে গেল।

একটু পরে অরুণা এল। সোজা হাসপাতাল থেকেই এল। লাঞ্চএর ছুটির একটু দেরী ছিল আরও। কিন্তু অরুণা ততক্ষণ ধৈর্য ধ'রে অপেক্ষা করতে পারল না। ড্রইংরুমে রেবেকাকে দেখে বলল 'তুই এখনও এখানে ব'সে আছিস্? কী ব্যাপার? রেবেকা কোন কথা বলল না। মাথা নীচু ক'রে ব'সে রইল। অরুণা—বলল—'কল্যাণ এসেই আবার গাড়ি নিয়ে ছুটল। ব্যাপারটা কী?' রেবেকা অরুণার মুখের দিকে একবার তাকাল। তারপর আবার মাথা নীচু ক'রে ব'সে রইল।

—কী হ'য়েছে বল্‌তো? অরুণা জিজ্ঞেস করল।

রেবকা নিরুত্তর।

অসহিষ্ণুস্বরে অরুণা ব'লে উঠল—রেবেকা চুপ ক'রে থাকিস্ না—বল্ কী হ'য়েছে? কল্যাণ কি সব জেনেছে?

রেবেকা মাথা নাড়ল।

—তবে?

রেবেকা হঠাৎ দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। অরুণা চারদিকে তাকিয়ে শঙ্কিতস্বরে বলল—'চল্—ওপরে চল্।'

শোবার ঘরে এসে বসল দু'জনে। একটুক্ষণ রেবেকার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে অরুণা বলল'—এবার বল্ তো কী হ'য়েছে?

—ও বোধ হয় এতক্ষণে সব জেনে গেছে।

—এ তোর বাজে ভাবনা। একথা ভাবছিস্ কেন?

—ওকে আই, বি, অফিসার মিঃ শর্মা এইমাত্র ফোনে ডেকে পাঠিয়েছে। এরপরেও বলতে চাও—'

অরুণা থামিয়ে দিয়ে বলল—'দাঁড়া—দাঁড়া—আচ্ছা মিঃ শর্মা তোকে একদফা জেরা ক'রে গেছেন না?

—হ্যাঁ।

—তুই বেফাঁস কিছু ব'লে বসিস্ নি তো?

—খুব সাবধানেই কথা বলেছি। এখন সেই কথা থেকে মিঃ শর্মা কী বুঝে নিয়েছে সেটা ওই জানে।

—হুঁ।

—আরো আছে অরুণাদি'—কালকে একটা বাদামীরঙের এ্যাম্বাসেডার গাড়ি আমাকে নৈনীতালের পথে অনুসরণ করেছে। আজকেও বাস ষ্ট্যাণ্ডে ওকে যখন আনতে গেছি দেখি সেই গাড়িটা। সেই একই লোক গাড়িটা চালাচ্ছিল। রঙটিলার মোড়ে এসে দেখি সেই গাড়িটা পেছনে নেই।

—লোকটা কি মিঃ শর্মা ?

—না। অন্য একটা লোক ! মধ্যবয়স্ক।

—হুঁ—কল্যাণ কখন ফিরবে কিছু ব'লে গেছে ?

—না—তবে তাড়াতাড়ি ফেরবার চেষ্টা করবে ব'লে গেল।

তারপরে দু'জনে আর কথা নেই। শুধু চিন্তা করা ছাড়া। কী হ'তে পারে এরপর ? মিঃ শর্মা কি কল্যানকে সব কথা বলবে ? সব কথা ? ইন্দীবরের গতিবিধি, রেবেকার সঙ্গে তার ঘুরে বেড়ানো, হৃদ্যতা। অবশেষে মৃত্যুবরণ। ঘুঘু খুনেদের মত মৃতদেহ পাচার করা। রেবেকার কোয়ার্টারে অরুণার অবস্থিতি। এই সমস্ত ঘটনাই হয় তো মিঃ শর্মা এতক্ষণে কল্যাকে বলেছে। এই ব্যাপারে কল্যাণের গাড়িই ব্যবহার করা হয়েছে। কল্যাণের অনুপস্থিতিতে তারই স্ত্রীর জড়িয়ে পড়া এখন একটা ঘটনার সঙ্গে যা সমাজে নিন্দাবাদ ছাড়া বিন্দুমাত্র সহানুভূতি পাবে না। সকলেই আঙ্গুল দেখিয়ে বলবে—ঐ যে মিসেস মিত্র—এক নিরপরাধ নিষ্পাপ যুবককে নিয়ে খেলা করেছে তারপর নিজের হাতে তাঁর মৃত্যু ঘটিয়ে সমস্ত প্রমান লোপ করবার চেষ্টা করেছে। চরিত্তিরের বালাই বলতে যার কিছু নেই। নির্মমতায় যে কসাইকেও হার মানায়। স্বামীর অসাক্ষাতে নাগর জোটাতে এবং সময় ও সুযোগ বুঝে তার ইহলীলা শেষ ক'রে দিতে যার দক্ষতা প্রশ্নাতীত। কে জানে পরকীয়া প্রেমের সেই নাটকের কোন কোন দৃশ্য নিজের ছেলের চোখের সামনেই ঘটেছে কিনা। যে এতদূর এগোতে পারে, লোকলজ্জা, বিবেক যাকে নিবৃত্ত করতে পারে নি তার পক্ষে এটাই বা অসম্ভব কি ? এসব কথা ভাবতে ভাবতে রেবেকার চোখ দু'টো জ্বালা ক'রে উঠল। ও দু'হাতে মুখ চেপে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। কান্নার বেগ চাপতে ও বালিশে মুখ গুঁজল। জানালার কাছে দাঁড়ানো অরুণা একবার সচকিত হ'য়ে ঘুরে তাকাল রেবেকার দিকে। কিছু বলতে চাইল হয় তো। কিন্তু বলল না। মুখ ফিরিয়ে আবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল।

এমন সময় বাইরে কোয়ার্টারের সুড়কি-ঢালা পথটায় গাড়ির চাকার শব্দ উঠল। গাড়ি থামল। দু'জনেই উৎকর্ণ হ'য়ে রইল। একটু পরেই কয়েকটি পুরুষ কণ্ঠস্বর এখানে ভেসে এল। কী কথাবার্তা হচ্ছিল এখান থেকে ভালো শোনা যাচ্ছিল না।

অরুণা ধীরপায়ে সিঁড়ি বারান্দার দিকে এগোল। কল্যাণকে সব স্থির মস্তিষ্কে বোঝাতে হবে। প্রমান লোপের চেষ্টার সব দায়িত্ব তো ওকেই নিতে হবে। শুধু তাই নয় প্রয়োজন হ'লে—

—কোথায় যাচ্ছো অরুণাদি'? রেবেকার ভীতসন্ত্রস্ত কণ্ঠস্বর।

—নীচে।

—না। যা ঘটবার এ ঘরেই ঘটুক। কল্যাণ তো ওপরে আসবেই। জবাবদিহি চাইবে। সে সব ব্যাপারগুলো নীচে ঐ মিঃ শর্মার সামনে—
—না—।'

—কিছু ভাবিস্‌নে' অরুণা হাসল—'আমি যাচ্ছি সব দোষ স্বীকার করতে।

—সে কি! তোমার কি দোষ?

—দোষ কারো নয়। কিন্তু একটা অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে গেছে।' একটু থেমে অরুণা বলল—' কল্যাণের মত স্বামী, সুশান্তর মত ছেলে—এদের নিয়ে তোর বড় সুখের সংসার। এই সবকিছু হারাবি তুই আমি তা কখনও হ'তে দেব না। অপরাধের সব দায়িত্ব আমি কাঁধে তুলে নেব।'

—কিন্তু ইন্দীবরের সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক—

বাধা দিয়ে অরুণা বলল—'সেইজন্যেই ঘটনাটা অন্যরকমভাবে সাজাতে হবে। আমি ভালো ক'রেই জানি কোন সুপুরুষ যুবককে আকর্ষণ করার মত সম্পদ আমার নেই। ঘটনাটা দাঁড় করাবো উল্টোভাবে। আমিই প্রেমপ্রার্থী হয়েছিলাম প্রত্যাখ্যাত হ'য়ে অপমানের প্রতিশোধ তুলতে আমি সবকিছু করেছি। হত্যা, প্রমাণলোপ সব। ঘটনাটা তখন আর বিশ্বাসযোগ্য হ'য়ে উঠতে বাধা কোথায়।

—তবু—অরুণাদি—তুমি কেন—'

ওকে বাধা দিয়ে অরুণা ব'লে উঠল তুই চুপ ক'রে থাকবি—কোন কথা বলাব না। যা বলবার আমিই বলবো।'

অরুণা চলে গেল। রেবেকা বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। উৎকণ্ঠা উদ্বেগ নিয়ে ও আর নিশ্চিন্তে ব'সে থাকতে পারল না।

একটু পরেই অরুণা ফিরে এল। ওর চোখে সীমাহীন বিস্ময়। অরুণা থর্ থর্ ক'রে কাঁপছে। অরুণার এই অবস্থা দেখে রেবেকা আশ্চর্য হ'য়ে গেল। এক অদ্ভুত বোধশূন্য দৃষ্টিতে অরুণা রেবেকার দিকে তাকিয়ে রইল। রেবেকা ছুটে এসে অরুণাকে ধরল। উৎকণ্ঠিতস্বরে ব'লে উঠল—'অরুণাদি? কী হ'য়েছে? অরুণাদি?' কথা বলতে গিয়ে অরুণার ঠোঁটদুটো থর্ থর্ ক'রে কাঁপতে লাগল। কথা বলতে পারল না।

নিঃশব্দ অঙ্গুলিসঙ্কেতে সিঁড়ি বারান্দার দিকে দেখাল। রেবেকা ঘরের বাইরে এসে সিঁড়িবারান্দায় দাঁড়াল।

ড্রইংরুমের সবগুলো জানালা খোলা হয় নি। তাই এদিক ওদিক আবছা অন্ধকার ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। টেবিলের ধারের সোফা হু'টোয় কল্যাণ আর মিঃ শর্মা মুখোমুখি বসে আছে। ওরা চিন্তিতভঙ্গীতে মৃদুস্বরে কথা বলছে। রেবেকা ভাবল— এক্ষুনি হয়তো কল্যাণ ওকে ডাকবে। জানতে চাইবে—কী ঘটেছে গত ক'টা দিন? কী করেছো তুমি? হঠাৎ এসময়েই মিঃ শর্মার নজরে পড়ল রেবেকা। বোধহয় রেবেকার উপস্থিতিটা মিঃ শর্মা সবসময়ই আশা করছিল। মিঃ শর্মা মৃদুস্বরে কল্যাণকে কী বলল। কল্যাণ উঠে দাঁড়িয়ে ঘুরে রেবেকার দিকে তাকাল। তারপর এগিয়ে এসে ওপরের সিঁড়িবারান্দার দিকে মুখ তুলে বলল—'রেবা— একটা ইম্পর্টেন্ট কেস তাই দেরী হ'য়ে যাচ্ছে। আমি এক্ষুনি আসছি।' তারপর কী চিন্তা ক'রে দক্ষিণের ছোট ঘরটার দিকে যেতে যেতে বলল —'রেকা একমিনিট দাঁড়াও তো।' ঘরটার মধ্যে গিয়ে ও কাকে যেন ডাকল। কল্যানের পেছনে পেছনে যে নতমস্তকে বেরিয়ে এল তাকে দেখে রেবেকা ভীষণ ভাবে চমকে উঠল। গলা দিয়ে একটা আর্তস্বর বেরিয়ে আসছিল। রেবেকা শরীরেব সমস্ত শক্তি দিয়ে নিজেকে সংযত করল। ইন্দীবর! হাসিমুখে রেবেকার দিকে তাকিয়ে আছে। কল্যাণ এগিয়ে এসে রেবেকাকে দেখিয়ে বলল—'দেখুন তো মিঃ শুক্লা—এঁকে চিনতে পারেন কি না?' রেবেকার মনে হ'ল ওর পায়ের নীচে যেন মাটি নেই। সমস্ত শরীরটা কেঁপে উঠল। দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতা পর্যন্ত লোপ পেয়ে গেছে। এক্ষুণি মাটিতে পড়ে যাবে। ইন্দীবর তখনও হাসি-মুখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। রেবেকার চোখের সামনে সবকিছু হুলছে—আলমারী, টেবিল, সোফা জানালা দরজা। এসময়ই রেবেকার নজরে পড়ল মিঃ শর্মা তীব্রদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। নিজেকে প্রাণ-পণে সংযত করল রেবেকা।

কল্যাণ আবার ইন্দীবরকে জিজ্ঞেস করল—'পারলেন চিনতে?' এতক্ষণে রেবেকা সরাসরি ইন্দীবরের চোখের দিকে তাকাল। কেমন একটা অদ্ভুত উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি সেই চোখে। আরও একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ইন্দীবর হতাশ ভঙ্গীতে মাথা নাড়ল। কল্যাণ বলল—'ইনি মিসেস রেবেকা মিত্র— আমার স্ত্রী—আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম। মনে পড়ছে?' ইন্দীবর একটুক্ষণ কী ভাবল—বোধহয় মনে করবার চেষ্টা করল। তারপর হেসে আবার মাথা নাড়ল। বলল—'আমার মনে পড়ছে না।

—মনে করবার চেষ্টা করুন। এই ঘরে, সঙ্গে আপনার আঙ্কল ছিলেন। আমরা কথাবার্তা বলছিলাম—আমার স্ত্রী এলেন—আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম—মনে পড়্ছে ?

—না।' ইন্দীবর হাসল।

হুঁ।' কল্যাণ হাল ছেড়ে দিল। বুঝল সত্যিই ইন্দীবরের মনে পড়ছে না।

কল্যাণ টেবিলের কাছে মি শর্মার কাছে ফিরে গেল। তু'জনে গভীর ভাবে তাদের কথাবার্তায় ডুবে গেল। ইন্দীবর ঘুরে ঘুরে ড্রইংরুমের দেয়ালের ছবি ফটো দেখতে লাগল।

বাইরে একটা গাড়ি থামার শব্দ শোনা গেল।

দরজার কলিং বেল বেজে উঠল। সকলেই উৎকর্ণ হ'ল। শুধু ইন্দীবর একটা ছবির দিকে নিবিষ্ট মনে তাকিয়ে রইল। মিঃ শর্মাই এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিল। সুশান্ত ঘরে ঢুকে ছুটতে ছুটতে কল্যাণের কাছে এল। ওর পরে একজন পুলিশ অফিসার ঢুকল। কল্যাণ তো অবাক। রেবেকাও আশ্চর্য হ'ল। হঠাৎ সুশান্ত এল কী ক'রে? কল্যাণ অবশ্য খুশী হ'ল খুব। তাড়াতাড়ি সুশান্তকে কোলে তুলে নিল। মিঃ শর্মা একটু হেসে বলল—'ডাঃ মিট্র্—হাপনার অনুমতি না নিয়ে এই কাজটা ক'রে ফেলেছি।'

—তার মানে ?

—একজন পুলিশ অফিসারকে নির্দেশ দিয়েছিলাম উনি যেন কিছুক্ষণের জন্যে হাপনার ছেলেকে এখানে নিয়ে আসার বন্দোবস্ত করেন।

হঠাৎ ?' কল্যাণ বলল।

—নাথিং সিরিয়াস। হাপনি অনেকদিন ছেলেকে দেখেন না—দেখলে হাপনার ভাল লাগবে—য়ু উইল বি ডিলাইটেড। কল্যাণ হেসে উঠল—'থ্যাঙ্ক য়ু মিঃ শর্মা। ইট্স রিয়েলি এ সারপ্রাইজ।'

দোতলার সিঁড়ি বারান্দায় রেবেকা তখন পাথরের মত দাঁড়িয়ে। মিঃ শর্মার উদ্দেশ্য বুঝতে ওর কোন অসুবিধে হ'ল না। ভয়ে আশঙ্কায় ও কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। আড়চোখে মিঃ শর্মার দিকে তাকিয়ে দেখল সে নিশ্চিন্তমনে চুরুট ধরাচ্ছে। কিন্তু চশমার ফাঁকে তার সজাগ দৃষ্টি যে রেবেকাকেই অনুসরণ করছে এটা আর কেউ না বুঝলেও রেবেকা ভালো ভাবেই বুঝল। সুশান্ত এতক্ষণ কল্যাণের আদর খেতে খেতে হঠাৎ রেবেকাকে দেখতে পেল। 'মা' 'মা' ক'রে ডাকতে ডাকতে ও সিঁড়ির দিকে ছুটল। রেবেকা সুশান্তকে 'মাম্মি' নয়—মা ডাকতেই শিখিয়েছে।

ঘুরতে গিয়ে সুশান্তর চোখ পড়ল ইন্দীবরের ওপর। ও থমকে দাঁড়াল। রেবেকা রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়িয়ে রইল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও মিঃ শর্মার দিকে চোখ পড়ল। দেখল মিঃ শর্মা তীব্র দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। রেবেকা চোখ ফেরাল। শুনল সুশান্ত বলছে—'হ্যাল্লো আর্টিস্ট?' ইন্দীবর হাসল শুধু। ওর মুখে কোন ভাবান্তর নেই। তারপরেই সুশান্ত ছুটে এল রেবেকার কাছে। রেবেকা নীচু হ'য়ে সুশান্তকে কোলে তুলে নিল। আদর করতে লাগল। তারপর একটু গলা চড়িয়ে বলল—'সুশান্ত কি এখনি চ'লে যাবে?'

—কেন বলো তো?' কল্যাণ পুলিশ অফিসারের সঙ্গে কথা বলছিল। কথা থামিয়ে বলল।

—এসেছে যখন থাক না ক'টা দিন।

—না। ওর পড়ার ক্ষতি হবে। তাছাড়া—' পুলিশ অফিসারকে দেখিয়ে কল্যাণ বলল—'ইনি সুশান্তকে তিন ঘণ্টার জন্যে নিয়ে এসেছেন।

—কিন্তু—।

—না রেকা। সামনেই তো গুড ফ্রাইডের ছুটি। তখন ও কে আনতে যাবো। এসো শান্ত।'

—সুশান্ত ঠোঁট ফোলাল। মা'র কানে কানে বলল—'আমি যাবো না।' রেবেকা হাসল—'না। বাবার কথা শুনতে হয়। যাও।' সুশান্ত অভিমান ক্ষুব্ধ ভঙ্গীতে সিঁড়ি দিয়ে রেবেকার সঙ্গে নেমে এল। কল্যাণ ওকে হাত ধ'রে দরজার দিকে নিয়ে গেল। পুলিশ অফিসারটি ততক্ষণে জীপে উঠে বসেছে। হাত বাড়িয়ে ডাকল—'কাম অন সুশান্ত।' সুশান্ত একবার কল্যাণ ও রেবেকার দিকে তাকিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠল। জীপ ছেড়ে দিল। রেবেকা আর কল্যাণ দু'জনেই হাত নাড়ল। রেবেকার মনে হ'ল যেন একটা ঝড় কেটে গেল। সুশান্ত ইন্দীবরের সঙ্গে গল্পে মেতে ওঠে নি। জু দেখার বায়না ধরে নি।

ড্রইংরুমে ফিরে রেবেকা দেখল মিঃ শর্মা ইন্দীবরের সঙ্গে কথা বলছে। রেবেকার বুঝতে অসুবিধে হ'ল না মিঃ শর্মা ইন্দীবরের কাছ থেকে কী জানতে চাইছে। ইন্দীবর বারবার মাথা নাড়তে লাগল। বোধহয় বলতে চাইছে ওর কিছুই মনে পড়ছে না।

রেবেকা আর ড্রইংরুমে দাঁড়াল না। সোজা ওপরে শোবার ঘরে চ'লে এল। অরুণা ঘরময় পায়চারী করছিল। ওকে দেখে ছুটে কাছে এল। উদ্বেগকাতস্বরে জিজ্ঞেস করল—

—কী হ'ল রে?

রেবেকা চুপ ক'রে রইল।

—বল্ না?' অরুণা অসহিষ্ণুস্বরে ব'লে উঠল—'ইন্দীবর কি সমস্ত কথা কল্যাণকে বলেছে?

—না।

—যাক বাঁচা গেল।' অরুণা এতক্ষণের দুশ্চিন্তায় উদ্বেগে যেন কেমন হ'য়ে গিয়েছিল। তারপরই একটা সংশয় ওর মনে উঁকি দিল। অস্ফুট-স্বরে বলল—'হ্যাঁ রে রেকা—ইন্দীবর হয় তো এমন কিছু বলছে না। কিন্তু দু'দিন পরে তো সব ব'লে দিতে পারে?

—বোধহয় কোনদিনই বলতে পারবে না।

—কেন?

—ইন্দীবর ওর সমস্ত পূর্বস্মৃতি হারিয়ে ফেলেছে।

—বলিস কি।

রেবেকা হাসল। বড় ম্লান দেখাল ওর হাসি।

ড্রইংরুম থেকে কথাবার্তা ভেসে আসতে লাগল। মিঃ শর্মা ও ইন্দীবর বিদায় নিচ্ছে। ওরা চলে গেলে কল্যাণ ওপরে শোবার ঘরে এল। দ্রুতহাতে গলার টাই খুলতে খুলতে বলল—'প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে—জল্‌দি।'

—রান্না হ'য়ে গেছে—তুমি চান ক'রে এসো।' রেবেকা বলল।

—চান বললে একটু কম বলা হবে। অবগাহন করতে হবে। কথা বলতে বলতে কল্যাণ বাথরুমের দিকে চলল—'কালকের ট্রেনের ধকল—রাতজাগা—।' স্নান করবার ফাঁকে একসময় চেঁচিয়ে বলল—'মোচার ঘণ্টটা হ'য়েছে তো?

চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে রেবেকা হেসে গলা চড়িয়ে বলল, 'হ্যাঁ হয়েছে।'

—তোমার হাতের রান্না?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ।

কল্যাণ মাথায় গায়ে তোয়ালে ঘষতে ঘষতে এল একটু পরেই। ও এতক্ষণ অরুণাকে লক্ষ্য করে নি। এবার অরুণা ওর কাছে এল। কল্যাণ বলল—'তারপর? তুমি এখানে? ডিউটি নেই?

—এক্ষুণি যাচ্ছি। আপনি ফিরে এসে সঙ্গে সঙ্গে বেরোলেন—তাই জানতে এলাম কী ব্যাপার?

—বাব্বা—এত কিছু তোমাদের নজরে পড়ে? মিঃ শর্মার চ্যালা হ'য়ে যাও।

—মিঃ শর্মা কে?

'ঐ যে এইমাত্র গেলেন।' আই. বি. ডিপার্টমেণ্টের জাঁদরেল অফিসার।

—হঠাৎ আই· বি· র লোক? এখানে?

—হুঁ একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছে। ওদের সঙ্গে অল্পবয়স্ক একটি যুবক ছিল—ইন্দীবর শুক্লা। রেবেকা ওকে চেনে। দিন ছয়েক আগে—ইন্দীবরকে আহত অবস্থায় একটা ভাঙা শিবমন্দিরের কাছে ঝোপজঙ্গলের মধ্যে পড়ে থাকতে দেখা যায়। সঙ্গে সঙ্গে বড় হাসপাতালে পাঠানো হয়। একটা গুলী ওর বুকের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। গুলীটা সোজা বেরোলে ও মারা পড়ত! পাঁজরার একটা হাড় সামান্য জখম হ'য়েছে। কিন্তু মুস্কিল হ'য়েছে কোথায় কী ক'রে গুলী লাগল, কে ওকে গুলী করল বা ও নিজেই আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল কিনা—এসব কিছুই ইন্দীবর বলতে পারছে না।

—কেন?' অরুণা সহজ ভঙ্গীতে জানতে চাইল।

—ঘটনার উত্তেজনাতেই হোক অথবা অন্য যে কোন কারণেই হোক ইন্দীবর তার স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। শক্ এ্যামনেশিয়া আর কি।

—ভদ্রলোক কি আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন?

—প্রথমে মিঃ শর্মার তাই মনে হ'য়েছিল—' চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে কল্যান বলল 'কিন্তু পরে তার মত পাল্টে যায়।

—কেন?' অরুণা মানসিক উত্তেজনা দমন ক'রে সহজভঙ্গীতে বলল।

—প্রথমতঃ দেখা যায় ওকে রাস্তার ওপর থেকে আহত অবস্থায় সেখানে ফেলে দেওয়া হ'য়েছে। কারণ মুখে হাতে ছড়ে যাওয়ার চিহ্ন ছিল। তার মানে খুনী ওকে মৃত ব'লে ধ'রে নিয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ ইন্দীবরের কোটের পকেটে একটা স্কেচখাতা পাওয়া গিয়েছিল।

—স্কেচ খাতা?

—হ্যাঁ, ইন্দীবর কিছুদিন আর্ট কলেজে পড়েছিল। স্কেচ আঁকার পাকা হাত ওর। এখানকার নানা স্পটএর ছবি আঁকা তাতে। একটি মেয়ের ছবিও আছে তা'তে। অবশ্য কয়েকটা প্রাথমিক টান মাত্র। তাই থেকে কাউকে সনাক্ত করা সম্ভব নয়।

—এতক্ষণে বোঝা গেল। অরুণা রহস্যময়স্বরে বলল।

—হ্যাঁ সেই ব্যাপারই—' কল্যাণও হাসল—'অন্ততঃ মিঃ শর্মা এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ।'

একসময় রেবেকা এগিয়ে এসে বলল—'খাবে এসো।'

—ও হ্যাঁ। কল্যান মাথার চুলে হাত বুলোতে বুলোতে ডাইনিং টেবিলে এসে বসল। অরুণাও পেছনে পেছনে এসে বসল। হেসে বলল—

—মেয়েটি কে?

—আরে সেটা জানতে পারলে তো সমস্যা আর সমস্যাই থাকে না।' একটু থেমে খেতে খেতে কল্যাণ বলল—'তাই ইন্দীবরের গত কয়েকদিনের গতিবিধির পাকা খবর জোগাড় করতে মিঃ শর্মা উঠে পড়ে লেগেছে। কিছু খবর তার টেবিলে জমাও পড়েছে। কিন্তু তাতে কোন থৈ পাওয়া যাচ্ছে না। এবার আমার ওপর ভার পড়েছে কোন সূত্রের সন্ধান দেওয়া যদি আমার পক্ষে সম্ভব হয়।

—তা'হলে মিঃ শর্মা আপনাকেও টিকটিকি বানিয়ে ছেড়েছে।

—উঁহু—আমার এ্যাপ্রোচটা হবে সম্পূর্ণ সাইকোলজিক্যাল। আসলে ইন্দীবরের কাকার ধরাধরিতেই এত কাণ্ড চলছে। এক মন্ত্রী তাঁর বন্ধু। সেই মন্ত্রীর নির্দেশেই তদন্ত চলছে। নইলে ব্যাপারটা নিয়ে এত হৈ চৈ হ'ত না।

—কিন্তু আপনাকে দিয়ে তদন্তের কী সুবিধে হবে? অরুণা বলল।

—হবে বৈকি। কালকেই ইন্দীবরকে নিয়ে বেরোবো সকালে। সারাদিনের প্রোগ্রাম। ও যে সব স্পটের ছবি এঁকেছে সে সব জায়গায় নিয়ে যাবো ওকে। দেখা যাক—ওর অতি নগন্য জিনিসও কিছু মনে পড়ে কি না। তাছাড়া—কেসটা ইণ্টারেস্টিং—তাই লেগে পড়লাম।' কথা শেষ ক'রে কল্যাণ খেতে লাগল। অরুণা রেবেকার দিকে তাকাল। হাতের ঘড়ী দেখে বলল—'রেবেকা—আমি ডিউটিতে যাচ্ছি।' অরুণা চলে গেল।

কল্যাণ খাচ্ছে তখনই রেবেকা বলল—'তোমার কি কালকেই ওসব ওসব কাজের ঝামেলা পড়েছে?

—হ্যাঁ—কেন বলো তো? কল্যাণ খেতে খেতে মুখ তুলল।

—না—কিছু না—ভেবেছিলাম তুমি ট্যুরে থাকবে। কাজেই কালকের দিনটা এমনিতেই যাবে।

—ব্যাপার কি বল তো?

—কিছু না।' একটু অভিমানের ভঙ্গীতে রেবেকা বলল।

—উঁহু—নিশ্চয়ই কিছু। কল্যাণ খাওয়া বন্ধ ক'রে বলল—'পরিষ্কার ক'রে বলো।'

রেবেকা একটু চুপ ক'রে থেকে বলল—'কালকে আমাদের বিয়ের দিন।'

—বলো কি। কল্যাণ খাবারের প্লেট থেকে হাত গুটিয়ে নিল। বলল—

—ঈস্, আমি একদম ভুলে গেছি। তা'হলে তো—কল্যাণ ভাবতে লাগল।

—না—তোমার কালকের কাজটা করা কর্তব্য।

—হ্যাঙ্ ইয়োর কর্তব্য। কালকে আমরা বেড়াতে যাবো।

—বেড়াতেই তো যাচ্ছো।' রেবেকা বলল।

একটু চুপ ক'রে থেকে কল্যাণ ভাবল। তারপর বলল——'আচ্ছা রেবেকা—একটা কাজ করলে হয় না। তুমিও আমার সঙ্গে চলো। বেড়ানোও হবে কর্তব্যও হবে।

—না—না—আমি আবার কোথায় যাবো?

—আমার কথার অবাধ্য হয়ো না রেবেকা।

——তুমি তোমার কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। মিছিমিছি তার মধ্যে আমি গিয়ে—

—প্রেরণা যোগাবে।' কল্যাণ হাসল।

—বাপ্‌সরে—।' রেকা হেসে ফেলল।

—আরে আমার কাজটা কি? ইন্দীবরকে মাঝে মধ্যে দু'একটা প্রশ্ন করা যাতে ও ওর চিন্তাগুলোকে গুছিয়ে আনতে পারে। তাহ'লেই ওর কিছু না কিছু মনে পড়বেই।' একটু থেমে বলল—'তোমার কোন অসুবিধে হবে না। তুমিও চলো। পরে লেক ভিউ রেস্তোর'ায় রাতের খাওয়া সেরে ফিরবো। তার আগে তোমার জন্যে একটা জমকালো শাড়ী আর একটা গোলাপের তোড়া।'

পরদিন ইন্দীবর দশটার মধ্যেই চ'লে এল। কল্যাণ আর রেবেকা তাড়াতাড়ি তৈরী হ'য়ে নিল। এই বেড়াতে যাওয়ার ব্যাপারে রেবেকার শেষ পর্যন্তও দ্বিধা ছিল। কিন্তু মনকে বাগ মানাল। কল্যাণ এত ক'রে বলেছে আর আজকের দিনটাও ওদের জীবনে একটা বিশেষ দিন। না গেলে কল্যাণ এটা ভালো চোখে দেখবে না। ও মনে আঘাত পাবে। কাজেই রেবেকা বেশ আগ্রহের সঙ্গেই যাওয়ার তোড়জোড় করল। টিফিন কেরিয়ারে লুচি মাংস নিল। পথে কোথাও মিষ্টি কিনে নেওয়া যাবে। আর দু'টো ফ্লাস্ক ভর্তি কফি নিল।

ইন্দীবরকে পেছনের সীটে বসতে বলল কল্যাণ। ওরা দু'জন সামনে বসল। কল্যাণ গাড়ি চালাতে লাগল। ওর কোলে ইন্দীবরের স্কেচ খাতাটা।

স্কেচখাতায় আঁকা ইন্দীবরের ছবিগুলো কল্যাণ আগেই দেখে নিয়েছিল। কোথায় কোথায় যাবে মনে মনে তার একটা ছকও ক'রে রেখেছিল।

ওরা প্রথমেই গেল নৈনীতাল। লেকের ধার, নৌকা ভাড়ার ঘাট। তাল্লিমল্লের ব্যস্ত পথ। লোকজন। সব জায়গাতেই গেল ওরা। প্রত্যেকটি জায়গায় থেমে থেমে কল্যাণ ইন্দীবরকে জিজ্ঞেস করতে লাগল—'দেখুন —এই স্পটের দু'টো স্কেচ আপনি এঁকেছেন। মনে পড়্‌ছে এই স্পটের কথা' ইন্দীবর কিছুক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে সে সব জায়গার দিকে তাকিয়ে মাথা

নাড়তে লাগল। 'মনে করবার চেষ্টা করুণ—' কল্যাণের চাপাচাপিতে ও একবার মুখ তুলে বলল—'ডাঃ মিত্র আমার কিছুই মনে পড়ছে না।' কল্যাণ হাল ছাড়ল না। ওখানকার অন্য একটা স্পটে নিয়ে গেল। আবার প্রশ্ন—ইন্দীবর এই জায়গাটা আগে দেখেছে কি না। ইন্দীবরের মুখে সেই একটা অসহায় হাসি আর মাথা নাড়া। কিছুই মনে পড়ছে না ওর। এতক্ষণে রেবেকা লক্ষ্য করল ইন্দীবরের চোখমুখ বেশ শুকনো। শরীরটাও খারাপ হ'য়ে গেছে। ঘোরাঘুরি ক'রে সময় বেশ কাটছিল। কিন্তু রেবেকার ভাল লাগছিল না। ও বেশ অস্বস্তি বোধ করছিল। বারবার ভাবছিল না এলেই ভালো হ'ত। কিন্তু সব দিক ভেবেই ও এসেছে। কাজে কাজেই এখন আর ওদের ছেড়ে দিয়ে একা একা চ'লে যাওয়া যায় না।

এরমধ্যে লেকএর ধারে ব'সে ওরা কফি খেয়ে নিল। পথে মিষ্টি কেনা হ'ল। এবার তারামঠের দিকে চলল।

তারামঠে যখন পৌঁছল তখন বিকেল হ'য়ে এসেছে। মন্দিরের চাতালে ব'সে একটু বিশ্রাম করল ওরা। কল্যাণ তারামঠের স্কেচটা দেখিয়ে ইন্দীবরকে সেই একই প্রশ্ন করল—এখানে আগে এসেছেন কি? ইন্দীবর মাথা নেড়ে বলল ও এখানে কখনো আসেনি।

মন্দির থেকে নেমে পাহাড়ী ঝর্ণাটার কাছে গিয়ে বসল ওরা। এতক্ষণের ঘোরাঘুরিতে খিদেও পেয়েছে বেশ। তিনজনে খাবার ভাগ ক'রে খেল। তারপর কফি খেল। এঁটো কেরিয়াবের বাটিগুলো রেবেকা ঝর্ণার জলে ধুয়ে নিয়ে এল।

এবার মন্দিরটা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল ওরা। ইন্দীবরের ব্যবহারের মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। সে যেন নতুন দেখছে সব। এমনি ভাবে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল সব।

এখন সূর্য অস্ত যেতে বেশী দেরী নেই। তিনজনে মন্দিরের চাতালে এসে দাঁড়াল। উত্তরদিকে উঁচু উঁচু পাহাড়গুলোর মাথায় পড়ন্ত রোদ। লাল আলোর বন্যা যেন। ঠিক তখনি মন্দিরের চূড়ায় বসা পায়রাগুলো আকাশে উড়ে গেল। আবার সেই সুন্দর দৃশ্যের অবতারণা করল। সূর্যের পড়ন্ত আলোয় পাখিগুলোর ডানা সোনালি হ'য়ে উঠল যেন কয়েকটা সোনার পায়রা প্রাণ পেয়েছে।

ইন্দীবর অনেকক্ষণ সেইদিকে তাকিয়ে রইল। তারপর হঠাৎ চারধারে তাকাতে লাগল! ওর চোখ পড়ল রেবেকার ওপর। কেমন এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে ও রেবেকার দিকে তাকিয়ে রইল। সেই দৃষ্টিতে গভীর বেদনার স্পর্শ। জীবনের এক পরম মূল্যবান কিছু ও যেন হারিয়ে ফেলেছে—তারই

বেদনা ওর চোখে মুখে। রেবেকা ভীত হ'ল। ও মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে রইল। কল্যাণ বলল—'তোমরা এখানেই থাকো। আমি মন্দিরের পুরুৎঠাকুরের সঙ্গে একটু কথা ব'লে আসি।'

কল্যাণ চলে গেল? রেবেকার নিজেকে বড় অসহায় মনে হ'ল। রেবেকা ইন্দীবরের কাছ থেকে দূরে রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়াল। তখনও পায়রাগুলো উড়ছে। ও সেইদিকে তাকিয়ে রইল। ইন্দীবর একটু পরেই রেবেকার কাছে এসে দাঁড়াল। শান্তস্বরে অন্যমনস্কভঙ্গীতে বলল—'আমার মনে হচ্ছে আমি এর আগে এখানে এসেছি।'

—ও। রেবেকা শুধু 'ও' শব্দটা করল।

—কেন এসেছিলাম বলুন তো?

রেবেকা অস্বস্তি বোধ করল। ইন্দীবরকে সেটা বুঝতে না দিয়ে ব'লে উঠল—'কেমন ক'রে বলি বলুন। তবে নৈনীতাল বেড়াতে এলে সকলেই এই তারা মঠে আসে।' রেবেকার কথা ইন্দীবরের কানে যাচ্ছিল না। ইন্দীবর কেমন কেমন যেন একটা স্বপ্নাবিষ্টভঙ্গীতে ব'লে যেতে লাগল—'সেদিনও এমনি বিকেল—ঐ সিঁড়িটার কাছে আমি দাঁড়িয়েছিলাম—এইখানে ঠিক যেখানে আপনি দাঁড়িয়ে আছেন সেখানে কে যেন দাঁড়িয়ে ছিল—উচ্ছসিত হ'য়ে ব'লে উঠেছিল—দেখুন—দেখুন—গোল্ডেন ডাভ্স্—আকাশের দিকে সে আঙ্গুল তুলে দেখিয়েছিল—আমি তাকালাম—দেখলাম এক অপূর্ব স্বর্গীয় দৃশ্য—পায়রাগুলো যেন সোনার—জোট বেঁধে পাক খেয়ে উড়ছে—সূর্য অস্ত গেল—পাখিগুলো নেমে এল—মঠের চূড়োয়—অন্ধকার হ'য়ে গেল চারদিক। আমার মনে পড়ছে—হঠাৎ ইন্দীবর থেমে গেল।

—তারপর? রেবেকা অস্ফুট কম্পিতস্বরে বলল। আসলে রেবেকা যাচাই ক'রে নিতে চাইছিল ইন্দীবর কতটা মনে করতে পারছে। ইন্দীবর আবার ভাবতে লাগল? তার চোখে মুখে কষ্ট বেদনাহ তাশার এক বিচিত্র ছাপ ফুটে উঠতে লাগল। হঠাৎ মাথা ঝাঁকিয়ে ব'লে উঠল—"ম্নাঃ আর মনে পড়ছে না।'

—আর কিছুই মনে পড়ছে না.' রেবেকা সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল। হঠাৎ ইন্দীবরের চোখ মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল—'হ্যাঁ হ্যাঁ—আমরা ফিরে যাচ্ছিলাম। পথে বন্যা এল।'

—বন্যা?' রেবেকা বেশ আশ্চর্য হ'ল।

—হ্যাঁ—এই উঁচু জল—আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে গেল—না—না—ঝড়-বৃষ্টি—প্রচণ্ড হাওয়া—হ্যাঁ হ্যাঁ আমার সঙ্গে কে ছিল?' ইন্দীবর থেমে গেল। কল্যাণ তখন ওদের কাছে এসেছে। পেছনে জটাধারী কপালে রক্ত চন্দনের

টিপ পড়া একজন লোক। এই মন্দিরের পুরোহিত নিশ্চয়ই। কল্যাণ ইন্দীবরকে দেখিয়ে হিন্দীতে বলল—পূজারীজী দেখিয়ে তো—এ জেন্টল-ম্যানকো আপ পহলে এঁহা দেখা ?' পূজারীঠাকুর কিছুক্ষণ ইন্দীবরের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল—।

—বহৎসে লোগ এহা আতে হ্যাঁয়—

—এ জেন্টলম্যান কুছ্ অলগ হ্যাঁয়—এ কলাকার হ্যাঁয়—তসবীর বনাতে হ্যাঁয়।' পূজারীর চোখ মুখ উজ্জ্বল হ'ল।—'হাঁ—হাঁ—ম্যায় ইনকো শায়েদ তসবীর বনাতে দেখা। এ জেন্টলম্যান মুঝসে পানি মাঙ্গথে—হাঁ ইনকো ম্যয় দেখা।

—কব ? কল্যাণ উৎসুক হ'ল।

—কুছদিন পহলে।

—ইনকে সাথ অর কৌহ যা ?

—এ তো ম্যয় বোল নহী সক্তা।

—হুঁ। আচ্ছা—আপ যা সক্তে হ্যাঁয়। নমস্তে।

পূজারী ঠাকুর সিঁড়ি বেয়ে মন্দিরে ফিরে গেল। রেবেকা একপাশে মুখ নীচু ক'রে দাঁড়িয়েছিল। ও মুখ তুলে তাকাতে পারচ্ছিল না। ঘোমটাটা ভালো ক'রে টেনে দিয়েছিল। কল্যাণ ওর এই ব্যবহারে একটু অবাক হ'ল। কিন্তু কিছু বলল না।

একটু চিন্তিত মুখে কল্যাণ বলল—'চলো ফেরা যাক। মিঃ শুক্লা—আসুন।' ইন্দীবর গভীরভাবে কিছু ভাবছিল। কল্যাণের কথায় একটু চমকে উঠল। তারপর নিঃশব্দে ওদের অনুসরণ করল।

গাড়ি চলল। কেউ কোন কথা বলল না বেশ। কিছুক্ষণ। একসময় কল্যাণ বলল—'মিঃ শুক্লা।'

—ইয়েস।' ইন্দীবর সহজভাবেই বলল।

কল্যাণ পকেট থেকে ইন্দ্রীবরের স্কেচ খাতাটা বের করে মুখ না ফিরিয়ে ওর হাতে দিল। বলল—দেখুন তো তারামঠের স্কেচটা এটাতে আছে কিনা।' ইন্দীবর আস্তে আস্তে স্কেচ খাতাটার পাতা ওল্টাতে লাগল। সুশান্তর ছবিটা দেখল। তারপর রেবেকার স্কেচএর প্রাথমিক টানগুলো। একটু থমকাল। কী ভাবল একটু ক্ষণ। তারপরের নৈনীতালের ছবিগুলো। সবশেষে তারামঠের স্কেচগুলো। তারামঠের স্কেচটা বের ক'রে কল্যাণের হাতে খাতাটা ফিরিয়ে দিল। কল্যাণ এক নজর দেখে বলল—'ঠিক স্কেচটাই বের করেছেন।' তারপর একটু থেমে বলল—'তারামঠে গিয়ে আপনার কিছু মনে পড়ল ?'

—না।' ইন্দীবর গম্ভীরস্বরে বলল। রেবেকা একটু চমকে পেছনে ইন্দীবরের দিকে তাকাল। ওর চোখে বিসময়। দেখল—ইন্দীবর চোখ বুঁজে আছে। কল্যাণ রেবেকার এই ফিরে তাকানোটা লক্ষ্য করল।

গাড়ি চলল। কখন আকাশ অন্ধকার ক'রে মেঘ জমতে শুরু করেছে ওরা কেউই লক্ষ্য করে নি। হঠাৎ আকাশ চিরে বিদ্যুৎ চমকে উঠল। ঠাণ্ডা হাওয়া ছুটে এল হা হা ক'রে। মুহূর্তে ঝড়ের তোলপাড় শুরু হ'ল। উইণ্ডস্ক্রিনের সামনে ধুলোর ঝড় আর ছেঁড়া পাতার ওড়াউড়ি শুরু হ'ল। গাড়ি সমান বেগে চলল। একটু পরেই বড় বড় ফোঁটায় শুরু হ'ল বৃষ্টি। চোখের সামনে সবকিছুই প্রায় ঝাপসা হ'য়ে এল। হেডলাইটের আলোয় সামান্য কয়েক হাত মাত্র দেখা যাচ্ছে। কল্যাণ নিপুণ হাতে গাড়ি চালাতে লাগল। গাড়ির গতি একটু কমাল। জানালার কাঁচ তুলে দেওয়া হ'য়েছে। তাই গাড়ির ভেতরটা কেমন গুমোট লাগছিল।

কিছুক্ষণ পরে বৃষ্টির বেগ অনেকটা কমে এল। বাতাসের ঝাপ্টা সমানই রইল। দূরে আবছা নজরে পড়ল রঙটিলা হাসপাতালের দেয়াল।

গাড়ি হাসপাতালের কম্পাউণ্ডে ঢুকতেই আবার জোরে বৃষ্টি এল। কোয়ার্টারের সামনে এসে গাড়ি থামাল কল্যাণ। ঝোড়ো হাওয়ার মাতামাতি চলছে বাগানের গাছগুলোর ওপর।

ড্রইংরুম অব্দি আসতে রেবেকা আর ইন্দীবর বেশ ভিজে গেল। কল্যাণ গেল গ্যারেজে গাড়ি রাখতে।

ড্রইংরুমে ঢুকে রেবেকা আলোগুলো জ্বেলে দিল। কিন্তু দাঁড়াল না। ওপরে শোবার ঘরে চলে গেল। ইন্দীবর একটা সোফায় বসল। চুপ ক'রে ব'সে জানালার কাঁচে বৃষ্টির ঝাপটা বিদ্যুতের আলোর ঝলকানি দেখতে লাগল। অতীতের অন্ধকার দিনগুলোর ওপর যেন আলো ঝল্সে উঠছে। খুব ক্ষীণভাবে মনে হচ্ছে যেন এই রাত্রি ঝড়জল, এই বিদ্যুতের ঝলকানি ও যেন কবে কোথায় দেখেছে। এ যেন অন্ধকারে ও একটা জিনিসের অস্তিত্ব আছে বুঝতে পারছে কিন্তু সেটা দেখতে পাচ্ছে না। ইন্দীবর কপালে হাত রেখে মাথা নীচু ক'রে নিজের গভীর চিন্তায় ডুবে গেল।

কল্যাণ রুমাল দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে ড্রইংরুমে ঢুকল। পরনের স্যুটটা রুমাল দিয়ে ঝেড়ে নিতে নিতে বলল—'উফ্—কী বৃষ্টিরে বাবা।' ইন্দীবর মুখ তুলে কল্যাণের দিকে তাকাল। কিন্তু সে দৃষ্টি ভাবালেশহীন। কল্যাণ একনজর ইন্দীবরকে দেখে বলল—'কী ব্যাপার মিঃ শুক্লা—একেবারে চুপচাপ যে, কী ভাবছেন? ইন্দীবর হেসে বলল—'ভাবছি—

আপনাদের খুব অসুবিধেয় ফেললাম।'

—কেন ?

—এই ঝড়বৃষ্টিতে আটকে গেলাম।

—ও। তাই বলুন। আরে মশাই—এসব ছাড়াও ভাববার মত অনেক ভালো জিনিস সংসারে আছে।

—তা আছে।

—তবে ?

—বাট আই হ্যাভ নো পাস্ট।

—কে বললে আপনার অতীত নেই ? সেই ছেলেবেলা—প্রথম চোখ মেলে পৃথিবী দেখার বিস্ময়—সেই বাধাবন্ধহারা কৈশোর—তারপর যৌবন—উদ্দাম—বাঁধভাঙা যৌবন—কী সুন্দর অতীত আপনার আমার সকলের।

—কই ? আমার তো কিছুই মনে পড়ছে না।

—চেষ্টা করুণ—সব মনে পড়্বে। শুধু একটা সূত্রের অপেক্ষামাত্র। ধরুন—জটপাকানো উলের একটা বাণ্ডিল আপনাকে দেওয়া হ'য়েছে। শুধু মুখটা পেতেই যা দেরী। যেই সেই মুখটা পেলেন আস্তে আস্তে উলের সব জট খুলে গেল।' দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইল। একসময় ইন্দীবর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—'জানেন ডঃ মিত্র—মাঝে মাঝে আমার কিছুই ভালো লাগে না। জীবনটা বড় অর্থহীন—মিনিংলেস মনে হয়।

—ওসব বাজে চিন্তা ছাড়ুন —আমাদের জীবন অনেক অর্থময়।' একটু থেমে কল্যাণ বলল—'ভালো কথা—আপনার গান শুনতে ভালো লাগে ?

—গান আমি ভালোবাসি।

—রবীন্দ্রনাথের গান ?

—অব কোর্স।

—তাহ'লে রবীন্দ্রনাথের একটা বর্ষার গান শুনুন।' কল্যাণ গলা চড়িয়ে ডাকল—'রেকা ?' রেবেকা সিঁড়ি বারান্দায় এসে দাঁড়াল। কল্যাণ বলল—'টেপটা দিয়ে যাও তো।'

—ওখানে আলমারীতেই আছে।

কল্যাণ আলমারীর ওপরের তাক থেকে টেপটা নামাল। টেবিলের ওপর রেখে বলল—'দাঁড়ান—আলোগুলো নিভিয়ে দি।' আলো নেভাতে সমস্ত ঘর অন্ধকার হ'য়ে গেল। শুধু বাইরের বিদ্যুতের আলোর ঝলকানিতে হঠাৎ হঠাৎ ঘরটা মুহূর্তের জন্যে আলোকিত হ'তে লাগল।

কল্যাণ টেপ চালিয়ে দিল। সুরেলা নারীকণ্ঠে গান শোনা গেল—"যে রাতে মোর দুয়ারগুলি—ভাঙল ঝড়ে"—। গান চলল। দু'জনেই অন্ধকারে

চুপ ক'রে ব'সে গানটা শুনতে লাগল। কী এক অনির্দেশ্য বেদনায় ইন্দীবরের মন আপ্লুত হ'ল। বুকের মাঝখান থেকে উঠে এল একটা গভীর দুঃখ। ইন্দীবরের চোখে জল এল। ও তাড়াতাড়ি চোখদু'টো রুমাল দিয়ে মুছে নিল।

গান শেষ হ'ল। কল্যাণ টেপটা বন্ধ করল। দু'জনেই চুপ ক'রে ব'সে রইল কিছুক্ষণ। বোধহয় কেউ কোন কথা বলতে পারছিল না। একসময় কল্যাণ বলল—'জানেন মিঃ শুক্লা—গানটা আমার স্ত্রী গেয়েছেন।

—ইজ্ ইট ?' ইন্দীবর আশ্চর্য হ'য়ে বলে উঠল।

—ইয়েস।

—মিসেস মিত্র—মানে—এত সুন্দর ভয়েস—সো চার্মিং মানে—'ইন্দীবর আর কিছু বলতে পারল না।

কল্যাণ ঘরের কয়েকটা আলো জ্বেলে দিল। জানালার একটা ক'রে পাল্লা খুলে দিল। বৃষ্টির ঝাপটা আর ঠাণ্ডা হাওয়া ঘরে ঢুকল। কল্যাণ জানালার বাইরে তাকিয়ে বলল—'মিঃ শুক্লা, বৃষ্টি কমে নি। আসুন—তাস খেলা যাক। সময় কাটাতে হবে তো।

—কিন্তু—মানে—আমি তো তাস খেলা জানি না।

—মুস্কিলে ফেললেন। তাহ'লে কী খেলা যায়। লুডো ? ন্নাঃ—' কল্যাণ ঘরের চারদিকে তাকাতে লাগল। হঠাৎ দেখল এক কোনায় এ্যাকোরিয়ামের পাশে একটা ক্যারাম বোর্ড কাত ক'রে রাখা। একটু আশ্চর্যই হ'ল কল্যাণ। বাচ্চা ছেলেদের ক্যারাম বোর্ড কে আনল এখানে ? বোর্ডটা উল্টে দেখল—একেবারে নতুন। হয়তো রেবেকাই সুশান্তর জন্যে কিনে এনেছে। ও বোর্ডটা আর ঘুঁটির বাক্সটা নিয়ে টেবিলের কাছে এল। বলল—'আসুন—ক্যারামই খেলা যাক।' টেবিলে বোর্ডটা পাতা হ'ল। দু'জনে সোফা টেনে নিয়ে এগিয়ে বসল। কল্যাণ ঘুঁটিগুলো বোর্ডে ঢালল। তারপর সাজাতে লাগল। সাজাতে গিয়ে দেখা গেল রেডটা নেই। বোর্ডের চারপাশ, বোর্ডের পকেট, ঘুঁটি রাখার বাক্সটা—সবই খুঁজল—কিন্তু রেডটা পেল না। কল্যাণ বেশ বিরক্ত হ'ল। নতুন বোর্ড অথচ লাল ঘুঁটিটাই নেই। ও গলা চড়িয়ে ডাকল—'রেকা-রেকা—।'

—আসছি।' রেবেকা ওপরের সিঁড়িবারান্দায় এসে দাঁড়াল। দেখল টেবিলে ক্যারাম বোর্ডটা পাতা। দু'জনে মুখোমুখি বসেছে। কল্যাণ রেবেকার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল—'লাল ঘুঁটিটা কোথায় বলো তো ? খুঁজে পাচ্ছি না।' রেবেকা স্পষ্ট চমকে উঠল। মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল। সহজগলায় বলল—'বলতে পারছি না তো। বাক্সটার মধ্যে দেখেছো ?

—উঁহু—নেই। কী ক'রে হারিয়েছে বোধহয়। যাকগে—একস্ট্রা ঘুঁটিতে চালিয়ে নেব। স্ট্রাইক করতে করতে কল্যাণ বলল—কে এনেছে বোর্ডটা ?

—শান্তর জন্যে আমি কিনে এনেছি।

—তাই বল।' কল্যাণ ইন্দীবরের দিকে তাকাল—'নাউ-ইয়োর টার্ন।

খেলা চলল। নিস্তব্ধ ঘরটায় শুধু ক্যারামের ঘুঁটির ঠুক্‌ঠাক্ শব্দ। ইন্দীবরের চাইতে কল্যাণের মারের হাত অনেক পরিষ্কার।

খেলা বেশ জমে উঠল। একটা নিলগেম খেল ইন্দীবর। বাইরে তখনও বৃষ্টি চলেছে। তবে বৃষ্টির জোরটা কম। ঝোড়ো বাতাস থেমে গেছে। দ্বিতীয় গেম শুরু হবে। কল্যাণ দু'হাতের তালু দু'টো ঘষতে ঘষতে বলল—'ন্নাঃ। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। হাত অসাড় হ'য়ে আসছে।

—আপনার শীত করছে না ?

—তা একটু করছে। ইন্দীবর বলল।

—দাঁড়ান—শীত তাড়াবার ওষুধ আছে আমার কাছে। কল্যাণ গলা চড়িয়ে ডাকল—'রেকা—রেকা ?' রেবেকা সাড়া দিল। ও সিঁড়ি বারান্দায় এসে দাঁড়াতে কল্যাণ বলল—'দু চামচ করে ব্রাণ্ডি গরম দুধে মিশিয়ে আনো।—দু'টো ক'রো—মিঃ শুক্লাও খাবেন।

—উনি কি গরম দুধের সঙ্গে খাবেন ?

ইন্দীবর বলল—'আমাকেও তাই দিন।' রেবেকা চলে গেল।

খেলা চলল। কিছুক্ষণ পরে রেবেকা দু'গ্লাশ ব্র্যাণ্ডি মেশানো দুধ নিয়ে এলো। কল্যানের তখন মুখ তোলার অবকাশ নেই। এক দানে দুটো ঘুঁটি ফেলে তৃতীয় ঘুঁটিটা তাক করছে। রেবেকা দাঁড়িয়ে রইল। অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বোর্ডের দিকে। কল্যাণের ঘুঁটিটা লক্ষ্য ভ্রষ্ট হ'ল। কল্যাণ একটা হতাশাব্যঞ্জক শব্দ করে হাত বাড়াল। রেবেকা একটা গ্লাশ কল্যাণের হাতে দিল। অন্য গ্লাশটা ইন্দীবরের দিকে বাড়িয়ে ধরল। ইন্দীবর গ্লাশটা নিল। চুমুক দিয়ে স্ট্রাইকারে আঙুল লাগাল। ওর আনাড়ি হাতে ঘুঁটি পড়ল না। এবার কল্যানের দান। রেবেকা সিঁড়ির দিকে এগোল। ঠিক তখনই ইন্দীবরের সমস্ত শরীরটা কেঁপে উঠল। এতক্ষণে মনের মধ্যে জমে ওঠা অন্ধকারটা কেটে গেল। একটা মুখের আদল। গ্লাশটা বাড়িয়ে ধ'রে আছে। মুখের আদল স্পষ্ট হ'ল। আরো স্পষ্ট। কী সুন্দর চোখ দুটির গভীর দৃষ্টি। ইন্দীবর শরীরে মনে একটা ঝাঁকুনি খেয়ে চমকে উঠল—এই মহিলা। হ্যাঁ মিসেস মিত্র—রেবেকা মিত্র। রেবেকা ঠিক তখনই দোতলার সিঁড়ি বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে নীচের দিকে তাকাল। দেখল—ইন্দীবর একদৃষ্টিতে ওর দিকে

তাকিয়ে আছে। এক মুহূর্ত। ইন্দীবর বোর্ডের দিকে দৃষ্টি ফেরাল। ঘরের চারদিকে তাকাল। তারপর আবার রেবেকার দিকে তাকাল। কী অদ্ভুত সেই চোখের দৃষ্টি! রেবেকা সহ্য করতে পারল না। ও দ্রুত পায়ে ঘরের মধ্যে চলে গেল। কল্যাণ এতক্ষণ ঘুঁটি মারা নিয়ে ব্যস্ত ছিল। এবার ইন্দীবরের দান। স'রে আসতে আসতে রেবেকা শুনতে পেল কল্যাণ বলছে—'কী হ'ল মিঃ শুক্লা? আপনার তো কালোঘুটি—সাদা ঘুঁটি মারছেন কেন?

ইন্দীবর কোন কথা বলল না। ম্লান হাসল শুধু। তারপর উঠে দাঁড়াল।

—সে কি—উঠছেন নাকি?' কল্যাণ একটু আশ্চর্য হ'ল।

—হ্যাঁ।' ইন্দীবর মৃদুস্বরে বলল। তারপর দরজার দিকে হাঁটতে শুরু করল।

—এখনি যাবেন না। বৃষ্টি কমে নি। মিঃ শুক্লা?' কল্যাণ ব'লে উঠল। কিন্তু ইন্দীবর দাঁড়াল না। কোন কথাও বলল না। রেবেকাও তখন সিঁড়ি বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। ইন্দীবর দরজা দিয়ে বেরিয়ে বাইরে চ'লে এল। গেট পেরিয়ে হাঁটতে লাগল। অন্ধকারে বৃষ্টিতে ও ঢাকা পড়ে গেল। বাইরে তখনো বেশ জোরে বৃষ্টি পড়ছে। ইন্দীবরের এভাবে চ'লে যাওয়াটা কল্যাণের কাছে বেশ অদ্ভুত লাগল। ও হয় তো জোর করতে পারত। কিন্তু ইন্দীবরের ভাবভঙ্গী দেখে ও বুঝল কোনো-ভাবেই ওকে আটকানো যাবে না। কাজেই সে চেষ্টা করল না।

ইন্দীবর চলে গেলে কল্যাণ মুখ ফিরিয়ে সিঁড়ি বারন্দার দিকে তাকাল। দেখল—রেবেকা অনড় পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। ওর সঙ্গে চোখাচোখি হ'তে রেবেকা ঘরের ভেতর চ'লে যাবে ব'লে পা বাড়াল। কল্যাণ ডাকল—'রেকা দাঁড়াও।' রেবেকা দাঁড়িয়ে পড়ল। কল্যাণ এসে ওকে বুকে টেনে নিল। রেবেকা শরীরের সমস্ত ভর ছেড়ে দিল। কল্যাণ ওর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলল—'বৃষ্টি এসে সব প্রোগ্রাম আপসেট ক'রে দিল। তা হোক—তোমার জন্যে কিছু জিনিস এনেছি। ও গুলোই নাও। রাগ ক'রো না।' রেবেকা কল্যাণের বুকে মুখ ঘষতে লাগল।

পরের দিন। কল্যাণ হাসপাতালে সকালের রাউণ্ড শেষ করল। তারপর বেলা দশটা নাগাদ রেবেকাকে নিয়ে নৈনীতাল এল। কিছু দরকারী জিনিসপত্র কেনা কাটা ছিল। লণ্ড্রী থেকে স্যুট শাড়ি এসব ছাড়াতে হবে।

কেনাকেটা শেষ হ'ল। এবার ওরা লেক ভিউ রেস্তোরায় এল।

মোটামুটি ফাঁকা জায়গা দেখে বসল দু'জনে। কফির অর্ডার দিল। রেবেকা খুব কম কথা বলছে এটা কল্যাণ লক্ষ্য করল। কফি খেতে খেতে একসময় বলল—'তোমার ভালো লাগছে না?' রেবেকা এক মুহূর্ত কল্যাণের মুখের দিকে তাকাল। তারপর ব'লে উঠল—'লাগছে বৈকি। সারাদিন এমনি ঘুরে বেড়াতে পারলে আরো ভালো লাগত। কল্যাণ হাসল। কোন কথা বলল না।

ইস্টার্ন ডাইং এ্যাণ্ড ক্লিনিং—দোকানের নাম। অভিজাত দোকান। বাজারের ভীড় ছাড়িয়ে একটু বাইরের দিকে দোকানটা। দোকানটায় এ সময় ভীড় কমই দেখা গেল।

রেবেকা গাড়িতে রইল। কল্যাণ দোকানে ঢুকল। কল্যাণ বেশ পরিচিত এখানে। দোকানের মালিক হরি সিং কল্যাণকে দেখে নমস্কার করল। ভাঙা ভাঙা বাংলায় বলল—আসুন-ডাক্‌দার সাব।' কল্যাণ নমস্কারের উত্তরে একটু মাথা নুইয়ে পার্স বের ক'রে রসিদ খুঁজতে লাগল। ঠিক তখনই একজন কর্মচারী একটা স্যুটের প্যাকেট টেবিলে রেখে গেল। হরি সিং রসিদের নাম্বার মিলিয়ে বলল—'আইয়ে মিঃ শুক্লা—আপকা স্যুট।' মিঃ শুক্লা নামটা কানে যেতেই কল্যাণ আশ্চর্য হ'য়ে চারপাশে তাকাল। দেখল ইন্দীবর হাত বাড়িয়ে স্যুটের প্যাকেটটা নিচ্ছে। চোখে চোখ পড়তে ইন্দীবর মৃদু হেসে নমস্কার করল। স্যুটের প্যাকেটটা হাতে নিয়ে এগিয়ে এল। কল্যাণ হেসে বলল—'কেমন আছেন?

—ভাল। আজ রাতেই আমি গোয়ালিয়র ফিরে যাচ্ছি।

—তার মানে?' কল্যাণ বেশ আশ্চর্য হ'ল।

—আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ।

—মানে–আপনার—

—ইয়েস ডঃ মিত্র—আমার অতীতের স্মৃতি ফিরে পেয়েছি। সব মনে পড়েছে আমার—এভ্‌রি মিনিউট ডিটেলস্‌।

কল্যাণ একটু চুপ ক'রে থেকে বলল—'মিঃ শর্মা জানেন?

—ইয়েস। উনিই আমাকে চলে যেতে বলেছেন।

—ওয়েল—' কল্যাণ হাত বাড়াল। করমর্দন করল দু'জনে। কল্যাণ বলল—'উইশ্‌ য়ু গুডলাক।' ইন্দীবর দোকান থেকে বেরিয়ে গেল।

কল্যাণ পার্স থেকে রসিদটা বের ক'রে হরি সিংকে দিল। একজন কর্মচারী রসিদটা নিয়ে জিনিসগুলো আনতে গেল। ঠিক তখনই আর একজন কর্মচারী তাড়াতাড়ি এসে হরি সিংকে বলল—'ক্যায়া মিঃ শুক্লানে উনকা স্যুট ডেলিভারী লে গিয়া।

—হাঁ—আভি গিয়া। লেকিন মামলা কেয়া হ্যায়?' হরি সিং বলল।

—উনকো কোটকা পাকিটমে এ চিজ্ থা।' ব'লে কর্মচারীটি ক্যারামের একটা নতুন লাল ঘুটি হরি সিং এর হাতে দিল। হরি সিং ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগল। কল্যাণের সামনেই এসব ঘটছিল। ওরও চোখ পড়ল লাল ঘুটিটার ওপর। কল্যাণ যেন একটা ধাক্কা খেয়ে চমকে উঠল। এই এই নতুন লাল ঘুঁটিটা ইন্দীবরের কোটের পকেটে এল কী ক'রে? মুহূর্তে একটা আলোর ঝলকানিতে কতকগুলো ঘটনা উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। ইন্দীবরকে দেখে রেবেকার চমকে ওঠা, তারামঠে ওদের ঘনিষ্ঠ হ'য়ে কথা বলা গাড়িতে কথার ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ হঠাৎ রেবেকার পিছু ফিরে ইন্দীবরকে দেখা, স্কেচ খাতায় সুশান্তর স্কেচ, একটি অসমাপ্ত নারীমুখ, সব শেষে নতুন ক্যারামের লাল ঘুঁটিটা না পাওয়া। সেটা পাওয়া গেল ইন্দীবরের কোটের পকেটে। অন্যমনস্ক মনটা নাড়া খেল যখন শুনল হরি সিং বলছে—'এ বাচ্চোকা খেল নেকা চীজ হ্যায়—আনমোল চীজ থোরিই হ্যায়—ফেক্ দেও।' কল্যাণ রাস্তার দিকে তাকাল। দেখল ইন্দীবর গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে রেবেকার সঙ্গে কথা বলছে। রেবেকাকে দেখা যাচ্ছে না। কারণ ইন্দীবর ওকে আড়াল ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। কল্যাণ হরি সিং এর দিকে ফিরল ওটা আমাকে দিন।' কল্যাণ বলল।

—'খুশীসে লিজিয়ে।' হরি সিং হেসে ঘুঁটিটা কল্যাণের হাতে দিল। ও ঘুঁটিটা পকেটে পুরে নিল। ওর জিনিসগুলো ততক্ষণে এসে গেছে। কল্যাণ জিনিসগুলো হিসেব করবে কি—ও তখন কোন কথা গুছিয়ে ভাবতেই পারছে না। দাম চুকিয়ে গাড়ির কাছে যখন ফিরে এল তখন ইন্দীবর চ'লে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছে। কল্যাণ ওকে বলতে শুনল—'নমস্তে।' ইন্দীবর অলস পায়ে হেঁটে চলল।

কল্যাণ আস্তে আস্তে গাড়িতে উঠল। নিজেকে বড় ক্লান্ত লাগছে। রেবেকা প্যাকেটগুলো গাড়ির পেছনের সীটে রাখল। স্টিয়ারিং ধ'রে কল্যাণ একটুক্ষণ ব'সে রইল। গাড়ি স্টার্ট দিল না। রেবেকা ব'লে উঠল—'কী হ'ল?' কল্যাণ কোন কথা না ব'লে গাড়িতে স্টার্ট দিল। এ্যাকসিলারেটরে চাপ দিয়ে বলল—'শুক্লা কী বলছিল?

—কিছু না।

—তবু?

—এই—ও ভালো হ'য়ে গেছে—আজ রাতে গোয়ালিয়র চলে যাচ্ছে—এ সব।

—আর কিছু না?

—আবার কী বলবে ? রেবেকা অবাক হবার ভঙ্গী করল।

গাড়ি চলল। যেন অভ্যাসবশেই কল্যাণ গাড়ি চালাতে লাগল। ভালো লাগছিল না। ইচ্ছে করছিল চুপচাপ ব'সে ভাবতে। কিন্তু—। কল্যাণ সব ভাবনা ভোলবার জন্যে গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল। মসৃণ রাস্তা। ছোট ছোট চড়াই উৎরাই পেরিয়ে গাড়ি চলল।

এক সময় কল্যাণ ডাকল—'রেবেকা ?' কল্যাণের কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যা শুনে রেবেকা সচকিত হ'ল। তার ওপর কল্যাণ ওকে কখনও পুরো নাম ধ'রে ডাকে না। এখন ডাকল কেন ? রেবেকা ওর মুখের দিকে তাকাল।

—'হাত পাতো।' কল্যাণ বলল। রেবেকা হেসে ওর সামনে হাত পাতল। কল্যাণ পকেট থেকে লাল ঘুঁটিটা বের ক'রে ওর হাতে দিল।

রেবেকা এক মুহূর্ত ঘুঁটিটার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠল। গত বেশ ক'দিন ধ'রে ও নিজেকে সংযত রেখেছে। এই ক'দিনের দুশ্চিন্তা উদ্বেগ ওকে তাড়া ক'রে ফিরছে। আর নিজেকে সংযত করতে পারল না। রেবেকা কাঁদতে লাগল। কল্যাণ কোণ কথা বলল না। সামনের দিকে চোখ রেখে গাড়ি চালাতে লাগল।

একটু পরে রেবেকা কিছুটা শান্ত হ'ল। আঁচলে চোখ মুছে বাইরের দিকে তাকাল। বেশ আশ্চর্য হ'ল। কল্যাণ এ কোথায় ওকে নিয়ে চলেছে ? এতো রঙটিলা যাওয়ার পথ হয়। তবে ? রেবেকা সপ্রশ্ন-দৃষ্টিতে কল্যাণের দিকে তাকাল। কল্যাণ ওর দিকে তাকাল না। দৃষ্টি সামনের রাস্তার দিকে রেখে মৃদুস্বরে বলল—'শান্তকে দেখতে যাচ্ছি।' একটু থেমে একই সুরে বলল -'রেকা—আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

রেবেকা আর সহ্য করতে পারল না। আবার ওর চোখ ফেটে জল এল। ও দু'হাতে কল্যাণের গলা জড়িয়ে ওর কাঁধে মুখ রাখল। তারপর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। কল্যাণ বাঁ হাতে রেবেকার মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে বলল—'এই—কী হচ্ছে—আমাকে কি গাড়ি চালাতে দেবে না ?'

রেবেকা কোন কথা বলল না। ওর কান্না আরো বেড়ে গেল। অশ্রুবিকৃতস্বরে বলল—'সব বলবো তোমাকে'—

তারপর—আর বলতে পারল না। দু'হাতে মুখ ঢাকল।

চড়াই উৎরাইয়ের পথ চলেছে। দূরে-দূরে পাহাড়ের অতন্দ্র প্রহরা। মাথার ওপরে আকাশটা একটু অস্বচ্ছ। রোদের তেজ কম। একটা ছোট চড়াই পেরোতেই দূরে দেখা গেল ভোয়ালির বাড়িঘর। গাড়ি চলল।

অপরিচিতের অন্তর্ধান

—শংকর

যাঁর কথা লিখতে বসেছি, তাঁকে আপনারা কেউ চেনেন না। তিনি খ্যাতিমান নন, স্ব, বা ছদ্ম কোনো নামেও তিনি ধন্য নন। তবু তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেছি বলে নিজেকে ধন্য মনে হয়। আর অবাক হয়ে ভাবি, মানুষের ইতিহাসে এমন কত অসংখ্য 'সামান্য' জনের একটুও স্থান হয়নি।

তাঁর কথাই লিখবো আজ! সম্পর্কটা যদিও ব্যক্তিগত, তবুও সাধারণে৷ তাঁর কথা প্রকাশ না করে মনকে বোধহয় কিছুতেই শান্ত করতে পারবো না। অতীতের প্রতি অহেতুক দুর্বলতা নাকি সুস্থ সবল চরিত্রের লক্ষণ নয়। অন্ততঃ আধুনিক পণ্ডিতরা তাই বলেছেন। কিন্তু আমি সব জেনেও নিজেকে সংশোধন করতে পারি না। এখন দিনের শেষে প্রেম ও প্রীতি-পিয়াসী প্রৌঢ় মনটা ঘাড় ফিরিয়ে সেই ফেলে আসা সোনালী প্রভাতের দিকে তাকিয়ে থাকতে ভালবাসে। আর যখনই জীবনের সেই ভোরবেলায় ফিরে যাই তখনই কানাইদা'র কথা মনে পড়ে যায়।

সেদিন বিকেলে খবর পাইনি ; কাজকর্ম সেরে বিকেলবেলায় বাড়ি ফেরবার পথে বাসের মধ্যেই শুনলাম, কানাইদা নেই। সেইদিন ভোরে আমাদের এই অখ্যাত শহরের সবাই, যখন ঘুমে অচেতন। তখন বিবেকানন্দ ইস্কুলকে, কাসুন্দেকে, আশ্রমকে এবং আমাদের সবাইকে ফাঁকি দিয়ে জলের পোকা চুপি-চুপি আবার জলে ফিরে গিয়েছে।

বাস থেকে নেমে সোজা ইস্কুলে চলে গিয়েছিলাম। এই ইস্কুলই আমার অন্ধকার-জীবনে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বেলে দিয়েছে ; তারপর একদিন আমাকে চাকরি দিয়ে ক্ষুধার অন্ন জুগিয়েছে। খুরুট রোডের বিবেকানন্দ ইস্কুলে একদা মাস্টারি লাভের একমাত্র কারণ যে, আমার বাজেট-সংকট সম্বন্ধে আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রধান শিক্ষক সুধাংশু ভট্টাচার্য ওরফে হাঁদ্দার অবগতি, তা আমার প্রথম রচনা 'কত অজানারে'র প্রথম পাতায় স্বীকার করেছি। যা কোনদিন দেখা যায়নি, তা এবার দেখলাম। ইস্কুলের দরজা-জানালা সব বন্ধ। অন্যদিন এই সময় বড়রাস্তার উপরে অফিস ঘরটায় আলো জ্বলে। দোতলার কয়েকটা ঘরে যে কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানির বিদ্যুৎ ব্যয়িত হচ্ছে, তা রাস্তা থেকেই বোঝা যায়। এখন

কিন্তু সব অন্ধকার যেন কিছুক্ষণের জন্যে মেন-সুইচ ফিউজ হয়ে গিয়ে সমস্ত বাড়িটাকে তরল অন্ধকারের বিশাল গামলার মধ্যে ডুবিয়ে রাখা হয়েছে।

তবুও এগিয়ে যেতে পারিনি, কিছুক্ষণের জন্যে কানাইদার বহু স্মৃতি-জড়িত বাড়িটার দিকে চুপচাপ তাকিয়েছিলাম। এবার কাসুন্দের দিকে এগিয়ে চললাম। ওইখানেই সবার হেড্ মাস্টারমশায় এবং আমাদের মতো কয়েকজনের হাঁদ্দার বাড়ি। হেড মাস্টারমশায়ের উপর সহজবোধ্য কারণে বীতশ্রদ্ধ ছাত্রের দল এইপথ দিয়ে যাবার সময় বলতো, 'বাঘের খাঁচা'। আর রসিকজনেরা বলতো, মর্ডান টোল—অর্থাৎ স্থানীয় অনেক রসিকজনের প্রাত্যহিক ও সান্ধ্য আড্ডার কেন্দ্রস্থল। কাসুন্দে রোডের এই দীর্ঘ ও বহু দিনের অবহেলায় মলিন বাড়িটা সম্বন্ধে একদিন হয়তো আমাকে অনেক কথা লিখতে হবে; হয়তো একটা সুবিশাল গ্রন্থের মাধ্যমেই এই আশ্চর্য বাড়িটার উদ্দেশ্যে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাতে হবে। কিন্তু আজ সে-সব কথা নয়। এই বাড়িতেই সকাল-বিকেল দু' বেলায় কানাইদার চা বরাদ্দ ছিল। এতো দীর্ঘ সময় কানাইদা এখানে থাকতেন, সময়ে-অসময়ে তাঁকে এতোবার বাইরের ঘরের নীচু তক্তাপোষের উপর বসে থাকতে দেখা যেতো যে, বাড়িটাকে অনেকেই ভুল করে কানাইদার বাড়ি ভাবতো। বাড়িটা আজ নিঃঝুম। ঠিক যেন একটা পোড়োবাড়ি। অনেকদিন আগে এই বাড়ির সবাই যেন একসঙ্গে কোন দৈব-দুর্বিপাকে হঠাৎ উধাও হয়ে গিয়েছিল, তারপর কেউ যেন সাহস করে এর ত্রিসীমানায় আসতে সাহস করেনি।

না! ভুল করেছি আমি। ভেজানো জানালার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে মনে হলো, কে যেন ভেতরে বসে রয়েছে। হ্যাঁ, এই শীতের আমেজের মধ্যেও তিনি যেন আস্তে-আস্তে হাতের পাখাটা ঘোরাচ্ছেন। এই তক্তাপোষটার উপর কানাইদা রোজ এসে বসতেন, আমাদের সঙ্গে গল্প করতেন, দরকার হলে গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে বলতেন, তোরা সকলে সবজান্তা হয়ে বসে আছিস! এই যা বললুম, সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত চলে যাবে। সুপ্রীম কোর্ট, মাস্ট পিটিসন সেরে অন্যকথা!'

সেই তক্তাপোষটারই এক-কোণে হাঁদ্দা নিশ্চল পাথরের মতো বসে আছেন—হাতের পাখাটা মাঝে-মাঝে কোনো ভৌতিক শক্তির বলে যেন নড়ে উঠছে। হাঁদ্দার সত্যিই যে কোনোদিকে খেয়াল নেই, তা তাকিয়েই বুঝলাম। প্রায় ডজনখানেক পরিপুষ্ট মশা তাঁর নিরাভরণ ঊর্ধ্বাঙ্গের উপর

পরম নিশ্চিন্তে বসে রক্ত শোষণ করছে। পিঠে এবং কানে বসতেও তাদের দ্বিধা হয়নি। তবুও হাঁন্দা নিশ্চল, মশা তাড়াবার কোন আগ্রহ নেই। কয়েকটা এঁটো চায়ের কাপ সামনের টেবিলটার ওপরে ছড়ানো পড়ে রয়েছে। হাঁন্দার সামনে একটা চা বোঝাই কাপও ঠাণ্ডা হয়ে রয়েছে। উপরে পুরু সর ভাসছে।

ঘরের মধ্যে ঢুকে বুঝলাম—:পোড়োবাড়ি নয়, আরও লোক রয়েছে। হাঁন্দার প্রাত্যহিক আসরের অন্যতম আজীবন সভ্য প্যাটার সনদা কানে-কানে বললেন—"কানাই-এর কাপ।" ভুলে চা নিয়ে ফেলেছেন হাঁন্দা-- অভ্যেসটা তো আজকের নয়। কিন্তু ঐ চায়ের ভাগ নিতে এবং চায়ের পেয়ালায় তুফান তুলতে কানাই আর কোনোদিনই আসবে না।

কোনকথা বলিনি আমি। নিঃশব্দে পথে বেরিয়ে পড়েছি। দেখলাম, প্যাটারসনদা অর্থাৎ আমাদের রবীন্দ্রনাথ পাত্রদা-ও আমার পেছন-পেছন আসছেন। একটু দাঁড়িয়ে পড়লাম, প্যাটারসনদা আমার পাশে এসে পড়লেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রমের দিকে চলেছি আমরা। কি কোনো কথা হলো না। প্যাটারসনদা ও আমি যেন মূখ-বধির ইস্কুলের ছু'টি ছাত্র।

লোকে বলে, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম। আমরা প্রথম ছু'টো শব্দ ছেড়ে দিয়ে বলি, আশ্রম। এই আশ্রমেরই কয়েকজন চিরকুমার উৎসাহী সভ্য রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে একদা আমাদের বিবেকানন্দ ইনষ্টিটিউশনের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আশ্রম বলতে মনের মধ্যে যে ছবিটা সাধারণত ভেসে ওঠে, আমাদের আশ্রমের পরিবেশ অনেকটা তাই। অহেতুক উত্তেজনা নেই সেখানে। সন্ধ্যাপূজা এবং আরতির পর, পরিবেশটা আরও শান্ত ও স্তব্ধ হয়ে ওঠে। নস্করপাড়া লেনের আশ্রমকে আজ আরও নিস্তব্ধ মনে হলো। আলোগুলোও জ্বলছে না আজ। দূরের রাস্তা থেকে ল্যাম্পপোস্টের আলো এসে পড়েছে, তার মধ্যেই অস্পষ্টভাবে দেখলাম, আশ্রমবাসীদের কয়েকজন গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে, শূন্য নয়নে যেন আশ্রমের পুকুরের দিকে তাকিয়ে আছেন। কানাইদা থাকলে তা হতো না। স্বভাবসিদ্ধ দ্রুতগতিতে আশ্রমে ঢুকেই চীৎকার করে উঠতেন —'কি ব্যাপার রে তোদের? মুখে সব সাইলেন্সার লাগিয়ে বসে আছিস নাকি? বুঝি না বাপু তোদের। কেমন করে যে বাবু সেজে বারান্দার বেঞ্চিতে বসে থাকিস, তা তোরাই জানিস। ওটি চলছে না বাপু।' এই বলে হাতটা ধরতেন কানাইদা, তারপর হিড়-হিড় করে টেনে নিয়ে যেতেন পুকুর ধারে। শান-বাঁধানো সিঁড়ির উপর ধড়াস্ করে বসে পড়তেন

তিনি। তারপর শুরু হতো গল্প গুজব।

কিন্তু এই সন্ধ্যায় কে গল্প-গুজব করবে? তাঁর সোনার তরী এখন নিরল স্তব্ধতার রাজ্যের উদ্দেশে পাড়ি দিয়েছে।

আশ্রমে বসা সম্ভব হলো না। উঠে পড়লাম। আমার সঙ্গী প্যাটারসনদাও দেখলাম কোনো কথা বললেন না, আমাকে একবারও বসতে অনুরোধ করলেন না। অন্যদিন হলে সবাই হাঁ-হাঁ করতেন। আজ সবাই যেন নিজের যন্ত্রণার মধ্যেই ডুবে রয়েছেন। সোজা বাড়ি ফিরে এসেছি। এবং সেই থেকেই ভাবছি কি হারালাম।

অন্ততঃ এই এইদিন শনিবারের এই সন্ধ্যাটা আমার কাছে কানাইদার সন্ধ্যা হয়ে থাক্। মনে আজ সাহিত্য নেই, রাজনীতি নেই, অর্থনীতি নেই। শুধু আছেন কানাইবাবু, স্যার কানাইদা, কানাইলাল বাগ।

আমার সামনের টেবিলের ওপর লেখার কাগজ রয়েছে। আমাদের সামান্য ইস্কুলের সামান্য পত্রিকায় কানাইদার তিরোধানের সংবাদ হাঁন্ধা হয়তো আমাকে কিংবা শংকরীদাকে লিখতে বলবেন। কিংবা তিনি নিজেই হয়তো শেষ পর্যন্ত কলম ধরবেন। তাঁর অভ্যস্ত সাধু বাংলায় কি লেখা হবে, তা আমি এখনই বলে দিতে পারি। লেখা হবে ঃ

"লোকান্তরিত কানাইলাল বাগ আমাদের বিদ্যালয় এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রমের সঙ্গে অতি বাল্যকাল হইতে জীবনের শেষ পর্যন্ত সেবা-সম্পর্কে যুক্ত ছিলেন। তাঁহার সহিত এই উভয় প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক এত নিকট ও অঙ্গাঙ্গী ছিল যে, তাঁহার বিয়োগের ক্ষতিপূরণ হইতে পারে কিনা, এই প্রশ্নও আমাদের নিকট অবান্তর। কানাইলাল বাগের মৃত্যুর শোক সান্ত্বনাহীন এবং নিরুপায়ে আমাদের সহ্য করিতে হইবে।

মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করিলেন। আমাদের বিদ্যালয় হইতে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৯৩২ সালে শিক্ষকরূপে বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিনি একবার মোটর-ইঞ্জিনীয়ারিং শিখিতে গিয়েছিলেন, শিখিয়াছিলেনও, কিন্তু জীবনের বৃত্তি নির্বাচনকালে বিবেকানন্দ স্কুলের শিক্ষকতাকেই বাছিয়া লইলেন। সম্ভবতঃ না লইয়া পারেন নাই, কারণ কাসুন্দিয়া অঞ্চলের শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাব প্রণিত যে যুবকগোষ্ঠীর দ্বারা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম ও বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশনের পত্তন হয়, শিশু সদস্যরূপে কানাইলাল সে দলের সহিত স্বাভাবিকভাবেই মিশিয়া গিয়াছিলেন। স্বামী বিরজানন্দের মন্ত্রশিষ্য কানাইলাল শেষদিন পর্যন্ত দেশঋণ ও দেবঋণ শোধ করিয়া গিয়াছেন।

কানাইলাল সোজা ও সহজ মানুষ ছিলেন। আবেগ বশীভূত হইতে ভালবাসিতেন না, যত্ন করিয়া কাজ করার অভ্যাস তাঁহার ছিল, এবং এই নিরহঙ্কার অনাড়ম্বর মানুষটি সযত্নে তাঁহার প্রতিষ্ঠানের সম্মান রক্ষা করিয়া চলিতেন। তীক্ষ্ণ ও সরল বাকপটুত্বের অধিকারী কানাইলালের সাহচর্য তাঁহার বন্ধু ও জ্যেষ্ঠদের নিকট পরম আনন্দদায়ক ছিল, ছাত্রগণ অবশ্য মাধুর্যের সঙ্গে তাঁহার চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় পাইত।

তাঁহার আত্মার চিরশান্তি হোক, শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে আমাদের ইহাই প্রার্থনা।"

কিন্তু আমাদের কাছে কানাইদার আরও পরিচয় আছে। কোনো দার্শনিক বলেছেন—'সংসারে আমরা সবাই অন্ততঃ দু'বার রাজা হতে পারি। বিয়ের দিন বরবেশে, আর জীবনের শেষে নিদ্রিত রাজা যেদিন মরণ-সাগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। কানাইদা কিন্তু মাত্র একবারই রাজা হলেন। প্রথম-বার রাজা হওয়ার সুযোগটা চিরকৌমার্যের ব্রত নিয়ে কানাইদা নিজেই বর্জন করেছিলেন। আজ তিনি রাজা। কিন্তু একদিনকার সুলতান—আজকের রাজত্ব কেবল আজকেরই জন্যে। বারবার নিজের কক্ষপথে পাক খেতে খেতে এই পুরনো পৃথিবীটা যখন সামনের বছরে আবার আজকের দিনে ঘুরে আসবে, তখন কেই বা তাঁকে মনে রাখবে?

সংসারের পাকা খাতায় যাঁরা নাম লেখাতে চায়, তাঁদের কঠিন পরীক্ষায় পাশ দিতে হয়। হিসেবী-সংসারী-সুদখোর এক বুড়োর মতো লালরঙের জমাখরচের খাতা নিয়ে বসে আছে। তোমার সুখের, তোমার দুঃখের, তোমার পাপের, তোমার পুণ্যের, তোমার গ্রহণের এবং ত্যাগের; তোমার বড়-বড় কর্ম আর অপকর্মের কড়াক্রান্তি পর্যন্ত হিসেব দাও। তারপর বুড়ো যোগ কষবে, বিয়োগ কষবে, গুণ কষবে, ভাগ কষবে। হিসেবের শেষে জমার দিকে একটা বিরাট অঙ্ক পড়ে থাকলে, তবে নাম উঠবে খাতায়।

কিন্তু কানাইদা কি সে-হিসেব দিয়েছেন; না দিতে চেয়েছেন? আর এখন যদি আমি তাঁর হয়ে ওকালতি করতে যাই, সুদখোর সংসার-বুড়োটা হেসে গড়িয়ে পড়বে। সত্য কথা বলতে কি, সে হাসিকে হেসে উড়িয়ে দেওয়ার মতো সাহস আমার নেই। অথচ সেদিন, যেদিন ওঁর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়েছিল, সেদিন কি-না করতে পারতাম।

বেশ মনে পড়ছে কথাগুলো। তখন সবেমাত্র ইস্কুলে ঢুকেছি। পাঁচ-পাতা হাতের লেখা দেখাতে না পারলে যাঁর হাতে নিশ্চিত বিড়ম্বনা, এমন একজন স্যারের ক্লাস। মুখ শুকনো করে বসে আছি আমরা কয়েকজন। টিফিনের সময় লুকোচুরি খেলা বিসর্জন দিয়ে, বড়ো বড়ো হরফের বোম্বাই

মেল চালিয়েও দু'পাতার বেশি ভরাতে পারিনি। প্রয়োজনের সময় মাথায় বুদ্ধি আসে; ঐ দুঃসময়ে আমার মনে হলো, হায়রে, যদি এমন একটি কল বার করা যেতো, যাতে আপনা-আপনি লেখা হয়ে যায়? তখন কে আর হাতের লেখার জন্যে ভয় পাবে? ইস্কুলের বদমেজাজী মাস্টাররা একসঙ্গে সবাই জব্দ হয়ে যাবে।

নিজের উর্বর মস্তিষ্কের তারিফ যখন নিজেই করতে যাচ্ছি, তখন বন্ধু ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, "ও রকম কল তো বহুদিন আগেই সায়েবরা বার করেছে।" আরও বলল যে, "ওই কল দেখবার জন্য সায়েবদের কাছে যাবারও দরকার নেই। একটু ধৈর্য ধরে ইস্কুলের আপিস ঘরের দিকে নজর রাখলেই তার দর্শন মিলবে।"

বন্ধুর কথা প্রথমে বিশ্বাস হয়নি। কিন্তু পরের দিনই দেখলাম, ইস্কুলের অফিস ঘরে একটা অদ্ভুত কলের মধ্যে কাগজ পরিয়ে আমাদের ইস্কুলের এক ভদ্রলোক বোর্ডের উপর না তাকিয়ে বেমালুম লিখে যাচ্ছেন। নিজের চোখকেই বিশ্বাস হচ্ছিল না। কল দিয়ে লেখা, তাও কিনা না দেখে। ইনি কে? ইনি কি মনুষ্য সন্তান, না দেবদূত?

বন্ধু আঁতকে উঠলো। 'চিনিস না, ছোটবাড়িতে দেখিসনি?'

কি করে চিনবো? ছোটবাড়িতে পড়বার সুযোগ তো আমার হয়নি। জয়নারায়ণবাবু লেনের প্রাইমারি সেকশনের ঘোড়া ডিঙিয়ে একেবারে খুরুট রোডে হাই ইস্কুলের ঘাসে মুখ দিয়েছি আমি। বন্ধু কানে বললে, 'কানাই-বাবু স্যার।'

সঙ্গে-সঙ্গে আঁতকে উঠেছি। চাক্ষুষ পরিচয় নেই। কিন্তু সেই দুর্মূল্যের বাজারেও বিনা আয়াসে কানাইবাবুর গাঁট্টা যে পয়সায় আটটা পাওয়া যায়, তা বহুমুখে বারবার শুনেছি। তাঁর চিমটির মূল্যও অতি সুলভ —প্রতি পয়সায় তিনটি। মনে, মনে এক বিশালবপু ভয়াবহ কানাইবাবু স্যারের ছবিও এঁকে রেখেছিলাম। নিরাপদ আশ্রয় থেকে এক দুর্দান্ত বাঘকে দেখবার আনন্দ পাচ্ছিলাম। হঠাৎ কানে এলো—'এই, ভিতরে শুনে যা।' ডাক শুনে বুঝতে দেরি হলো না যে, বাঘ দেখতে এসে দুর্ভাগ্য-ক্রমে বাঘের খাঁচার ভেতরেই পা দিয়ে ফেলেছি। বন্ধুরা দে ছুট। কাঁদ-কাঁদ মুখে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বললাম, 'আমি স্যার দেখতে চাইনি। ওরাই তো আমাকে দেখতে বললে—।'

গম্ভীরভাবে মেসিন থেকে কাগজ নামাতে-নামাতে কানাইবাবু স্যার বললেন না, তুই কি দেখতে চেয়েছিস, তোর মাথা দেখতে চেয়েছে।'

পাশে রাখা চায়ের কাপে চুমুক দিলেন স্যার। তারপর কলে আর-

একটা কাগজ পরালেন। আমি তখন সকালে ঘুম থেকে উঠে যাদের-যাদের মুখ দেখেছি, তাদের সবাইকে অভিসম্পাত করছি।

'কি নাম তোর? কোনো রকমে নিজের নামটা বলে, আমি যে নির্দোষ; সেটা আবার প্রমাণ করতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু চটাপট চটাপট আওয়াজ আরম্ভ হলো। ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলেছি—স্যার নিশ্চয়ই মেসিনে তাঁর গাঁট্টা দিচ্ছেন। কিন্তু নিজের মাথায় গাঁট্টা বর্ষণের কোনো অনুভূতি না হওয়ায় চোখ খুললাম। খুলেই অবাক। পৃথিবীতে যে বস্তুটি আমার সবচেয়ে প্রিয়, সেই আমার নিজের নামটাই কলের মধ্যে পরানো কাগজটায় জ্বলজ্বল করছে আমার বিস্ময়ের ঘোর পুরোপুরি কাটাবার আগেই দেখি, নামের চারধারে ফুলকাটা বর্ডার বসে গিয়েছে।

সেই পরম মূল্যবান সম্পত্তিটি নিয়ে কি বিজয়গর্বে সেদিন বন্ধুদের কাছে ফিরেছিলাম, তা আজও মনে আছে। আরও মনে আছে সেই মুহূর্ত থেকেই অন্যান্য বাঘা-বাঘা স্যারদের নিরীহ কীট-পতঙ্গ মনে হতে লাগলো। আমার মানসাকাশে তখন মাত্র একটি জ্যোতিষ্কের শোভা—সে জ্যোতিষ্ক কানাইবাবু। যুগলবাবু স্যার, হিমাংশুবাবু স্যার খোদ হেড্‌-মাস্টার মশায় পর্যন্ত কেউ কি পারেন এমন কল দিয়ে লিখতে, ফুলের নক্সা কাটতে?

সেইদিন থেকেই স্যারকে আবার ধরবার জন্যে অপেক্ষা করেছি। কাসুন্দের মোড়ে স্যারের সঙ্গে একদিন দেখা। হাতজোড় করে নমস্কার জানিয়ে বললাম, 'স্যার, আর একটা ফুলকাটা নাম লিখে দেবেন স্যার? হাতের লেখার খাতায় লাগাবো।' উনি আমার নমস্কারে ভ্রূক্ষেপ করলেন না। বললেন' 'এ আর কি শক্ত কাজ!'

বলে কি! শক্ত কাজ নয়?

অবাক হয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়েছি কাসুন্দে রোডের মোড়ে। আমারই চোখের সামনে দিয়ে চকচকে করে কাচা সাদা হাফশার্ট ও কাপড় পরা কানাইবাবু স্যার স্বাভাবিক দ্রুতগতিতে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

সেদিন, অর্থাৎ মে মাসের সেই সন্ধ্যাবেলায় যদি আমি লিখতে জানতাম এবং কেউ যদি আমাকে কানাইবাবুর কথা লিখতে বলতো, তা'হলে আমি জোর করে বলতে পারি, আমার হাতে এমন একটা চরিত্রের সৃষ্টি হতো যাঁর কাছে বুদ্ধ, রামানুজ, শংকরাচার্য, আলেকজাণ্ডার, আকবর, নেপোলিয়ন সকলকেই ক্ষুদ্র আর অপ্রয়োজনীয় মনে হতো। এঁদের কেউ কি এমন না দেখে কল চালাতে পারতেন? আর চালাতে পারলেও কি নিশ্চিতভঙ্গীতে একটি বালকের অপ্রতিভ নমস্কার উপেক্ষা করে বলতে

পারতেন—'ও আর কি।'

হায় তখন কি জানতাম—তারপরও আমার সঙ্গে পথে-ঘাটে ইস্কুলে, ট্রামে বাসে কতবার তাঁর সঙ্গে দেখা হবে; জীবন প্রভাতের স্বপ্নমায়া আমারই জীবন-মধ্যাহ্ন হিসেবী সংসারের চাপে চৌচির হয়ে যাবে। এমন একদিন আসবে, যেদিন আমি নিজেই কল চালাতে শিখবো। জানবো 'টাইপিস্ট' বলতে যাঁদের বোঝায়, তাঁরা সংসারের সার্থকনামা সফলদের দলে পড়েন না। নিতান্ত কিছুই যার হয় না সেই শেষপর্যন্ত টাইপ শিখে 'বাক্স' বাজাতে শুরু করে। অথচ তখন ভাবতেও পারিনি যে, একদিন বিবেকানন্দ ইস্কুলের মাস্টার হিসেবে আমি কানাইদার লেভেলে উঠে যাবো; ইস্কুলের সেই অফিস ঘরে বসে কানাইদা বলবেন, "আমরা হাতুড়ে টাইপিস্ট, তেমন সুবিধে পারি না। শংকর, এটা তুমি টাইপ করো, অনেক তাড়াতাড়ি অনেক ভালো জিনিস হবে।"

কিন্তু সে-সব কথা আজকে রাত্রে ভেবে কি লাভ? সারাজীবন ধরে যিনি আমাদের হাসিয়ে এলেন, একসঙ্গে হৈ-চৈ হল্লা করলেন, তাঁর জন্যে হা-হুতাশ করলে তাঁর পরলোকগত আত্মা নিশ্চয়ই সুখী হবে না। পেঁচোয়-পাওয়া ছিঁচকাঁদুনে ছেলেদের কানাইদা মোটেই দেখতে পারতেন না। বলতেন, "কান্না-ভান্না" বুঝি না বাপু। হৈ হৈ করবে, গণ্ডগোল করবে, জিনিস-পত্তর ভাঙবে গুরুজন বা মাষ্টারে মারলে মাথা নীচু করে মার খেয়ে, পরের মুহূর্তে তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে আবার খেলাধুলো করবে, তবে তো ছেলে! যারা মিন-মিন করে, ফ্যাচ্-ফ্যাচ্ করে কাঁদে, তাদের আমি বুঝতে পারি না বাপু।

সুযোগ পেয়ে জিজ্ঞাসা করেছি, "আপনার গাঁট্টা কি সত্যিই শায়েস্তা খাঁর আমলের চালের মত সুলভ?"

"এই গাঁট্টা খেয়েছিলি বলেই তো ব্রেনটা তোর অতো খুলেছে, এটা বুঝিস্ না কেন?" বেশি আলোচনা বা চিন্তার ধার ধারতেন না কানাইদা। তাই বললেন, "তোদের সঙ্গে বকবক করে কি আমার পেট ভরবে?"

একটু পরেই দেখি. উনি ক্লাস ফোরের ছেলেদের সঙ্গে মাঠে ইঁটের উইকেটের সামনে ক্রিকেট খেলছেন। কানাইদার সমবয়সী আশ্রমের কর্মীরা ডাকছেন, "কানাই, চলে আয়, ঠাকুরঘরে কাজ আছে।"

কানাইদার খেয়াল নেই, তিনি তখন একটা বল বাউণ্ডারিতে পাঠিয়ে ছেলেদের বলছেন, "এসব কব্জির জোর আলাদা! সারাদিন বল করেও আউট করতে পারবি না।"

নীচু ক্লাস থেকে বড় ক্লাসে উঠে যখন একটু চালাক হয়েছি, তখন অন্য

সকলের সঙ্গেই জানলাম, কানাইবাবু স্যার আসলে কানাইলাল বাগ প্রাইমারি সেকশনে পড়ান এবং উঁচু ক্লাসের ছেলেদের মাইনে জমা নেন। প্রতি মাসে ওই মাইনে দেওয়ার দিনেই আমাদের সঙ্গে ওঁর সাক্ষাৎ কাজ-কারবার। আমাদের ইস্কুলের অফিস ঘরের কাউণ্টার ছিল না। একটা জানালার ভেতর কানাইদা বসতেন, আর আমরা বাইরে থেকে জানালা গলিয়ে মাইনের বইটা ওঁর সামনে ফেলে দিতাম। চশমার কাঁচের মধ্যে দিয়ে কানাইদা বিলটার ওপর চোখ বুলিয়ে নেন, লাল পেন্সিলে দাগ কাটেন, এবং তারপর একটা রবার স্ট্যাম্প মেরে বিলের খানিকটা ছিঁড়ে নিয়ে বইটা ফেরৎ দেন।

কারও কারও বিলটা হাতে নিয়েই কানাইদা রেগে ওঠেন। এটা আর মানুষ হলো না। ক্লাস ফোরে যেমন বাঁদর ছিল, এখনও ঠিক তেমনি রয়ে গেল। এগজামিন ফি-র ঘরে ম্যাগাজিন ফি, আর ম্যাগাজিন ফি-র ঘরে পাখা ফি বসিয়েছে। গার্জেনকে রিপোর্ট করতে হবে দেখছি।'

যাকে বললেন, সেই বেচারার মুখ তো চুন। বিল বইটা নিয়ে সে যখন ফিরে যাচ্ছে, তখন কানাইদা হাসসে-হাসতে বললেন, "দেখিস, মনে-মনে গালাগালি করিস না যেন। শেষে চা খাবার সময় বিষম খেয়ে মরবো। সত্যিই কিছু তো গার্জেনকে বলে দিতে যাচ্ছি না।'

লাইনে দাঁড়িয়ে এইসব কথাবার্তা শুনে আমি ততক্ষণে ফিক্ করে হেসে ফেলেছি। স্যারের চোখ এড়াতে পারিনি। বললেন, 'কি দাঁত বার করে অত হাস্য হচ্ছে কেন? নিজের তো ওই কাগের ট্যাঙ, বগের ঠ্যাঙ লেখা!'

অনেকদিন পরে এই কথা শুনে কানাইদার এক বাল্যবন্ধু বলেছিলেন, কানাই-এর ওই স্বভাব। মুখে রাগ করে কিন্তু ও রাগ বুকে পৌঁছয় না। শুধু কি তাই। সব কিছুতেই একটু মজা না করতে পারলে ওর ভাত হজম হয় না। ওই যে অঙ্ক না পারলে ছেলেদের ও চোখ রাঙায়, ওটাও ওর মজা। আবার ওকে নিয়ে তোমরা মজা করো, কিছু বলবে না; বরং খুশি হবে। যার যত গুল, যত বানানো ঘটনা আর কেচ্ছা, নির্ভাবনায় কানাই-এর নামে চালিয়ে দিতে পারো। এই বিবেকানন্দ ইস্কুলের ছাত্র হিসেবে ওর নামে যে কত মজার ঘটনা রটানো হয়েছে!

কানাইদার বন্ধু বলেছিলেন একবার 'আমাদের ক্লাসে ট্রানশ্লেশন জিজ্ঞাসা করা হলো—'মহৎ ব্যক্তিরা সাধারণতঃ মহৎ পরিবার হইতে আসেন!' কে একজন পিছন থেকে এক মুহূর্ত চিন্তা করে বললে, 'Great man come from reliable source।' সবাই হো-হো

করে হেসে ফেললে—কিন্তু কে বলেছে ধরা গেল না। মাস্টারমশাই জিজ্ঞেস করলেন, 'চেম্বারসায়েবের ভাইপো এই Reliable সায়েবটি কে ?' সায়েবকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তখন অগতির গতি কানাই আছে। ছেলেরা হৈ হৈ করে তারই নাম করলে Reliable source।'

বন্ধু একটু থামলেন, তারপর বললেন, 'কিন্তু একটুও রাগ করতো না কানাইবাবু। খেলাধূলোর ব্যাপারটা ধরো। ওকে ছাড়া ফুটবল ক্রিকেট, হকি, কোনো টিমই তৈরী করা যেতো না। অথচ গোল খাবার যত দোষ, হেরে যাবার যত দায়িত্ব সর্বসম্মতিক্রমে ওর ঘাড়েই চাপানো হতো! ভলি খেলায় তো একটা ভুল মারের নাম এখনো আশ্রমে 'ফেনিয়ান স্ট্রোক' বলে পরিচিত।'

কানাইদার আর-এক রূপ দেখেছি আশ্রমে দুর্গাপূজার সময়।

সে-ই লুচি করে, ধন্যবাদ কুড়োয় না। সভা-সমিতি-উৎসবে তারা বেঞ্চি বয়ে নিয়ে আসে, চেয়ার সাজায়. চিঠি বিলি করে ; কিন্তু ধোপভাঙা পাঞ্জাবী পরে অতিথিদের অভ্যর্থনা করে না। নাটকে পাদপ্রদীপেই অন্তরাল থেকে তারা প্রম্প্রট করে, অথচ ঢাল-তরোয়াল নিয়ে কখনও রাজা সাজে না। কেউ এদের মেডেল দেয় না, এদের নাম কাগজে ছাপা হয় না। অথচ এদের না হলে ফিষ্টি হয় না, সভা হয় না, থিয়েটার হয় না—আসলে এদের না হলে জীবনই চলে না!

কিন্তু পৃথিবীর তাতে কিছু এসে যায় না। নরোকুলের মনোমন্দিরে যে ঢুকতে চায়, তাকে নির্ধারিত সেলামী দিতেই হবে। আর সেইজন্যেই তো আমার ভয়। বুড়ো সংসার নিষ্প্রাণ পাথরের মতো জিজ্ঞাসা করবে, যার জন্যে এত লেকচার ছাড়ছো, কে তিনি ?

কে তিনি ? আমাকে বলতে হবে তিনি এম-এ নন, পি-এইচ-ডি নন—সামান্য ম্যাট্রিক পাশ। টাইপ জানতেন, ড্রাইভারি জানতেন, অথচ মাস্টারি করতেন প্রাইমারি সেকশনে। পৃথিবী জানতে চাইবে জগৎকে কি দিয়েছেন তিনি ? আমাকে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। তখন করুণাভরে আমাকে হয়তো প্রশ্ন করা হবে, অন্ততঃ এক-আধঘণ্টা সুভাষচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রকে ছোট বেলায় পড়িয়েছেন কি ? আমাকে তখনও মাথা নীচু করে থাকতে হবে।

কিন্তু সে লজ্জা কানাইদার নয়। সে লজ্জা কেবল তাদের, যারা তাঁর কাছে পড়তো। সে লজ্জা তাদের, যারা তাঁকে জানতো, কাছে থেকে দেখতো—যারা জানে আজ ভোরবেলায় তারা কি হারিয়েছে। কারণ এ হারানোর জের একদিনে মিটবে না। যখনই ইস্কুলে সরস্বতী পূজায় মাস্টার-

মশায়রা আসবেন, তখনই মনে হবে কাকে যেন তারা হারিয়েছে।

আশ্রমের দুর্গাপূজা আমাদের জীবনে কতখানি স্থান অধিকার করে আছে, তা যে না দেখেছে সে হয়তো বুঝবে না। আশ্রমের দুর্গোৎসবের রূপটাই যেন আলাদা—চারদিন ধরে সব কিছু ভুলে একদল আনন্দলোভী লোক দিনরাত এখানেই পড়ে থাকে! পরিচিত অপরিচিত দীর্ঘ দল তখন আসে আর যায়। তারা ঠাকুর দেখলো কিনা, দেখলেও প্রসাদ না নিয়ে চলে গেল কিনা, বেঞ্চিতে তাদের বসবার জায়গা আছে কিনা, না চ্যাংড়া ছেলেরা সেগুলো দখল করে বসে আছে—এসব দেখবার জন্যেই তো কানাইদা ছিলেন।

আমাদের আশ্রমে আর-একটা জিনিস আছে। চাঁদা চাওয়া হয় না। কিন্তু বহুজনেই দিয়ে যেতে চান। তাঁদের জন্যে এবং খরচের টাকার হিসেব রাখার জন্যে বাক্স নিয়ে যাকে হাসিমুখে বসে থাকতে দেখতাম, তিনিই কানাইদা। রাত এগারোটার সময়ে তাঁকে ঐভাবে বসে থাকতে দেখেছি—'বলা যায় না, যদি কেউ এসে পড়ে!'

তাছাড়াও আরো কত। সকালে বাদলবাবু স্যার রেগে বলেছেন, "কানাই, দেড়ঘণ্টা ধরে বসে আছি, আমরা এখনও চা পাইনি। এই তোমাদের ম্যানেজ্ম্যান্ট। চা তৈরি বা বিতরণের দায়িত্ব তাঁর নয়, তার জন্যে অন্য লোক আছেন, তবুও দোষ মাথায় নিয়ে, অথচ রাগে গজ্গজ্ করতে করতে কানাইদা চায়ের সন্ধানে বেরোলেন।

ছাত্রাবস্থায় ক্লাসে কানাইদা কোন্ বেঞ্চিতে বসতো জানি না। কিন্তু কর্মজীবনে কখনও প্রথম সারিতে আসতেন না। অথচ, ইস্কুলে আশ্রমে যে সব কাজ সবচেয়ে গোলমেলে এবং সবচেয়ে খাটুনির, সেই অংশটুকু বেছে নিয়ে খুশি হতেন।

সংসারে এমন একদল লোক থাকে, যারা ঠিক নুনের মতন। আপাত-দৃষ্টিতে তাদের কোনো গুরুত্ব নেই। বনভোজনে, বিয়েতে এরা কাঁচা কাঠের ধোঁয়ায় চোখ জ্বালিয়ে খিচুড়ি রান্না করে, বা লুচি ভাজায়, অথচ ফিস্টে যাবেন, আশ্বিনের মাঝামাঝি কোনো সোনা-ঝরা ভোরবেলায় যখন ঢাকের আগমনী আওয়াজে নস্কর পাড়া লেনটা ভরে উঠবে, প্রসাদের আশায়, ফুল হাতে করে কাসুন্দের লোকেরা আশ্রমের লাল পথটা মাড়িয়ে টালির বারান্দায় এসে বসবেন, প্যাটারসন্দা নাড়ু আর চা বিলোতে আসবেন, তখনই মনে হবে কার যেন এখানে থাকা উচিত ছিল, কিসের যেন অভাব, কে যেন নেই।

লবণ স্বাদ

আশাপূর্ণা দেবী

বদলী করে দিয়েছে, নতুন অফিসের কর্মভার গ্রহণের তারিখ, ঘণ্টা মিনিটে নির্দেশ করে দিয়েছে, দেয়নি শুধু বাসার আশ্বাস।

বাঙালীর ছেলে পাঞ্জাব-সীমান্তের একটি মফঃস্বল শহরে, যেখানে অন্তত তিনশো মাইলের মধ্যে কোনও আত্মীয়ের ছায়া মাত্র নেই, সেখানে হঠাৎ গিয়ে পড়ে যথাসময়ে কাজে যোগ দেবার অসুবিধেটা কতদূর সেকথা বোঝাবার দায় সরকারের নয়। চাকরি নেবার সময় বণ্ডে সই করোনি তুমি, যে কোনও জায়গায় যেতে প্রস্তুত? মনে নেই সেকথা?

সরকার কি বণ্ডে সই করেছিল, যখন যেখানে পাঠাব তোমাকে, তোমার জন্যে ঘর সাজিয়ে রাখবো? তুমি তো তুমি কোন্ ছার, নেহাৎ চুনো পুঁটি না হও, চিংড়ি-চিতলের চাইতে বেশিও নও। বলে কত রুই-কাতলাই বদলী হয়ে পরের বাসায় নাক গুঁজে থেকে দিন কাটাচ্ছে, কাপড়ের তাঁবুতে স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে সংসার পেতে বসেছে।

তবু তো তুমি প্রভাব গোস্বামী, ঝাড় হাত-পা মানুষ। না স্ত্রী, না পুত্র, না ডেরো, না ঢাকনা। একটা সুটকেস, একটা বেডিং একটা জলের কুঁজো, একটা টিফিন কেরিয়ার, সর্বসাকুল্যে এইতো তোমার সম্পত্তি। এতেই ভাবনায় অস্থির?

তা সত্যি বলতে প্রভাত একটু বেশিই ভাবছে। তার কারণ এ যাবৎ নিজের ব্যবস্থা নিজে করে নেওয়ার অবস্থাও কখনো ঘটেনি। হাওড়ায় দেশের বাড়ীতে বাড়ীর ছোটছেলের প্রাপ্য পাওনা পুরোবস্তুর ভোগ করেছে, চাকরির প্রথম কালটা কাটিয়ে এসেছে লক্ষ্ণৌতে কাকার বাড়ী। কাকাই চাকরির জোগাড়দার। তিনি কি অফিসে, কি বাসাতে সদাসর্তক দৃষ্টি রেখে আসছিলেন ভাইপোর সুবিধে-স্বাচ্ছন্দ্য সম্পর্কে। কিন্তু বিধি হলো বাদী।

বদলীর অর্ডার এলো। প্রভাতের মা অবশ্য খবরটা শুনে ভেবে ঠিক করে ফেললেন, এ নিশ্চয় ছোটবৌয়ের কারসাজি, বরকে বলেকয়ে ভাসুরপোর বদলীর অর্ডার বার করিয়ে দিয়েছে, কারণ—

কারণ নতুন কি, বলাই বাহুল্য। পর নিয়ে ঘর করার অনিচ্ছে। কিন্তু আসলে তা নয়। খুড়ি চেষ্টা করেছিলেন, সামনে পূজোর ছুটিতে নিজের বিয়ের যোগ্যি বোনঝিটিকে নিজের কাছে আনিয়ে নেবেন, এবং অদূর ভবিষ্যতে

দিদির কাছে ঘটকী বিদায় আদায় করবেন।

কিন্তু হলো না। জগতের বহুবিধ সাধ-ইচ্ছেটা আপাততঃ মুলতুবি রাখতে বাধ্য হতে হলো তাঁকে। বদলীটা পূজো পর্যন্তও ঠেকানো গেল না। পূজোর ছুটিতে চলে আসবার জন্যে বারবার অনুরোধ জানিয়ে কাকা-কাকী বিদায় দিলেন। প্রভাত সেই বিষণ্ণ আর্দ্রতার ছোঁয়ার সঙ্গে নিজের অসহায়তার ভয়াবহতা মিশিয়ে চিত্তকে বেশ ঘনতম আবৃত করে গাড়ীতে উঠলো। আর বেচারা হতভাগ্যের ভাগ্যে সঙ্গে সঙ্গে সুরু হলো প্রবল বর্ষণ। সারারাত্রি ঠায় জেগে কাটিয়ে দিলো প্রভাত, বন্ধ কামরার মধ্যে বৃষ্টির শব্দের প্রচণ্ডতা অনুভব করতে করতে। গাড়ীতে আরও তিনজন আরোহী ছিলেন, তাঁদের প্রতি ঈর্ষা-কুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে প্রভাত নিশ্চিন্ত হলো। আর যাই হোক, কেউ বদলী হয়ে যাচ্ছে না।

তবে বৃষ্টির আওয়াজ একটু উপকার করলো প্রভাতের। তিন দিক থেকে তিনটি নাকের আওয়াজ তার কর্ণকুহরকে শিহরিত করতে ততটা পেরে উঠলো না। কানের থেকে মনটাই তার কাছে প্রধান হয়ে রইলো।

স্টেশনে যখন নামলো প্রভাত, তখন বৃষ্টি নেই, কিন্তু শেলেট পাথরের মত আকাশের নীচে পৃথিবীটা যেন শোকগ্রস্তের মত জড়পুঁটলি হয়ে পড়ে আছে। ভেবেছিল, কুলিও পাওয়া যাবে কিনা কিন্তু আশঙ্কা অমূলক। কুলি যথারীতি গাড়ী থামবার আগেই গাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়ে প্রভাতের অনুমতি ব্যতিরেকেই তার জিনিসপত্র টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে ফেললো এবং কোথায় যাবেন ও গাড়ী হবে কিনা শুধিয়ে মুখপানে তাকিয়ে রইলো। আর ঠিক এই মুহূর্তে—এই ভয়াবহ সঙ্গীন মুহূর্তে ঘটে গেল এক অদ্ভুত অঘটন। অতএব সেই অঘটনের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ প্রভাতকে স্বীকার করতেই হলো কলিতে ভগবান নেই, এটা ভুল সিদ্ধান্ত। ভগবান আছেন, এবং আর্তের আকুল আবেদন তাঁর কানে এক-আধ ক্ষেত্রেও অন্তত পৌঁছোয়। আর পৌঁছোলে আর্তত্রাণকল্পেও দূত পাঠান তিনি। সেই দূত হিসেবে এসে দাঁড়ালেন একটি আধবয়সী ভদ্রলোক, এবং অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, একটি রীতিমত রূপসী তরুণী। খুব সম্ভব পিতা-কন্যা।

প্রভাতের সামনে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক দরাজ গলায় বলে উঠলেন, কোথায় উঠবেন?

প্রভাত প্রথমটা থতমত খেলো। এমন পরিচিত ভঙ্গিতে যিনি প্রশ্ন করলেন, তিনি পূর্বপরিচিত কিনা স্মরণ করতে চেষ্টা করলো, তারপর সচকিত হলো। পরিচিত নয়। একটি রূপসী তরুণীর সামনে চুপ করে থাকার লজ্জা বহন করা চলে না। তাই মৃদু হেসে বললে, 'ঠিক এই মুহূর্তে নিজেকেই

ওই প্রশ্নই করছিলাম।'

'বুঝেছি!' সবজান্তার ভঙ্গীতে মাথা নেড়ে ভদ্রলোক কন্যার দিকে দৃষ্টিপাত করে হেসে বললেন, 'বলিনি তোকে? মুখ দেখেই বুঝেছি বাসার ব্যবস্থা হয়নি। নতুন বদলী হয়ে এলেন বোধহয়? ওপরওলাদের আক্কেল দেখছেন তো? বদলী করেই খালাস। সে ওঠে কোথায়, খায় কি, আর দায়িত্ব নেই। পাঁচ বছর ধরে শুনেছি মশাই, গভর্ণমেন্ট কোয়াটার্স তৈরি হবে। তা সে শোনাই সার। ছেলেবেলায় শুনতে পেতাম আঠারো মাসে বছর, এখন দেখছি ছাব্বিশ মাসে—'

ভদ্রলোকের কথার মাঝখানে ফাঁক পাওয়া সম্বন্ধে হতাশ হয়ে, ফাঁকটা একরকম করে নিয়েই বলে ওঠে প্রভাত, 'তা আপনি তো এখানকার সব জানেন-শোনেন। বলুন দিকি, সুবিধেমত কোনও মেস্ বা হোটেল কোথায় পাওয়া যেতে—'

'বিলক্ষণ! বিলক্ষণ! আমি তবে অহেতুক আপনাকে দাঁড় করিয়ে সময় নষ্ট করছি কেন? মল্লিকা শোন! কথা শোন ভদ্রলোকের! আমার নিজের আস্তানা থাকতে আমি সন্ধান দিতে যাবো কোথায় মেস আছে, কোথায় হোটেল আছে! চলুন-চলুন, এই গরীবেরই গরীবখানায় গিয়ে উঠুন তো! তারপর বুঝবেন থাকতে পারবেন কি, না পারবেন।'

প্রভাত ব্যাকুল স্বরে বলে, 'না, না, সে কি, আপনার বাড়ীতে গিয়ে উৎপাত করবো কেন, আপনি শুধু যদি—'

'আহা-হা, উৎপাত কি! এ তো আমার ভাগ্য! আপনাদের মত অতিথি পাওয়া পরম ভাগ্য! আজ ভালো লোকের মুখ দেখে উঠেছিলাম মল্লিকা, কি বলিস? চলুন-চলুন, এই যে গরীবের একখানা হাটুভাঙা পুষ্পরথও আছে।'

অদূরে অবস্থিত একটি টাঙ্গার দিকে চোখ পড়ে প্রভাতের। ভদ্রলোক কুলিটাকে চোখের ইসারা করেন এবং মুহূর্তে সে কর্তব্য পালন করে। আর প্রভাত এক নজরে দেখে এইটুকু অবশ্য অনুভব করে, গাড়ির ব্যাপারে ভদ্রলোক অতি বিনয়ী নয়। গাড়িটা হাঁটুভাঙাই বটে।

সেই গাড়িতেই যখন ভদ্রলোক প্রভাতকে উঠিয়ে দিয়ে সকন্যা নিজে উঠে পড়েন, তখন প্রভাত সভয়ে না বলে পারে না, 'ভেঙে যাবে না তো?'

আশপাশ সচকিত করে হেসে উঠেন ভদ্রলোক। হাসির দাপটে দুলে দুলে বলেন, 'না মশাই, সে ভয় নেই; দেখতে যেমনই হোক ভেতরে মজবুত।'

'কিন্তু আপনি ওদিকে কেন?' প্রভাত তারস্বরে প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে, 'আপনি এদিকে আসুন। আমিই কোচ্ম্যানের পাশে—'

কিন্তু ততক্ষণে বিশ্রী একটা ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়ি চলতে শুরু করেছে। ভদ্রলোক ওদিক থেকে বলেন, 'না মশাই, আমার আবার উল্টোদিকে ছুটলে মাথা ঘোরে।'

অতএব পরিস্থিতিটা হলো এই টাঙ্গার পেছনের সিটে প্রভাত আর মল্লিকা। প্রতি মুহূর্তে ঝাঁকুনি খেতে খেতে আর পরস্পরের গায়ে ধাক্কা লাগাতে লাগাতে ছুটতে লাগলো টাঙ্গাটা।

যতটা সম্ভব সঙ্কুচিত হয়েও প্রভাত সেই দুরূহ অবস্থা থেকে আত্মরক্ষায় সক্ষম হলো না, আর মনে মনে বলতে বলতে গেল, মাথা ঘোরাবার ব্যবস্থাটা তাহ'লে আমার জন্যেই বহাল হলো।

এও ভালো, ভদ্রলোক বাংলা থেকে বহুদূরে আত্মীয়সমাজের বাইরে থাকেন বলেই মুক্তচিত্ত। যাই হোক, আপাতত যে 'প্রবাসে বাঙালী' লাভ হলো, এ বহুজন্মের ভাগ্য। অন্তত আজকের মত মালপত্র রেখে অফিসটা তো দর্শন করে আসা যাবে। তারপর কালই একটা কোনো ব্যবস্থা করে নিতে হবে। সরকারী অফিস যখন আছে, মেস বোর্ডিং কোথাও না কোথাও যাবেই জুটে। আবার ভাবলো, এ যুগেও তাহলে এরকম অতিথিবৎসল লোকও থাকে।

ভদ্রলোক যদি একা হতেন, হয়তো প্রভাত কিঞ্চিৎ দ্বিধাগ্রস্ত হতো, হয়তো ভাবতো এতই বা আগ্রহ কেন? মতলব খারাপ নয় তো কোনো গুণ্ডার আড্ডায় তুলে নিয়ে গিয়ে টাকাকড়ি কেড়ে নেবে না তো! কিন্তু সকল সন্দেহ মুক্ত করে দিয়েছে মল্লিকার উপস্থিতি। বুঝে ফেলেছে, আর কিছুই নয়, বাঙালীহীন দেশে বাঙালীপাগলা লোক!

কিন্তু মেয়েটা একটিও কথা কয়নি কেন? বোবা, না কি? বাপ তো বারবার ডেকে ডেকে সালিস মানছিল। যার জন্যে নামটা জানা হয়ে গেছে। বোবাকে কি কেউ ডেকে কথা কয়?

প্রভাত একবার চেষ্টা করে দেখবে নাকি? আচ্ছা কোন কথা বলা যায়? এখানের আবহাওয়া? কতদিন এদেশে আছেন? না কি আপনাদের বাসা আর কতদূরে?

আলাপ জমাতে গেলে ভদ্রলোক বিরক্ত হবেন? না, তা নিশ্চয়ই নয়। মেয়েকে যখন এভাবে বসতে দিয়ে নিজে নিশ্চিন্ত হয়ে সোজামুখো ছুটলেন, তখন মাথার পেছনে কান খাড়া করে রেখেছেন বলে মনে হয় না।

ত্রিভঙ্গঠামে হলেও টাঙ্গাটা ছুটছিল ভালোই।

দু'পাশে নীচু জমি, সেখানে সবুজের সমারোহ, মাঝখানে সরু আলরাস্তা চড়াই-উৎরাইয়ের বৈচিত্র্যে লোভনীয় ক্ষণে-ক্ষণে ঝাঁকুনি!

তা—সেটা অস্বস্তিকর হলেও তেমন বিরক্তিকর তো ঠেকছে না কই। অনেকক্ষণ চলার পর, প্রভাত যখন অনুমান করছে লোকালয়ের বাইরে চলে এসেছে, তখন দূর থেকে কয়েকটা ছোট কটেজ দেখা গেল। ওদেরই একটা নিশ্চয়ই! প্রভাত এবার মনের জোর সংগ্রহ করে ধাঁ করে বলে ফেললো, 'আর বেশিদূর আছে নাকি?'

মল্লিকা চমকালো না। বরং মনে হলো যেন একটা কোন প্রশ্নের জন্যে প্রস্তুতিই হচ্ছিল। কারণ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলো, 'ওই তো দেখা যাচ্ছে।'

কথা বাড়াবার জন্যেই বলে প্রভাত, 'ওদের মধ্যে কোনটা?'

'সবগুলোই'।'

'সবগুলো!'

'হ্যাঁ তাও কুলিয়ে উঠছে না, আরও বাড়ি তৈরীর কথা হচ্ছে।'

বিস্ময় বোধ না করে পারে না প্রভাত। পরিবার বড় হলে বাড়ী বড় করে তৈরী করে লোকে, আলাদা কটেজ, এটা কি রকম! তবু বলে, 'খুব বড় বড় জয়েণ্ট ফ্যামিলি বুঝি?'

হঠাৎ মল্লিকা অনুচ্চ একটু হেসে ওঠে। ঘাড়টা একটু ফিরিয়ে সামনে-ছোটা ভদ্রলোককে একবার দেখে নেয়, তারপর বলে, 'এখনো পর্যন্ত আপনি বুঝতে পারেন নি?'

বুঝতে পারবে! কি বুঝতে পারবে প্রভাত?

ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না কোনদিক থেকে বুঝতে চেষ্টা করতে হবে। মল্লিকাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করতেও লজ্জা করছে। তাই দূরের ওই কটেজগুলোর মধ্যেই বোধগম্য কিছু আছে কিনা, দেখবার জন্যে অনবরত ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে থাকে।

বেশিক্ষণ অবশ্য সন্দেহদোলায় দুলতে হলো না। টাঙ্গাটা ঝড়াং করে থেমে গেল এবং ভদ্রলোক নেমে পড়ে বললেন, 'এই যে এসে গেছি। সাবধানে নামুন প্রভাতবাবু।'

'প্রভাতবাবু!' নাম জানাজানিটা কখন হলো! প্রভাত সবিস্ময়ে বলে, আমার নামটা জানলেন কি করে?'

'কি করে?' একটু হেসে বললে, 'হাত দেখে। সুটকেসের ওপর টিকিট এঁটে রেখে নিজেই ভুলে যাচ্ছেন মশাই? আসুন, এই গরীবের গরীবখানা। এই সামনের ছোট্টখানি নিয়ে সুরু করেছিলাম। আপনাদের পাঁচজনের কল্যাণে আশেপাশে—আস্তে-আস্তে—সাবধানে! পাথরটার ওপর পা দিয়ে আসুন সারারাত বৃষ্টি পড়ে কাদা—মল্লিকা, তুই গণেশকে

পাঠিয়ে দিগে যা। জিনিস পত্রগুলো নামিয়ে নিক্। প্রভাতবাবু শুধু পাতা পাথরের ওপর দিয়ে—'

সাবধানে পা টিপে-টিপে এসে প্রথমে কটেজটার সামনে দাঁড়ায় প্রভাত, আর সাইনবোর্ডটা চোখে পড়ে।

'আরাম কুঞ্জ'

সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য মডারেট চার্জে আহার ও বাসস্থান।

পোঃ—এ. কে. চ্যাটার্জী!

কি বোঝা উচিত ছিল, এতক্ষনে বুঝতে পারে প্রভাত। জলের মত পরিষ্কার। লোকালয়ের বাইরে বহুবিস্তৃত জমি নিয়ে চ্যাটার্জীর 'আরাম কুঞ্জ'। ঘরের পেছনে বারান্দা। শুধু একফালি, তবু তাতেই দু'খানি বেতের চেয়ার, একটি ছোট টেবিল।

চায়ের ট্রে-টা চাকরেই দিয়ে যায়, তবে তত্ত্বাবধানে আসে মল্লিকাই। হেসে একটা বেতের চেয়ার টেনে নিয়ে বলে, 'এতক্ষণে বুঝেছেন বোধহয়?'

নতুন বাড়ী, ছবির মত সাজানো ঘর, পিছনের এই বারান্দা থেকে যতদূর চোখ পড়ে, উন্মুক্ত প্রান্তর! প্রান্তরের সীমায় আকাশের কোণে পাহাড়ের নীলরেখা। মেঘমেদুর আকাশের বিষণ্ণতা কেটে আলোর উঁকি দিচ্ছে। সৌন্দর্যে মোহগ্রস্ত প্রভাত এতক্ষণে মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়েছিল সেইদিকে, চা এবং মল্লিকা, দু'টোর চাঞ্চল্যে চোখ ফিরিয়ে হেসে বলে, 'একটু-একটু'।

'আপনি একটু বেশি সরস!'

'তার চাইতে বলুন না কেন, একটু বেশী নির্বোধ।'

'বলাটা ভদ্রতা নয়, এই যা।'

'কিন্তু কি করে জানবো বলুন? ভাবলাম প্রবাসে বাঙালী—'

মল্লিকা হেসে ওঠে। প্রভাত ভাবে, ঠোঁটে রঙের প্রলেপ বলেই কি দাঁতগুলো অত সাদা দেখাচ্ছে? কিন্তু তাতে সাদাই দেখাবে, এমন মুক্তোর মত নিখুঁত গঠনভঙ্গী কি করে হবে?

'জায়গাটা বড় সুন্দর।'

'হ্যাঁ!' মল্লিকা হাসির সঙ্গে বলে; 'নামটা যখন আরাম কুঞ্জ!'

কিন্তু হাসির সঙ্গে মুখটা অমন কঠিন হয়ে ওঠে কেন ওর?

'বাস্তবিক সার্থকনামা। কিন্তু আমাকে তো এখুনি বেরোতে হবে। আমার অফিসটা কতদূরে, উত্তরে কি দক্ষিণে, পূর্বে কি পশ্চিমে কিছুই জানি না। এখানের ব্যবস্থাটাই বা কি রকম হবে—মানে আপনার বাবাকে তো আর দেখতে পাচ্ছি না।'

'দর্শনের সৌভাগ্য। আবার গেছেন লোক ধরতে—কিন্তু উনি আমার বাবা নয়, মামা।'

প্রভাত যেন একটু বিমূঢ় হয়ে পড়ে। ভদ্রলোক তাহ'লে স্রেফ হোটেলের আড়কাঠি। আর এই সুসজ্জিতা সুবেশা রূপসী তরুণী তাঁর মেয়ে না হলেও ভাগ্নী! তবে আসল মালিক বোধহয় এর বাবা।

শালাকে লাগিয়ে রেখেছেন লোক ধরে আনতে। কিন্তু সারাক্ষণ লোক কোথায়? ট্রেন তো আর বারবার আসে না।

সেই সন্দেহই ব্যক্ত করে প্রভাত।

মল্লিকা বলে, 'ওসব অনেক সিক্রেট! বুঝবেন না।'

'তা না হয় বুঝলাম না। কিন্তু এখানে থাকার ব্যবস্থা কি, চার্জ কি রকম, এখান থেকে অফিস যাওয়া সম্ভব কিনা, এগুলো তো বুঝতে হবে।'

'আমার কাছে সবই জানতে পারেন।'

'আপনিই কর্ণধার?'

মল্লিকা হঠাৎ চোখ তুলে কেমন যেন একরকম করে তাকালো। তারপর বললো, 'দেখাশোনা করি! চা-টা খান। এখুনি তো বেরোবেন বলছেন। ভাত—'

'না-না, ওসব কিছু না। এই এতবড় ব্রেকফাস্ট করে চার্জটা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না হলে ঠিক স্বস্তি পাচ্ছি না।'

মল্লিকা হেসে ওঠে। 'আচ্ছা ভীতু লোক তো আপনি! মারাত্মক কিছু একটা নয়। চলুন দেখাইগে খাতা-পত্তর।'

চার্জ? না এমন কিছু মারাত্মক সত্যিই নয়!

ব্যবস্থা যে এত উত্তম হতে পারে, এটা প্রভাতের ধারণার মধ্যে ছিল না। 'আরাম কুঞ্জে'র শুধু যে নিজস্ব একটা টাঙ্গা আছে তাই নয়, একখানা জিপও আছে। এবং সেই জিপখানা বোর্ডারদের জন্যে সর্বদা খাটে, নিয়ে যায় শহরের মধ্যস্থলে, অফিস পাড়ায়, কর্মকেন্দ্রে।

'নইলে আপনারা গরীবের আস্তানায় থাকবেন কেন? এ আপনার গিয়ে খোলা বাতাসটাও পেলেন, আবার কাজকর্মেরও অসুবিধে হলো না—'

প্রোঃ এন্ কে চ্যাটার্জি বলেন, 'আপনার আশীর্বাদে যিনি একবার পায়ের ধূলো দিয়েছেন, তিনি বারে-বারে পায়ের ধূলো দেন।'

হ্যাঁ, চ্যাটার্জির দর্শন আর একবার মিলেছে। কোনও রকম অসুবিধে হচ্ছে কিনা জানবার জন্যে এসেছে। বারে-বারে প্রশ্ন করছেন।

প্রভাত হেসে বলে, 'অসুবিধে কি মশাই, বরং সুবিধেটাই এত বেশি হয়ে যাচ্ছে যে ভয় হচ্ছে, এরপর আর কোথাও—'

'এরপর আর কোথাও মানে?' হাঁ-হাঁ করে ওঠেন চ্যাটার্জি, 'আবার কোথায় যাবেন? নিজের ঘরবাড়ীর মতন থাকবেন। ওই জন্যেই তো টানা লম্বা ঘরদালান না করে ছোট-ছোট কটেজ করা।'

প্রভাত কুণ্ঠিত হাস্যে বলে, 'কিন্তু এই পাণ্ডববর্জিত দেশে এত লোক আসে?'

'বলেন কি মশাই?'

হাঁ-হাঁ করে হেসে ওঠেন ভদ্রলোক, 'দেখতে নিরীহ হলে কি হবে, জায়গাটা কতবড় বিজনেস্ ঘাঁটি! অবিশ্যি একদিক থেকে বলেছেন ঠিকই, বাঙালী কমই আসেন। মানে, বিজনেসের ব্যাপারে তো বুঝতেই পারছেন?'

'ওঃ, সে কি আজ? রাগ করে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিলাম। বলেছিলাম 'ধুত্তোর বাংলা দেশ!' তারপর কোথা দিয়ে যে কি হলো! এখানেই—'

'দেশে আর কখনো যাননি?'

চ্যাটার্জি একবার তীব্র কটাক্ষে প্রভাতের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেন। নিছক সরল কৌতূহল, না আর কিছু?

নাঃ, সরল বলেই মনে হচ্ছে। বোকা প্যাটার্নের ছেলেটা!

বললেন, 'গিয়েছিলাম? একবার বাপ মরতে গিয়েছিলাম, আর একবার বিধবা বোনটা মরতে বাচ্ছা ভাগ্নীটাকে কুড়িয়ে নিয়ে চলে এসেছি, ব্যস্! সেই অবধি।'

প্রভাত হাসে, 'কিন্তু এমন নিখুঁত বাঙালী রয়ে গেছেন কি করে বলুন তো? এতদিন থাকলে লোকে তো—'

'বলেন কি মশাই, বাঙালীর ছেলে, বাঙালী থাকবো না? যাক্ তাহ'লে অসুবিধে কিছু নেই?'

'না-না, মোটেই না। আপনার বোর্ডিংয়ের নামকরণ সার্থক!"

চ্যাটার্জি একটু মিষ্ট মধুর হাসেন, 'হ্যাঁ, সকলেই অনুগ্রহ করে ওকথা বলে থাকেন! ক্রমশঃই বুঝবেন, কেন নিজের এত গৌরব করলো চ্যাটার্জি। এ তল্লাটে 'আরাম কুঞ্জ' বললে চিনবেন না, এমন লোক নেই আর ওই যা বললাম, একবার যিনি পায়ের ধুলো দিয়েছেন—'

প্রভাত সসঙ্কোচে বলে, 'কিন্তু আমাকে যে এখানে থাকতে হবে। মানে যতদিন না ফের বদলি হচ্ছে।'

'কি আশ্চর্য। থাকবেন তার চিন্তার কি আছে?' চ্যাটার্জি মুচকে হাসেন, 'দেখবেন, এখান থেকে আর বদলি হতেই চাইবেন না। তবে শুনুন—' চ্যাটার্জি চুপি-চুপি বলেন, স্থায়ী বোর্ডারদের চার্জ অনেক কম!

ব্যবসা করছি বলে তো আর আক্কেলের মাথা খেয়ে বসিনি মশাই। বিবেচনাটা আছে। দেখবেন ক্রমশঃ, চ্যাটার্জির বিবেচনার ত্রুটি পাবেন না।'

'স্থায়ী বোর্ডারদের চার্জ অনেক কম—' এই আশ্বাস বাণীটি হৃদয়ে মধুবর্ষণ করতে থাকে! হৃষ্টচিত্তে প্যাড্ টেনে নিয়ে চিঠি লিখতে বসে প্রভাত।

মাকে লেখে, কাকাকে লেখে।

মাকে লেখে—'মা তোমাদের কাছ থেকে আরও অনেক দূরে চলে এসেছি। আসবার সময় মনটা বড় খারাপ হয়ে গিয়েছিল! অজানা জায়গা—কোথায় থাকবো, কি করবো। কিন্তু ভাগ্যক্রমে স্টেশন থেকেই ব্যবস্থা হয়ে গেল। একটি বাঙালীর হোটেল পেয়েছি, বাঙালী রান্নাও খেলাম। ঘর নতুন, সুন্দর সাজানো, বাড়ীটি ছবির মতন, আর জায়গাটা এত চমৎকার যে, ইচ্ছে হচ্ছে তোমাদের সকলকে দেখাই। ঘরের পেছনে বারান্দায় বসলে যতদূর চোখ চলে, যাকে বলে মুক্ত প্রান্তর, আর তার ওপারে পাহাড়। পরে আবার চিঠি দেবো।' ইতি—প্রভাত।

কাকাকে লিখলো, 'কাকা তোমাদের কাছ থেকে এসে মন কেমন করছে, একথা লিখতে গেলে ছেলেমানুষী, তাই আর লিখলাম না। থাকার খুব ভালো ব্যবস্থা হয়ে গেছে। পরে আবার চিঠি দিচ্ছি! তুমি ও কাকিমা প্রণাম জেনো। আমার সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থেকো। কাকিমাকে বোলো, জায়গাটা খুব সুন্দর'। ইতি— প্রভাত

দু'জনকে জানাতে উদ্যত হচ্ছিল, মল্লিকার মত এক মেয়েকে এরকম জায়গায় দেখতে পাওয়ার বিষয়টা, বোধটা, কিন্তু কিছুতেই ভাষাটা ঠিকমত মনে এলো না। ভাবলে, যাকগে. কি আর এমন একটা খবর। ভাবলো কিন্তু সেই 'কি আর এমনটা'ই মনের মধ্যে একটা খবরের মত কানাকানি করতে থাকলো!

সত্যি, আশ্চর্য! এ ধরনের বাঙালী পরিবার পরিচালিত হোটেল এখানে দেখতে পাওয়া অভাবনীয়। পুরীতে, কাশীতে, রাঁচীতে এখানে সেখানে দেখেছে প্রভাত, যতটুকু যা বেড়িয়েছে। অথচ ঠিক এরকমটি কিন্তু দেখিনি। পাঞ্জাবের এই দূর সীমান্তে, শহর ছাড়ানো নির্জনতায়!

কিন্তু রাত্রে যেন নির্জনতাটা তেমন রইলো না।

সারাদিনের ক্লান্তি আর গত রাতের ট্রেনের রাত্রি জাগরণ দু'টো মিলিয়ে প্রভাতকে তাড়াতাড়ি বিছানা মেলবার প্রেরণা দিচ্ছিল। তাই গণেশকে ডেকে প্রশ্ন করলো, এখন খেতে পাওয়া যাবে কিনা।

গণেশ মৃদু হেসে জানালো, এখন পাওয়া যাবে কিনা বলে কোনও কথা

নেই। রাত দু'টো-তিনটেতেও লোক আসে, খাওয়া-দাওয়া করে।'

প্রভাত সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে, 'অত রাত্রে লোক? তখনও কোনো ট্রেন আসে নাকি?'

গণেশ আর একটু ব্যঞ্জনাময় হাসি হেসে বলে, 'ট্রেন আসে কিনা জানি না বাবু? লোক আসে তাই জানি। তেমন হলে আমাদের তো আর রাতে ঘুমোবার জো থাকে না। শীতের রাতে হি-হি করতে করতে—'

'ওরে বাবা! এখানে শীত।' প্রভাত পুনঃ প্রশ্ন করে, 'তুমি তো বাঙালী?'

'তা হবে!'

কৌতুক অনুভব করে প্রভাত গণেশের কথায়। বলে, 'তা হবে মানে? নিজে কোন্ দেশের লোক জানো না?'

'জানবার কি দরকার বাবু! ভূতের আবার জন্মভূমি! আপনার খাবার আনছি।'

প্রভাত ভাবলো খাবার কি গণেশই আনবে? অন্তত তার সঙ্গে আর কেউ আসবে না?

নাঃ, সত্যিই এলোও না। গণেশ এলো। তার সঙ্গে একজন অবাঙালী বয়।

পরিষ্কার কাঁচের পাত্রে পরিষ্কার ন্যাপকিন। আহার্যের সুবাসে যেন ক্ষিদে বেড়ে ওঠে প্রভাতের। কাকীর বাড়ীর নিত্য ডাল-রুটির পরই ব্যবস্থার এই রাজকীয় আয়োজনটা প্রভাতকে একটু উদারক মনে হতে পারে, কিন্তু সত্য অস্বীকার করে লাভ নেই।

তবু খেতে-খেতে যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে যেতে লাগলো প্রভাত, ইচ্ছে করে একটু দেরী করে খেতে লাগলো। যদি তদ্বিরকারিণী এসে উদয় হয় একবার। না, প্রভাতের আশা সফল হলো না।

অদৃশ্য একটা কর্মজগতের উপর কেমন একটা সূক্ষ্ম ঈর্ষা অনুভব করলো প্রভাত। এত কাজ! বাবাঃ!

বিছানায় পড়তে না পড়তেই ঘুম আসবার কথা, কিন্তু কিছুতেই যেন সে ঘুমটা আসছে না। উঁকি দিয়েই পালিয়ে যাচ্ছে।

—কত রকমের শব্দ।

—কত জুতোর শব্দ, কত কথার শব্দ, কত গ্লাস প্লেট পেয়ালার ঠুং-ঠাং শব্দ—কত লোক আসে এখানে? আর আসে কি রাত্রেই বেশি? কেন?

অচেনা পরিবেশ রাত্রির এই মুখরতায় একটু যেন ভয়-ভয় করলো প্রভাতের, গা-টা শির্ শির্ করে উঠলো। তাড়াতাড়ি উঠে দেখলো

ছিটকিনি লাগিয়েছে কিনা।

তারপর ঘড়ি দেখলো। মাত্র এগারোটা।

তখন লজ্জা করলো প্রভাতের। নিজে সন্ধ্যা আটটায় শুয়ে পড়েছে বলেই মনে করেছে কি না জানি গভীর রাত্রি। এই সময় লোকজন বেশি হওয়াই তো স্বাভাবিক।

পাখী সারাদিন আকাশে ওড়ে কিন্তু সন্ধ্যায় নীড়ে ফেরে!

এইসব বিজনেস্ ম্যানেরা সারাদিন অর্থের ধান্ধায় কোথায় খায়, কোথায় থাকে, কিন্তু রাত্রে আস্তানায় ফের, খায়-দায় আড্ডা জমায়, মদই কি আর না খায়? ভাবলো প্রভাত।

আমাদের বিবেচনাশীল প্রোপ্রাইটার মশাই অবশ্যই সে ব্যবস্থা রেখেছেন! আবার ভয় এলো!

কেউ মাতাল-টাতাল হয়ে গোলমাল করবে না তো!

মাতালের বড় ভয় প্রভাতের।

কিন্তু না। শব্দ ক্রমশঃ কমে এলে, ঘুমিয়ে পড়লো প্রভাত।

পরদিন চায়ের টেবিলে মল্লিকার আবির্ভাব। গত কালের মত প্রসাধন-মণ্ডিত নয়!

একটু যেন ঢিলেঢালা। সদ্য স্নান করেছে, খোলা ভিজে চুল।

প্রভাতের মনে হলো এ আরো অনেক মনোরম।

কাল ভেবেছিল রূপসী। আজ ভাবলো সুন্দরী। কাল মনে করেছিল মনোহর। আজ মনে করলো মনোরম। বয়সের ধর্ম।

প্রভাত একটু অভিমান দেখালে। 'কাল তো আর আপনার দেখা মিললো না।'

মল্লিকা ছ'টো চেয়ারের একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো। মধুর হাসি হেসে বললে, 'দেবীদর্শন এত সুলভ নাকি?'

'হ্যাঁ, তাই ভেবেই মনকে সান্ত্বনা দিয়েছিলাম। আর আজও প্রত্যাশার পাত্র উপুড় করে রেখেছিলাম।'

'উঃ কি কাব্যিক কথা। চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।'

'চোখ ঠাণ্ডা হলে, চা চুলোয় গেলেও ক্ষতি হয় না।'

মল্লিকার মুখটা সহসা একটু কঠিন হয়ে ওঠে। চাঁচাছোলা টান-টান মুখটায় এই সামান্য পরিবর্তনটাই চোখে পড়ে।

সেই কঠিনমুখে বলে মল্লিকা, 'কমবয়সী মেয়ে দেখলেই কি এ'রকম কাব্যি জেগে ওঠে আপনার?'

মুহূর্তে অবশ্য প্রভাতের মুখও গম্ভীর হয়ে যায়। চায়ের পেয়ালাটা

তুলে নিয়ে সে বলে, 'ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন!'

'রাগ হয়ে গেল?'

'রাগ নয়, চৈতন্য।'

'অত চৈতন্যদেব না হলেও ক্ষতি নেই। আমি শুধু একটু কৌতুহল প্রকাশ করেছি। কারণ কি জানেন? আমি আপনাকে সাধারণ পুরুষদের চেয়ে আলাদা ভেবেছিলাম।'

প্রভাত এবার চোখ তুলে তাকায়। একটি বদ্ধ গভীর দৃষ্টি ফেলে বলে, 'হয়তো আপনার ধারণা ভুল ছিল না। এটা ব্যতিক্রম। কিম্বা হয়তো আমি নিজে নিজেকে জানতাম না। কোনও অনাত্মীয় মেয়েদের সঙ্গে আলাপের সুযোগও তো আসেনি কখনো।'

'ও, বুঝেছি!' মল্লিকা হেসে ওঠে, 'একেবারে গৃহপোষ্য। তাই সোনা কি পিতল চিনতে শেখেননি এখনো!'

'তার মানে?'

'মানে নেই! খান, খেয়ে ফেলুন।'

'কিন্তু দেখুন, সকালে এত খাওয়া! এখুনি তো আবার অফিস যেতে হবে ভাত খেয়ে—

'না তো!' মল্লিকা বিস্মিত দৃষ্টিতে বলে, 'তাই অভ্যাস নাকি আপনার? কাল যে বললেন—ইয়ে, আমরা তাই তো আপনার লাঞ্চটা টিফিন ক্যারিয়ারে ভরে জিপে তুলে দেওয়ায় ব্যবস্থা করেছি।'

'বলেন কি! এ যে ধারণার অতীত!'

'কেন?'

'বাঃ। বাড়িতেও তো এমন ব্যবস্থা সব সময় হয়ে ওঠে না।'

মল্লিকা হঠাৎ একটা দুষ্টু হাসি হেসে বলে, 'বাড়িতে বৌ নেই বোধহয়? বুড়ো মা-পিসিকে দিয়ে আর কত—'

প্রভাতের মুখে একটা পরিহাসের কথা আসছিল। মুখে আসছিল'—বৌ তো কোনোখানেই নেই।' কিন্তু মল্লিকার ক্ষণপূর্বের কাঠিন্য মনে করে বললো 'না'।

শুধু বললো, 'নাঃ আপনাদের ব্যবস্থাটা সত্যিই ভালো।'

'শুনে সুখী হলাম। কিন্তু উত্তরটা পাইনি।'

'উত্তর? কিসের উত্তর?'

'জেনে আপনার লাভ?'

'লাভ? আপনি বুঝি প্রতিটি কথা খরচ করেন লাভ-লোকসানের হিসাব কষে?'

'তা পৃথিবীর নিয়ম তো তাই।'

'হুঁ। পৃথিবীর নিয়মটা খুব শিখে ফেলেছেন দেখছি। কাল তো সন্ধ্যাবেলাই শয্যাশ্রয় করলেন। নতুন জায়গায় ঘুম হয়েছিল?'

প্রভাত হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়েছিল সেই উদার উন্মুক্ত প্রান্তরের দিকে আজ আর মেঘলা নেই। সকালের নির্মল আলোয় ঝকঝক করছে। মল্লিকার প্রশ্নে সচকিত হয়ে বলে, 'ঘুম? সত্যি বলতে প্রথম রাতটায় কিছুতেই ঘুম আসছিল না। এত রকম শব্দ।'

'শব্দ? কিসের শব্দ?'

একটু যেন উত্তেজিত দেখায় মল্লিকাকে। প্রভাত বিস্ময় বোধ করে হেসে ওঠে, 'ভয় পাবার কিছু নেই, বাঘের গর্জনের শব্দ নয়। মানুষের পায়ের, বাসনপত্রের, টুকরো কথার—'

'আর কিছু নয়?' মল্লিকার দৃষ্টি প্রখর হয়ে ওঠে।

প্রভাত ভাবে, মেয়েটার তো মুহূর্তে মুহূর্তে ভাব পরিবর্তন হয়। কিন্তু কেন হয়? মুখে বলে, 'না তো! আর কি হবে?'

মল্লিকা নরম হয়ে যায়। সহজ হয়ে যায়। বলে, 'তাই তো! আর কি হবে। তবে বাঘের গর্জনও অসম্ভব নয়।'

'অসম্ভব নয়! বাঘ আছে!' প্রভাত প্রায় বসে পড়ে।

আর মল্লিকা হেসে ওঠে, 'ভয় পাবেন না। পাহাড়ের ওদিকে বাঘ ডাকে। তাছাড়া বাঘের চাইতে ভয়ঙ্কর তিন-তিনটে কুকুর রাত্রে পাহারা দেয় এখানে। চেন খুলে রাখা হয়। বাঘও ভয় পায় তাদের।'

কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। তারপর আস্তে বলে প্রভাত, 'সন্ধ্যেবেলা আপনি খুব খাটেন, তাই না?'

'শুধু সন্ধ্যেবেলা? সর্বদাই। অহোরাত্র।'

কেমন একটা ব্যঙ্গ হাসির সঙ্গে বলে মল্লিকা।

প্রভাত বলে, 'এত কি কাজ? লোকজন তো রয়েছে!'

'লোকজন দিয়ে কি সব হয়? অতিথির আদর-অভ্যর্থনা নিজেরা না করলে?'

শুনে সহসা প্রভাতের সংস্কারগ্রস্ত গৃহস্থমন বিরূপ হয়ে ওঠে, আর অধিকার-অনধিকারের প্রশ্ন তুলে বলে ফেলে সে, 'এটা আপনার কিন্তু আপত্তি করা উচিত।'

মল্লিকা বলে, 'কোন্‌টা অন্যায়? কিসে-কোনটা আপত্তি করা উচিত?'

'এই, যে আসে তার আদর-অভ্যর্থনার দায়িত্ব আপনার নেওয়া। কত রকমের লোক আসে, আর ওইসব অঞ্চলের নানা জাতের ব্যবসায়ীরা যে

কী ধরনের লোক হয়, জানেন না তো?'

মল্লিকা আরও নিরীহভাবে বলে, 'আপনি জানেন?'

'এর আর জানাজানির কি আছে?' প্রভাত সবজান্তার ভঙ্গিতে বলে, 'কে না জানে! না-না, আপনি ওসব দিকে যাবেন না?'

'বাঃ, মামার ব্যবসার দিকটা তো দেখতে হবে?'

'দেখতে হবে!' প্রভাত চটে উঠে বলে, 'মামার ব্যবসাটাই বড় হলো? নিজের মান-সম্মানটা কিছু না?'

'কে বললে মান-সম্মানটা কিছু না?' আবার উত্তেজিত হয় মল্লিকা।

'হয় না? আপনি বলছেন কি?' প্রভাতও উত্তেজিতভাবে বলে 'এমন কিছু কম বয়স আপনার নয় যে, জগতের কিছু বোঝেন না। এ থেকে আপনার ক্ষতি হতে পারে, এ আশঙ্কা নেই আপনার?'

মল্লিকা গম্ভীর হয়ে যায়। বিষণ্ণভাবে বলে, 'আশঙ্কা থাকলেই বা কি! আমার জীবন তো এইভাবেই কাটবে!'

প্রভাত এই বিষণ্ণ কথার ছোঁয়ায় একটু থতমত খেয়ে গিয়ে বলে, 'বাঃ, তাই বা কাটবে কেন? মেয়েদের জীবনে মস্ত একটা সুবিধে আছে। বিয়ে হলেই তারা একটা নতুন পরিবেশে চলে যেতে পায়?'

'হুঁ, সুবিধেটা মস্ত সন্দেহ নেই। কিন্তু কথা, বিয়ে না হলে?'

'বিয়ে না হলে!' প্রভাত দুর্বলভাবে বলে, 'হবে না কেন?'

'সেটাই স্বাভাবিক!' মল্লিকা হেসে ওঠে, 'মা-বাপ মরা মেয়ে, মামার কি দায়!'

প্রভাত বোধকরি আবার ভুলে যায় সে কে, কি তার অধিকার তাই রীতিমত চটে উঠে বলে, 'দায় অবশ্যই আছে। এদিকে তো বাঙালী নামে খুব বড়াই করলেন আপনার মামা, বাঙালী সংসারে বাপ-মা মরা ভাগ্নীর বিয়ে দেবার দায় থাকে না? তা থাকবে কেন, আপনাকে দিয়ে দিব্যি নানা সুবিধে-সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে—'

মল্লিকা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে ওঠে, 'খুব তো বড়-বড় কথা বলছেন, আপনি আমার বিষয়ে কতটুকু জানেন? জানেন, মামা আমাকে দিয়ে কি-কি সুযোগ-সুবিধে পাচ্ছেন?'

'বেশি জানবার কিছু নেই। নিজের চক্ষেই তো দেখলাম, খাতা লিখছেন হিসেব-পত্তর দেখছেন, বোর্ডারদের সুবিধে-স্বাচ্ছন্দ্য দেখছেন, নিজে মুখেই তো বললেন, অহোরাত্র খাটছেন! এই যথেষ্ট, আর বেশি না জানলেও চলবে। আমি বলবো আপনার মামার এটা রীতিমত স্বার্থপরতা। আর আপনার উচিত, এর প্রতিবাদ করা।'

'সত্যি।' হঠাৎ বেদম খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে মল্লিকা। আর নেহাৎ বাচাল মেয়ের মত বলে ওঠে, 'মনে হচ্ছে, আমার ওপর বড্ড মায়া পড়ে গেছে আপনার। লক্ষণ ভালো নয়।'

'উপহাস করছেন?'

'কে বললে?' মল্লিকা হাসি থামিয়ে বলে, 'খাঁটি সত্য কথা। কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখেছেন কি, মামা এরকম স্বার্থপর না হলে আপনিই বা আমার জন্যে এত দুশ্চিন্তা করবার অবকাশ পেতেন কোথায়? আপনার সঙ্গেও তো সেই একই সম্পর্ক।'

প্রভাত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, আরক্ত মুখে বলে, 'মাপ করবেন। নিজের পোজিশনটা হঠাৎ ভুলে গিয়েছিলাম!'

'আরাম কুঞ্জে'র ডানপাশের রাস্তায় জিপগাড়িটা প্রস্তুত হয়েই দাঁড়িয়েছিল, প্রভাত অফিসের সাজে সজ্জিত হয়ে এসে দেখলো ভেতরে আরও দু'জন ইতিমধ্যেই আসীন।

গতকাল একাই গিয়েছিল, এবং আজও সেইরকম ধারণা নিয়েই আসছিল, সহযাত্রী যুগলকে দেখে মনটা অপ্রসন্ন হয়ে উঠলো।

তা, প্রভাত কি কুনো? মানুষ ভালোবাসে না সে?

ঠিক তাও নয়। সত্যি কথা বললে বলতে হয়, প্রভাত একটু প্রাদেশিকতা দোষে দুষ্ট। সহযাত্রীরা বাঙালী হলে সে যে পরিমাণ প্রসন্ন হয়ে উঠতো, সেই পরিমাণ অপ্রসন্ন হলো ওদের দেখে!

বিদেশী পদ্ধতিতে একটু সৌজন্যসূচক সম্ভাষণ করে প্রভাত গম্ভীর মুখে উঠে বসলো। দেখলো পায়ের কাছে তিনটে টিফিন ক্যারিয়ার বসানো এবং তাদের হাতলে এক একটা সুতো বেঁধে অধিকারীর নামের টিকিট লাগানো।

মিঃ গোস্বামী, মিঃ ট্যাণ্ডন, মিঃ নায়ার। প্রভাত ভাবলো সর্বধর্ম সমন্বয়। ভাবলো চ্যাটার্জী লোকটা ঝুনো ব্যবসাদার বটে!

গাড়ি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চললো, তিনটি যাত্রী কেউ কারো সঙ্গে আলাপের চেষ্টা করলো না। শুধু প্রভাতের মনে হলো অন্য দু'জন অনবরত তার দিকেই লক্ষ্য করছে।

মনের ভ্রম? না কি সম্পূর্ণ সাধারণ ব্যাপার?

আজও সন্ধ্যায় গণেশ ও সেই অপর একজন খাবার নিয়ে এলো। এবং যথারীতি মল্লিকার দেখা মিললো না।

সকাল থেকে অকারণেই প্রভাতের মনটা বিষ হয়েছিল। সকালের সেই লোকদুটো এ বেলাও সহযাত্রী হয়েছে! অর্থাৎ, বোঝা যাচ্ছে এই

ব্যবস্থাই চলতে থাকবে। জিপের ব্যবস্থা দেখে কাল খুশী হয়েছিল, আজ বিরক্তি বোধ করছে।

কম্পাউণ্ডের মধ্যে এদিক ওদিক দু'চারখানা প্রাইভেট কার দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মেজাজ আরও খারাপ হয়ে গেছে। ওর মনে হচ্ছে, জগতের সকলেরই প্রভুত টাকা আছে। নেই শুধু প্রভাতের।

নিজের একখানি 'কার' চালিয়ে যথেচ্ছ বেড়াতে পাওয়াটাই প্রভাতের মতে আপাততঃ জগতের শ্রেষ্ঠ সুখের অন্যতম মনে হতে লাগলো। জিপের জন্যে আলাদা চার্জ দিতে হবে, অথচ কেমন যেন দয়া-দয়া ভাব। নিজেকেও 'দয়ার ভিখিরী'র মত লাগছে।

গণেশকে প্রশ্ন করলো, 'গাড়ীতে আর যে দু'জন ভদ্রলোক ছিল, ওরা এখানে বরাবর থাকে?'

গণেশ গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বলে, 'কি জানি।'

'কি জানি মানে? তুমি জানো না?'

'আজ্ঞে না বাবু, আমাদের কিছু জানবার আইন নেই।'

'ব্যাপার কি বলো তো? এখানে কিছু রহস্য-টহস্য আছে না কি?' প্রভাত উত্তেজিতভাবে বলে, 'তোমাদের মালিক যখন স্টেশন থেকে নিয়ে এলেন, তখন যে রকম ভেবেছিলাম, সে রকম তো দেখছি না।'

গণেশ এদিক ওদিক তাকিয়ে বলে, 'বেশি ভাবাভাবির দরকার কি বাবু? আছেন, থাকুন। কোনও অসুবিধে হয় জানাবেন, চুকে গেল।'

'গাড়ীতে যারা গেল, তাদের আমার ভালো লাগেনি!'

'তা বিশ্বশুদ্ধু লোককে ভালো লাগবে তার কি মানে আছে?' গণেশ ঝাড়নে হাত মুছতে মুছতে বলে, 'রেলগাড়ীতে কত লোক পাশে বসে যায়, সবাইকে আপনার ভালো লাগে? আপনি বাঙালী আপনার ভালোর জন্যেই বলছি বাবু, নিজের তালে থাকুন, সুখে থাকবেন। অন্যদিকে নজর দিতে গেলে বিপদ আছে।'

গণেশ চলে যায়। প্রভাতের মনে হয়, লোকটা নেহাৎ সামান্য চাকর নয়। কথাবার্তা বড্ড বেশি ওস্তাদমার্কা। আজও দেরি করে খেলো প্রভাত, আর হঠাৎ মনে করলো এখানে থাকবো না। চ্যাটার্জির 'আরাম কুঞ্জ' ছাড়া সত্যিই কি আর জায়গা জুটবে না? অফিস অঞ্চলে চেষ্টা দেখবো।

পেছনের বারন্দার দিকটা অন্ধকার, তার নিচেই সেই সুবিস্তীর্ণ জমি। জানলাগুলোর শিক নেই, শুধু কাঁচের শার্সি সম্বল।

নাঃ! চলেই যাবে। অস্বস্তি নিয়ে থাকা যায় না।

খাওয়ার পর চিঠি লিখতে বসলো,—'শ্রীচরণেষু কাকীমা, আশাকরি

কাকাকে লেখা আমার পৌঁছানোর সংবাদ পেয়েছেন। লিখেছিলাম বটে থাকার জায়গাটা খুব ভালো পেয়েছি, কিন্তু একটা মস্ত অসুবিধে, অফিস থেকে অনেক দূর। রোজ যাতায়াতের পক্ষে বিরাট ঝামেলা। তাই ভাবছি, অফিস অঞ্চলে একটা ব্যবস্থা করে নেবো। নতুন ঠিকানা হলেই জানাবো। ইতি—প্রভাত'।

আজও ভাবলো কাকিমাকে মল্লিকার কথাটা লিখলে হতো।

কিন্তু লিখতে গিয়ে ভাবলো কথাটাই বা কি, 'এখানে একটি মেয়ে আছে, নাম মল্লিকা, তারপর ?'

এটা কি একটা কথা ? অথচ মন থেকে তাড়ানো যাচ্ছে না।

চিঠিখানা কাল পাছে পোস্ট করতে ভুলে যায়, তাই অফিসের কোটের পকেটে রেখে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই অবাক হয়ে গেল প্রভাত। দরজায় দাঁড়িয়ে মিঃ চ্যাটার্জি।

পর্দা সরিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন স্থির হয়ে। প্রভাতের সঙ্গে চোখা-চোখি হতেই, বিনয়ে একেবারে গলে গিয়ে নীচু হয়ে বললো, 'এই দেখতে এলাম আপনার কোনও অসুবিধে হচ্ছে কিনা।'

প্রভাত ভ্রুকুটা একটু কুঁচকে বললো, 'কই, আমাকে তো ডাকেননি মিষ্টার চ্যাটার্জি!'

'আহা-হা, ডাকবো কেন, ডাকবো কেন ? তন্ময় হয়ে চিঠি লিখছিলেন! স্ত্রীকে বোধহয়!'

চ্যাটার্জির গোঁফের ফাঁকে একটু হাসি ঝলসে ওঠে। প্রভাতের গতকাল এই লোকটাকেই ঈশ্বর প্রেরিত মনে হয়েছিল, কিন্তু আজ ওর ওই অতি বিনীত ভাবটাতে গা জ্বলে গেল। তাছাড়া মনে পড়লো, মল্লিকার মামা। তাই ঈষৎ কঠিন স্বরে বলে উঠলো, 'স্ত্রী ছাড়া জগতে আর কাউকে কেউ চিঠি লেখে না ?'

'আহা-হা' লিখবে না কেন ?' আর একটু ধূর্তহাসি হাসেন চ্যাটার্জি, 'লেখে পোস্টকার্ডে, ছ'পাঁচ লাইন। আর এত তন্ময় হয়েও লেখে না। আমরা তো মশাই এটাই সার বুঝি।'

'আপনারা যা বোঝেন, হয়তো সেটাই সব নয়। চিঠি আমার কাকীমাকে লিখছি!' বলে কথার উপসংহারে সুর টেনে দেয় প্রভাত।

কিন্তু চ্যাটার্জি উপসংহারের এই ইঙ্গিত গায়ে মাখেন না। একটা অভব্য কৌতুকের হাসি মুখে ফুটিয়ে বলে ওঠেন,—'কা—কী-মা-কে! আপনি যে তাজ্জব করলেন মশাই! কাকিমাকে—চিঠি, তাও এত ইয়ে! তা কি লিখলেন ?'

প্রভাত আর শুধু ভুরু কুঁচকেই ক্ষান্ত হয় না, প্রায় ক্রুদ্ধগলায় বলে, প্রশ্নটা কি ভদ্রতাসঙ্গত হলো মিষ্টার চ্যাটার্জি ?'

'আহা-হা' চটছেন কেন ? চটছেন কেন ? এমনি একটা কথার কথা বললাম। বারোমাস যত ননবেঙ্গলী নিয়ে কারবার, দুটো খোলামেলা কথা তো কইতে পাই না। আপনি বাঙালী বলেই—যাক্‌, যদি রাগ করেন তো মাপ চাইছি।'

এবার প্রভাতের লজ্জার পালা।

ছি-ছি, বড় অসভ্যতা হয়ে গেল। হয়তো লোকটা ভাগ্নীর কাছে গিয়ে গল্প করবে! কি মনে করবে মল্লিকা তা কে জানে। আসলে লোকটা মুখ্যু! তাই ভাবভঙ্গিতে কেমন অমার্জিত ভাব। নেহাৎ পদবীটা চ্যাটার্জি তাই নইলে দেহাৎ নীচুঘরের মনে হতো!.

তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, 'না-না, রাগের কথা নয়। লক্ষ্ণৌতে কাকা-কাকীমার কাছে ছিলাম এতদিন, এসে চিঠি না দিলে কি ভালো দেখায়? তা লিখছিলাম কাকীমাকে চিঠি, বললেন স্ত্রীকে। মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল! মাথা নেই, তার মাথাব্যথা।"

'তাই নাকি? হা-হা-হা! ভারী মজার কথা বলেন তো আপনি!' চ্যাটার্জি হেসে ঘর ফাটান।

চ্যাটার্জি চলে গেল, প্রভাত ভাবতে থাকে, অকারণ বিরূপ হচ্ছি কেন? না-না, এটা ঠিক নয়। সন্দেহের কিছু নেই! রহস্যই বা কি থাকবে! লোকটা ঝুনো ব্যবসাদার, এই পর্যন্ত। জীপের সহযাত্রীরা বাঙালী নয়, এতে বিরক্তির কি আছে? অফিসে তো সে ছাড়া আর একজনও বাঙালী নেই! যাচ্ছে না প্রভাত সেখানে?

গণেশটার কথাবার্তাই একটু বেশী কায়দায়। যেন ইচ্ছে করে রহস্য সৃষ্টি করতে চায়। ওর সঙ্গে আর কথা বেশী বলার দরকার নেই।

আর—আর মল্লিকার সঙ্গেও দূরত্ব বজায় রেখে চলতে হবে। কি দরকার প্রভাতের, কার মামা তার ভাগ্নীর প্রতি অন্যায় ব্যবহার করছে, কি ন্যায় ব্যবহার করছে তার হিসেব নিতে যাওয়া!

সিদ্ধান্ত করলো খাবে, ঘুমোবে, কাজে যাবে, ব্যস!

মনটা ভালো করে দরজা বন্ধ করে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লো প্রভাত! ঘড়িতে দেখলো রাত পৌনে দশটা।

কিন্তু প্রভাতের নিশ্চিন্ততার সুখ যে ঘণ্টা কয়েক পরেই এমন ভাবে ভেঙে যাবে, তা কি সে স্বপ্নেও ভেবেছিল? ঘণ্টা কয়েক!

ক'ঘণ্টা? পৌনে দশটার পর শুয়ে কতক্ষণ ঘুমিয়েছে প্রভাত? ঘুমের

মধ্যে সময় নির্ণয় হয় না, তবু প্রভাতের মনে হলো ঘণ্টা তিন-চার পার হয়েছে!

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল জানলার কাঁচে খুব দ্রুত আর জোরে একটা টকাটক শব্দে! পেছনের খোলা বারান্দার দিকের জানালা।

ভয়ে বুকটা ঠাণ্ডা মেরে গেল প্রভাতের, ঝপ্ করে বেড সুইচটা টিপে আলোটা জ্বেলে ফেলে কম্পিত বক্ষে সেই দিকে তাকালো।

কে, ও!

চোর ডাকাত? খুনে গুণ্ডা?

জানলা ভেঙে ফেলবে? অশরীরী যে একটা আতঙ্ক তাকে পেয়ে বসেছিল সেটা তাহলে ভুল নয়। না কি সেই বাঘের চাইতে ভয়ঙ্কর কুকুর-গুলোই কোনও একটা কাঁচ আঁচড়াচ্ছে! কিন্তু তাই কি?

এতো নির্ভুল মানুষের আওয়াজ! যেন সাঙ্কেতিক।

কাঁচ ভেদ করে গলার শব্দ আসে না, তাই বোধহয় ওই শব্দটাই অবলম্বন করেছে।

কেউ কোনো বিপদে পড়েনি তো! দেখবে না কি! না দেখলেও তো বিপদ আসতে পারে। ঈষৎ ইতস্ততঃ করে প্রভাত বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে জানলার কাছে গিয়ে পর্দাটা সরাতে গিয়েই চমকে উঠলো।

কি সর্বনাশ, এ যে মল্লিকা! কোনো বিপদে পড়েছে তাহলে!

মল্লিকা এতক্ষণ ব্যাকুল আবেদন জানাচ্ছে, আর প্রভাত বোকার মত বিছানায় শুয়ে ভয়ে-ভয়ে কাঁপছে? কি বিপদ! কুকুরে তাড়া করেনি তো?

কি ভাবে যে জানালার ছিটকিনিটা খুলে ফেলেছিল প্রভাত তা আর মনে নেই। শুধু দেখতে পায় জানলা খোলার সঙ্গে-সঙ্গেই মল্লিকা উদ্‌ভ্রান্তের মত ঝুপ্ করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে জানালাটা ফের বন্ধ করে দিয়ে আর পর্দাটা টেনে দিয়ে প্রভাতের বিছানার ধারে বসে হাঁপাচ্ছে।

প্রভাত চিত্রাপিত পুত্তলিকাবৎ। এ কি? এর মানে কি!

হাঁপানো থামলে মল্লিকা কাতর বচনে বলে, 'মিষ্টার গোস্বামী, আমায় ক্ষমা করুন, দয়া করে আলোটা নিভিয়ে দিন।'

প্রভাত প্রায় অচেতন মত এই অভূতপূর্ব ঘটনার সামনে দাঁড়িয়েছিল। রাত দু'টোর সময় তার বিছানার ওপর একটি সুন্দরী তরুণী! এ স্বপ্ন, না মায়া?

কথা কইলে বুঝি এ স্বপ্ন ভেঙে যাবে, এ মায়া মুছে যাবে।

ভেঙে গেল স্বপ্ন, মুছে গেল মায়া! প্রবল একটা ঝাঁকুনি খাওয়ার মত চমকে উঠলো প্রভাত।

কি বলছে বেপরোয়া মেয়েটা···দয়া করে আলোটা নিভোন!

প্রভাত প্রায় চেঁচিয়ে উঠে, 'কি বলছেন আপনি?'

'মিষ্টার গোস্বামী, কি বলছি, তার বিচার পরে করবেন যদি আমাকে বাঁচাতে চান—'

হঠাৎ নিজের হাত বাড়িয়ে আলোটা নিভিয়ে দেয় মল্লিকা। বিছানার উপর ভেঙে পড়ে চাপা কান্নায় উদ্বেল হয়ে ওঠে।

আর সেই অন্ধকার ঘরের মাঝখানে প্রভাত বাক্‌শক্তিহীন ভূতের মত দাঁড়িয়ে থাকে।

কতক্ষণ? কে জানে কতক্ষণ! হয়তো বা কত যুগ!

যুগ-যুগান্তর পরে কান্নার শব্দ স্তিমিত হয়, অন্ধকারেও অনুভব করতে পারে প্রভাত, মল্লিকা উঠে বসেছে।

কান্নাভেজা গলায় আস্তে কথা বলে মল্লিকা, 'মিষ্টার গোস্বামী, আপনি হয়তো আমাকে পাগল ভাবছেন!'

ভূতের মুখে বাক্য ফোটে।

'আপনাকে কি নিজেকে, কোনওটাই ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'আপনি ধারণা করতে পারবেন না মিষ্টার গোস্বামী, কি অবস্থায় আমি এভাবে আপনাকে উত্যক্ত করতে এসেছি!'

অবস্থাটা যদি এত ভয়াবহ না হতো শুধু স্নায়ু নয়, অস্থি-মজ্জা পর্যন্ত এমন করে সেঁঠিয়ে না উঠতো, তাহলে হয়তো প্রভাত সহানুভূতিতে গলে পড়তো, কি ব্যাপার ঘটেছে জানবার জন্যে ব্যাকুলতা প্রকাশ করতো। কিন্তু অবস্থাটা ভয়াবহ!

তাই প্রভাতের কণ্ঠ থেকে যে স্বর বার হয়, সেটা শুকনো আবেগশূন্য— 'সত্যিই ধারণা করতে পারছি না। কিন্তু দয়া করে আলোটা জ্বালাতে দিন, অবস্থাটা অসহ্য লাগছে।'

'না-না-না!' মল্লিকা প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে, 'চলে যাবো, ভোর হলেই চলে যাবো আমি। শুধু ঘণ্টা কয়েকের জন্যে আশ্রয় দিয়ে বাঁচান আমাকে।'

'কিন্তু মল্লিকা দেবী, আপনার এই বাঁচা-মরার ব্যাপারটা তো কিছুতেই বুঝতে পারছি না আমি।'

'পারবেন না! সে বোঝবার ক্ষমতা আপনাদের পুরুষদের থাকে না। তবু কল্পনা করুন, বাঘে তাড়া করেছে আমাকে।'

'বাঘে!'

'বাঘে!' অস্ফুট একটা আওয়াজ বার হয় প্রভাতের মুখ থেকে। ভাবার

অন্তর্নিহিত অর্থ অনুধাবন করবার আগেই পেছনের সেই পাহাড়ের কোল পর্যন্ত প্রসারিত অন্ধকার তৃণভূমির দৃশ্যটা মনশ্চক্ষে ভেসে ওঠে তার, আর অস্ফুট ওই প্রশ্নটা উচ্চারিত হয়।

অন্ধকারে অসহনীয় ধাক্কাটা বুঝি ক্রমশঃ সহনীয় হয়ে আসছে, ভেন্টিলেটার দিয়ে আসা দূরবর্তী কোন আলোর আভাস ঘরের চেহারাটা পরিস্ফুট করে তুলেছে। হাসির শব্দটা লক্ষ্য করে অনুমান করতে পারছে প্রভাত, মল্লিকার মুখে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের রেখা। সেই রেখার কিনারা থেকে উচ্চারিত হলো, 'হ্যাঁ বাঘই! শুধু চেহারাটা মানুষের মত।'

স্তব্ধতা! দীর্ঘস্থায়ী একটা স্তব্ধতা!

তারপর একটা নিশ্বাসের সঙ্গে উচ্চারিত হয়, 'এ' রকম পরিবেশে এই-রকম ঘটনা ঘটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বলতে পারেন, এত রাত্রে আপনি নিজের ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়েছিলেন কেন?'

আবার মিনিটখানেক নিস্তব্ধতা, তারপর মল্লিকার ক্লান্ত করুন স্বর ধ্বনিত হয়, 'এই আমার ললাটলিপি, মিষ্টার গোস্বামী! চাকর-বাকর শুয়ে পড়ে, আমাকে তদারক করে বেড়াতে হয় আগামী ভোরের রসদ মজুত আছে কি না! হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়ে মনে পড়লো, স্টোরে সকলের ব্রেক-ফাস্টের উপযুক্ত ডিম নেই। তাই মুরগীর ঘর তল্লাস করতে গিয়েছিলাম! মিষ্টার গোস্বামী কেন জানি না আমার হঠাৎ মনে হলো আপনার ঘরটাই নিরাপদ আশ্রয়।"

'অদ্ভুত মনে হওয়া! মল্লিকা দেবী, আমিও একজন পুরুষ, এটা বোধ-করি আপনি হিসেবের মধ্যে আনেননি!'

'এনেছিলাম! সঙ্গে এটাও স্থির করেছিলাম, আপনি মানুষ!'

'আপনার এই বিশ্বাসের জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু এটা কেন ভাবছেন না, হঠাৎ যদি কারো চোখে পড়ে আপনি আমার ঘরে, এবং আলো নিভানো ঘরে, তা'হলে অবস্থাটা কি হবে? আমার কথা থাক, আপনার দুর্নাম-সুনামের কথাই ভাবুন!'

'ভাবছি! বুঝতে পারছি,' মল্লিকা আরও ক্লান্তগলায় বলে, 'কিন্তু তবু তো সে মিথ্যা দুর্নাম। সত্যিকার বিপদ নয়। বাঘের কামড় নয়।'

অন্ধকারে জিনিসপত্র বাঁচিয়ে বারকয়েক পায়চারী করে প্রভাত, তারপর দৃঢ়স্বরে বলে 'কিন্তু সেই বদ্‌লোকটা যে কে, আপনার চেনা দরকার ছিল আপনার মামাকে তার স্বরূপ চিনিয়ে দেওয়া উচিত ছিল।'

'মামাকে! আমার মামাকে!' মল্লিকা আর একবার কান্নায় ভেঙে পড়ে 'আমার মামাকে আপনি চেনেন না, তাই বলছেন! মামা তাঁর খদ্দেরকে

খুসি করতে, নিজেই আমাকে বাঘের গুহায় ঠেলে দিতে চান—

'মল্লিকা দেবী!'

তীব্র একটা আর্তনাদ ঘরের স্তব্ধতাকে খান খান করে ফেলে!

না! সে আর্তনাদের শব্দ কারও কানে প্রবেশ করে ভয়ঙ্কর একটা কেলেঙ্কারী সৃষ্টি করেনি। মোটা কাপড়ের পর্দা ঘেরা কাঁচের জানালা ভেদ করে কারো নিশ্চিন্ত ব্যাঘাত ঘটায়নি। এখন সকাল। এখন প্রভাত এসে দাঁড়িয়েছে সেই ভয়ঙ্কর সুন্দর প্রকৃতির দৃশ্যের সামনে। গত দু'দিন শুধু সামনেই তাকিয়ে দেখেছে মুগ্ধ দৃষ্টিতে। আজ দু'পাশে যতদূর দৃষ্টি চলে দেখতে থাকে। ডানদিকে নীচু জমিতে ওই চালাঘরটা তা'হলে মুরগীর ঘর। ওর জালতির দরজাটা সন্দেহের নিরসন করছে।

রাত দু'টোর সময় ওইখানে নেমেছিল মল্লিকা ডিমের সন্ধানে।

মল্লিকা কি পাগল? কথাটা কি বিশ্বাসযোগ্য? মল্লিকা কি একটা গল্প বানিয়ে বলে গেল! কিন্তু তাও কি সম্ভব।

চিরদিন সাধারণ ঘর-গেরস্থীর মধ্যে মানুষ নিঃসন্দিগ্ধচিত্ত প্রভাতের ওই সন্দেহটাকে 'সম্ভব' বলে মনে করতে বাধে।

তবে চ্যাটার্জির যে রূপ উদ্‌ঘাটিত করলো মল্লিকা, সেটাকে 'অসম্ভব' বলে উড়িয়ে দেবে, এত অবোধ সরলও নয় প্রভাত জগতের ভয়াবহ রূপ প্রত্যক্ষ না দেখুক, জানে বৈকি!

স্বার্থের প্রয়োজনে স্ত্রীকে-কন্যাকে-বোনকে সর্বনাশের পথে ঠেলে দেয়, জগতে এমন পুরুষের অভাব নেই একথা প্রভাত জানে না এমন নয়। এই-দণ্ডে ওই পিশাচ লোকটার আশ্রয় ত্যাগ করে চলে যেতে ইচ্ছে করছে তার। কিন্তু!

কিন্তু কি এক অমোঘ-অদৃশ্য বন্ধনে বাঁধা হয়ে গেল সে। তাই ভাবছে, মল্লিকাকে সে কথা দিয়েছে এখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে। এই নরক, এই হিংস্র জানোয়ারের গুহা থেকে।

অথচ জানে না কেমন করে রাখবে সেই প্রতিজ্ঞা! কাল নিরীক্ষণ করে দেখার দরকার হয়নি, আজ দেখছে। সমস্ত সীমানাটা কাঁটাতারের বেড়ায় ঘেরা. সেই ব্যাঘ্রসদৃশ কুকুরগুলো চোখে দেখিনি বটে, কিন্তু রাত্রে তাদের গর্জন মাঝে-মাঝে কানে এসেছে।

রাতে যাওয়া হয় না। তাছাড়া যানবাহন কোথা? সেই চ্যাটার্জির জিপ্‌গাড়ীই তো একমাত্র ভরসা। এক যদি মল্লিকা শহরের দিকে যাবার কোনও ছুতো আবিষ্কার করতে পারে।

কিন্তু মল্লিকা বলেছে অসম্ভব!

'কিন্তু তুমি তো মামার সঙ্গে রোজ স্টেশনে যাও লোক ধরতে!' বলেছিল প্রভাত।

'হ্যাঁ, মামার সঙ্গে। মল্লিকা মৃদু তীক্ষ্ণ একটু হেসেছিল।'

তবু তাকে আশ্বাস দিয়েছে প্রভাত।

প্রভাত নয়, প্রভাতের শিরায়-শিরায় প্রবাহিত পুরুষের রক্ত, যে রক্ত পুরুষানুক্রমে মধ্যবিত্ত জীবনের দায়ে স্তিমিত হয়ে গেলেও একেবারে মরে যায়নি।

আশ্বাস দিয়েছে সেই রক্ত। আশ্বাস দিয়েছে তার যৌবন।

চায়ের সময় হয়ে গেছে, প্রভাত এখনো নিজেকে প্রস্তুত করে নেয়নি। আকাশের আলো ফুটতে না ফুটতেই বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে!

এখন ফের ঘরে এলো। সাবান-তোয়ালে-টুথব্রাশ নিয়ে সংলগ্ন স্নানের ঘরের দিকে এগোতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো।

তাকিয়ে দেখলো বিছানাটার দিকে। রাত দু'টোর পর আর শোয়া হয়নি প্রভাতের। শোবার সময় হয়নি, হয়তো বা সাহসও হয়নি। এখন তাকিয়ে দেখছে কোথায় বসেছিল সেই ক্রন্দনবতী। কোনখানটায় আছড়ে পড়ে চোখের জলে সিক্ত করে তুলেছিল।

সত্যিই কি এসেছিল কেউ? নাকি প্রভাতের স্বপ্নকল্পনা? চমকে বিছানার কাছে এগিয়ে এলো। বালিশের গায়ে একগাছি লম্বা চুল!

ঈশ্বর রক্ষা করেছেন! এখুনি চাকরবাকর বিছানা ঝাড়তে আসছে।

এ দৃশ্য যদি তাদের চোখে পড়তো! চারদিকে সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে ফেলে দেখলো আর কোথাও কিছু আছে কি না!

নেই। নিশ্চিন্ত হওয়া যায়! কিন্তু?

সমস্ত নিশ্চিন্ততা ছাপিয়ে মল্লিকার একটা কথা মাথার মধ্যে কাঁটার মত বিঁধছে।

তাঁকে এ কথা কেন বললো মল্লিকা?

কথাটা আবার মনের মধ্যে স্পষ্ট পরিষ্কার উচ্চারণ করলো প্রভাত। নতুন করে আশ্চর্য হলো।

প্রতিজ্ঞা! প্রতিজ্ঞা করেছেন? পুরুষের প্রতিজ্ঞা? আপনি কি সত্যি পুরুষ? তীব্র তীক্ষ্ণ ছুরির ফলার মত একটু হেসেছিল মল্লিকা এই প্রশ্নের সঙ্গে।

কোন কথার পিঠে এ প্রশ্ন উঠেছিল তা মনে পড়ছে না প্রভাতের। বোধকরি প্রভাতের প্রতিজ্ঞামন্ত্র পাঠের পর। না কি তাও নয়?

না, তা নয়। বোধহয় চলে যাবার আগে। হ্যাঁ তাই। চলে যাবার

আগে ফিরে দাঁড়িয়ে বলে উঠেছিল, প্রতিজ্ঞা করেছেন পুরুষের প্রতিজ্ঞা? কিন্তু আপনি কি সত্যি পুরুষ?

এ কিসের ইঙ্গিত।

মল্লিকার করুণ অভিব্যক্তি আর ভয়াবহ ভাগ্যের পরিচয়ের সঙ্গে ওই হাসি আর প্রশ্নের সামঞ্জস্য কোথায়।

যথারীতি গণেশ এলো। প্রভাত বিনা প্রশ্নে চায়ের ট্রে-টা কাছে টেনে নিলো। কিন্তু তবু চোখে না পড়ে পারলো না কেমন একরকম তাকাচ্ছে, আর মিটি মিটি হাসছে গণেশ?

কেন, ওরকম করে হাসছে কেন ও? ও কি ঘরে ঢুকেছিল?

দীর্ঘ বেণী থেকে খসে পড়া কোনও দীর্ঘ অলক আর কোথাও কী চোখে পড়েছে ওর?

কোনো বাক্য বিনিময় হলো না অবশ্য। কিন্তু গণেশের ওই চোরা রঙের চাউনিটা গায়ে জ্বালা ধরিয়ে গেল।

আর একদণ্ড এখানে থাকতে ইচ্ছে করছে না।

কি হয়, ওই অফিস যাবার মুখেই যদি প্রভাত বিল মিটিয়ে দিয়ে মালপত্র নিয়ে চলে যায় 'ওবেলা আসবো না' বলে?

ভালোমন্দ যাইহোক হোটেল জুটবেই। এরকম 'হিংস-সুন্দরে' তার দরকার নেই। এর অন্তরালে কোথাও যেন বিপদের চোরা গহ্বর, এর শিরায় যেন ভয়াবহ রহস্যের জাল পাতা।

চ্যাটার্জি লোকটা নোংরা, নীচু, ইতর, কুৎসিত! খদ্দেররা সৎ নয়।

নির্ঘাৎ রাত্রে এখানে মাতলামি চলে, নোংরামি চলে, জুয়ার আড্ডা বসে। হয়তো বা কালোবাজারের হিসেব-নিকেশ হয়, হয়তো খাদ্যে আর ওষুধে কি পরিমান ভেজাল দেওয়া সম্ভব, তারই পরিকল্পনা চলে।

চ্যাটার্জি এদের পালক পোষক!

কি কুক্ষণেই স্টেশনে চ্যাটার্জির কবলে পড়েছিল প্রভাত। একবার ভেবে চিন্তে দেখলো না, যার সঙ্গে যাচ্ছি সে লোকটা কেমন?

কি নির্বোধ। কিন্তু শুধু ওইটুকুই নিবুদ্ধিতা।

কি চরম নির্বুদ্ধিতা দেখিয়েছে কাল রাত্রে।

তুমি প্রভাত গোস্বামী, বিদেশে এসেছো চাকরি করতে। কি দরকার ছিল, তোমার নারী-রক্ষার নায়ক হতে যাবার। কোন সাহসে তুমি একটা অসহায় বন্দিনী মেয়েকে ভরসা দিতে গেলে বন্ধন মোচনের যে মেয়ের রক্ষকই ভক্ষক। জগতে এমন কত লক্ষ লক্ষ মেয়ে পুরুষের বন্দিনী।

প্রভাত ভাবতে লাগলো, সে সুটকেশ গুছিয়ে চলে যাবে কি না?

আছেই কি বা ! এই তো সুটকেস, বিছানা আর আল্‌নায় ঝোলানো দু'-একটা পোষাক। দু'মিনিটে টেনে নিয়ে গুছিয়ে ফেলা যায়। টিফিনের বাক্সটা তো জিপেই আছে ! মল্লিকা তো চোখের আড়ালে।

মল্লিকার সঙ্গে তো জীবনে আর চোখাচোখি হবে না !

আল্‌নার জামাটায় হাত দিতে গেল।

আর মুহূর্তে অন্তরাত্মা 'ছি-ছি' করে উঠলো।

প্রভাত না মানুষ ? ভদ্ররক্ত গায়ে আছে না তার ?

অফিসে গিয়ে মনে হলো, কাকীমার চিঠিটায় মল্লিকা সম্পর্কে দু' লাইন জুড়ে দিয়ে পোস্ট করবে।

পকেট থেকে বার করতে গেল, পেল না। কি আশ্চর্য, কোথায় চিঠিটা ? নিশ্চিন্ত মনে পড়ছে কোটের পকেটে রেখেছিল !

কিছুতেই ভেবে পেল না, পড়ে যেতে পারে কি করে ! কোটটা হ্যাঙ্গার থেকে তুলে নিয়েছে, গায়ে চড়িয়েছে, গাড়িতে উঠেছে, গাড়ি থেকে নেমে অফিসে ঢুকেছে। এর মধ্যে কি হারানো সম্ভব !

চিঠিটা তুচ্ছ, আবার লেখা যায়, হারানোটা বিস্ময়কর !

কিন্তু আরও কত বিস্ময় অপেক্ষা করছিল প্রভাতের জন্য, তখনও জানে না প্রভাত। সে বিস্ময় স্তব্ধ করে দিলো খাবারের কৌটো খোলার পর। সিপাহী বিদ্রোহের সময় নাকি 'চাপাটি' হয়ে উঠেছিল সঙ্কেত প্রেরণের মাধ্যম ! ইতিহাসের সেই অধ্যায়টাই কি মল্লিকা কাজে লাগালো ?

রুটির গোছার নীচে সাদা একটা কাগজের মোড়ক ! এটা কি !

টেনে তুললো। খুলে পড়েই স্তব্ধ হয়ে গেল।

'দয়া করে রাত্রে জানলাটা খুলে রাখবেন !'

অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে ছিঁড়ে ফেলল টুকরোটা। না, না, না ? কিছুতেই না !

এ কি কুৎসিৎ জালে জড়িয়ে পড়েছে সে !

মল্লিকা কি ! ও কি সত্যি বিপন্না না মায়াবিনী।

ভদ্রমেয়ের এত দুঃসাহস হয় ?

কিন্তু সেই কান্না ? সে কি মায়াবিনীর কান্না।

রাত্রে প্রতিজ্ঞা করলো, তবু বিচলিত হবে না সে। জানলা খুলে রাখবে না। কে বলতে পারে বিপদ কোন পথ দিয়ে আসে। তার কি মোহ আসছে ?

মায়ের মুখ স্মরণ করলো। প্যাড টেনে নিয়ে লিখতে বসলো মাকে। লেখা চিঠিটা আজ কোটের পকেটে রাখলো না, নিজের অফিসের ব্যাগে

রেখে দিলো। নিশ্চিন্ত হয়ে শুলো।

কিন্তু ঘুমের কি হলো আজ? কিছুতেই কেন শান্তির স্নিগ্ধতা আসছে না। কি এক অস্বস্তিতে উঠে বসতে ইচ্ছে করছে।

পাখার হাওয়াটা যেন ঘরের উত্তাপে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। বিছানায় যেন ছুঁচ ফুটছে। মাথাটা ঝাঁ-ঝাঁ করছে। জানালাটা একেবারের জন্যে খুলে দিয়ে এই উত্তপ্ত বাতাসটা বার করে দিলে ক্ষতি কি?

মনস্থির করে উঠে বসলো। জানালাটার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে মুহূর্তে চিন্তা করে খুলে ফেললো ছিট্‌কিনিটা, ঠেলে দিলো কপাটটা।

হু-হু করে স্নিগ্ধ বাতাস এসে ঢুকছে, জুড়িয়ে যাচ্ছে শরীর, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ঘুম এসে যাচ্ছে যেন।

আশ্চর্য! অন্য-অন্য কটেজগুলোর জানালা সব খোলা! ওদের ভয় করে না? চোর, ডাকাত, বন্য জন্তুর?

প্রভাত ভাবলো ওরা সকলে অবাঙালী। ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে বাক্সর মধ্যে ঘুমানোর কথা ভাবতেই পারে না ওরা।

প্রভাত কি ভীতু! থাক খোলা, কি হয় দেখাই যাক না!

কিন্তু কি দেখতে চায় প্রভাত? দেখা গেল কিছুক্ষণ পরে। আর প্রভাতের মনে হলো, মল্লিকা কি জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকতে অভ্যস্ত?

'মল্লিকা দেবী, এ'রকম অসম সাহসিকতা করছেন কেন?'

'কি করবো? কখন কথা বলবো আপনাকে?'

আজও ভেঙে পড়ে মল্লিকা, 'দিনের বেলায় চারদিকে পাহারা। ওই গণেশটা হচ্ছে মামার চর। সহস্র চক্ষু ওর। শুধু এই রাত্তিরে তাড়ি খেয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকে।'

'কিন্তু কি বলবেন তাড়াতাড়ি বলুন।'

'আশ্চর্য! আশ্চর্য আপনি।' মল্লিকার তীক্ষ্ণকণ্ঠ ধিক্কার দিয়ে ওঠে, 'আপনি কি শুকদেব?'

'মল্লিকা দেবী। আপনার ওদের থেকে আমার শ্রদ্ধা কেড়ে নেবেন না।'

মল্লিকা সংযত হয়। ক্ষুব্ধহাস্যে বলে, 'কি জানেন, পুরুষের একটা রূপই দেখেছি, তাই সেটাই স্বাভাবিক মনে হয়। আর ভালো কথা, সভ্য, সুশ্রী কথা কবে শিখলাম বলুন? সেই আট বছর বয়স থেকে মামার হোটেলের চাকরাণীগিরি করছি। মামার হুকুমে তাঁর খদ্দেরদের আকর্ষণ করতে—'

'থাক। শুনতে কষ্ট হচ্ছে। আজ আপনার কি বক্তব্য সেটাই শুনি।'

মল্লিকা খাটের বাজু ধরে দাঁড়িয়ে আছে। জানালা দিয়ে ছায়া ছায়া জ্যোৎস্না আসছে। ওকে মনে হচ্ছে বন্দিনী রাজকন্যা!

তবে—আজ ওর গলা কান্নায় ভেজা নয়। ক্লান্ত-বিষণ্ণ-মধুর।

'মিষ্টার গোস্বামী, আজ আমি কিন্তু নিজের স্বার্থে আসিনি। এসেছি আপনাকে সাবধান করতে। কিন্তু তার আগে প্রশ্ন করছি, রোজ আপনি কি এত লেখেন?'

'লিখি? লিখি মানে? চিঠি লিখি।'

'কাকে? কাকে এত চিঠি—'

প্রভাত বিরক্ত কণ্ঠে বলে 'কেন বলুন তো? এ কি অদ্ভুত কৌতূহল আপনাদের! আপনার মামাও কাল নানান জেরায়—আপনাদের খাতায় এ নিয়মটাও তাহলে লিখে রাখা উচিত ছিল, এখানে থাকতে হলে বাড়ীতে চিঠি লেখা নিষেধ।'

'আপনি রাগ করছেন! কিন্তু জানেন, মামার সন্দেহ হয়েছে আপনি পুলিশের লোক!'

'চমৎকার!'

'ওই তো! গণেশ খবর দিচ্ছে আপনি লিখছেন। মামার ভাবনা এগুলো আপনি রিপোর্ট লিখছেন। কারণ প্রথম দিন এসে নাকি নানা অনুসন্ধান করেছিলেন।'

'আরও চমৎকার লাগছে!'

'রাগ করলেও সাবধান হোন, এই অনুরোধ। মামার এখানে অনেক রকম ব্যাপারই তো চলে। বলতে গেলে বেআইনী কাজের ঘাঁটি।'

'হুঁ। সেইরকমই সন্দেহ হচ্ছিল।'

'হওয়াই স্বাভাবিক। আপনি সরল হলেও নির্বোধ নন। কিন্তু জানিয়ে রাখি শুনুন, কিছুদিন আগে আপনারই মতো একটি বাঙালী ছেলে বোর্ডারের ছদ্মবেশে এসে বাসা নিয়েছিল টিকটিকিগিরি করতে। কিন্তু সে আর ফিরে যায়নি।'

'মল্লিকা দেবী!'

মল্লিকা কিন্তু এ আর্তনাদে বিচলিত হয় না! তেমনি দার্শনিক ভঙ্গীতে বলে, হ্যাঁ! তাই। ওই জঙ্গলের দিকে অনুসন্ধান করলে হয়তো তার হাড়ের টুকরো পাওয়া যেতে পারে।'

বিচলিত প্রভাত সহসা আত্মস্থভাবে বলে, 'কিন্তু কি করে বুঝবো আপনিও মামার চর নয়?'

'কি করে বুঝবেন!' মৃঢ় শোনায় মল্লিকার কণ্ঠস্বর!

'হ্যাঁ! বিশ্বাস কি? যেখানে এত সতর্ক চক্ষু, সেখানে কিভাবে আপনি রাত্রিকালে একজন যুবকের ঘরে—'

হঠাৎ প্রায় শব্দ করে হেসে ওঠে মল্লিকা।

'সেটাই তো ছাড়পত্র মিষ্টার গোস্বামী। ওরা সন্দেহ করেছে আর অনুমান করছে আমি আপনার প্রেমে পড়েছি। আর প্রেমে পড়াই একটা অর্থই ওরা জানে। কিন্তু আমি অনুরোধ করছি, আপনি এখান থেকে পালান। মামাকে বলবেন, অফিসের দূরত্বের জন্যেই—'

প্রভাত আর একবার চেয়ে দেখে। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ রাত্রির গভীরে আরও পরিস্ফুট হচ্ছে। মল্লিকাকে অলৌকিক দেখাচ্ছে।

ক্ষণপূর্বের কটু মন্তব্যের জন্য নিজেকে ধিক্কার দিলো প্রভাত। তারপর দৃঢ়কণ্ঠে বললো, 'কিন্তু গতকাল তো একথা হয়নি, আমি একা পালাবো।'

'কাল আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। এই নরকের মধ্যে আর শাসনের মধ্যে বাস করতে করতে মাঝে মাঝে বুদ্ধিবৃত্তি নষ্ট হয়ে যায়। তাই তা অসম্ভব—'

'কিন্তু আমি যদি সম্ভব করতে পারি।'

'চেষ্টা করতে যাবেন না, মারা পড়বেন।'

'মল্লিকা! যদি আমি খোলাখুলি তোমার মামার কাছে প্রস্তাব করি, যে আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।'

আর বুঝি দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না মল্লিকা। বসে পড়ে বলে, 'আপনি? আপনি কি পাগল? এ প্রস্তাবের সঙ্গে-সঙ্গে খুন হয়ে যাবেন, তা জানেন?'

'খুন?'

'তা-না তো কি? জানেন না, বুঝতে পারেননি, আমিই মামার শিকার ধরার সবচেয়ে দামী টোপ।'

'বেশ, তবে লুকানো রাস্তাই ধরতে হবে'।

'শুধু, তুমি রাজী কিনা—'

'আমি রাজী কিনা—শুধু আমি রাজী কিনা?

একটা প্রবল বিক্ষোভের সঙ্গে সঙ্গে সহসা কি একজোড়া হিম শীতল সাপ এসে আছড়ে পড়লো প্রভাতের ওপর? আর তারা প্রভাতকে বেষ্টন করে ধরলো দৃঢ় বন্ধনে? কিন্তু নাগপাশের বিভীষিকা নিয়েও বন্ধন কেমন করে এমন আবেগময় হয়ে উঠতে পারে?

'মল্লিকা?'

'চেষ্টার অসাধ্য কাজ নেই' এ কথাটা সব ক্ষেত্রে সত্য হয় কিনা জানি না, কিন্তু প্রভাতের পক্ষে হলো।

ভালোমানুষ প্রভাত, মধ্যবিত্ত গৃহস্থমনা প্রভাত, অদ্ভুত পরিবেশের মধ্যে একটা অসাধ্য সাধনই করে বসলো।

কিন্তু এই অসাধ্য সাধন কি সত্যই প্রেমের আকর্ষণে।

প্রভাত এমন করেই একটা হোটেলওয়ালি মেয়ের প্রেমে পড়ে গেল যে, ভয় ভাবনা ত্যাগ করে ফেলল। মস্ত একটা বিপদের ঝুঁকি নিতে পিছপা হলো না?

তিনদিনে এমন প্রেমের সৃষ্টি হওয়া সম্ভব? হয়তো তা নয়।

মল্লিকার রূপ-যৌবন একটা মোহের সঞ্চার করলেও প্রভাতের ভদ্রচিত্তের কাছে সেই আবেদনই শেষ কথা হয়ে ওঠেনি।

মানবিকতার প্রশ্নটাও ছোট নয়।

মল্লিকার অশ্রুজলের আবেদন, একটি নিঃসহায়া নিরুপায় মেয়ের জীবনের অনিবার্য শোচনীয়তা প্রভাতকে বিচলিত করে তুললো।

তাই হঠাৎ মোহে নয়, যা করলে জেনে শুনেই করলো।

মল্লিকা যে নিষ্কলঙ্ক নয়, মামার শিকারের টোপ হবার জন্যে ওকে যে অনেক খোয়াতে হয়েছে, এ বুঝতে ভুল হয়নি প্রভাতের।

তবু সে মানবিকতার সঙ্গে যুক্তি আর বুদ্ধিকেও কাজে লাগিয়েছে। ভেবেছে যুগটা আধুনিক। এ যুগের সভ্যজগতের নিয়ম নয়, মানুষকে বাছা আর দুধের মত 'নষ্ট হয়ে গেছে' বলে ফেলে দেওয়া।

ভেবেছে এখন বিধবা বিয়ে করছে লোকে। বিবাহ বিচ্ছেদের সমুদ্র পার হওয়া মেয়েকে বিয়ে করছে?

ভেবেছে, ও তো মানসিক পাপে পাপী নয়।

দুর্ভাগ্য যদি ওকে নিদারুণতার মধ্যে নিয়ে গিয়ে ফেলে থাকে, সে দোষ কি ওর। একটা মানুষকে যদি পঙ্কের মধ্যে থেকে উদ্ধার করে নিয়ে গিয়ে সুন্দর জীবনের বৃন্তে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে প্রভাত, সে কাজে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের আশীর্বাদ পাবে।

তবু মিথ্যা কৌশল অনেক করতে হলো বৈকি। প্রভাতকে কলকাতা থেকে বন্ধু মারফৎ 'মায়ের মারাত্মক অসুখ' বলে টেলিগ্রাম আনিয়ে ছুটি মঞ্জুর করতে হলো, আর মল্লিকাকে স্টেশনের ধারে টাঙ্গা থেকে পড়ে গিয়ে 'পায়ের-হাড় ভাঙতে' হলো।

অসহ্য যন্ত্রণার অভিনয়ে অবশ্য মল্লিকাও কম পারদর্শিতা দেখায়নি।

চ্যাটার্জি তাকে হিঁচড়ে টানার তুলবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু জায়গাটা স্টেশন। অনেক লোকের ভিড়। তাদের পরামর্শে চাপে দাত কিড়মিড় করতে করতে ভাগ্নীকে হাসপাতাল নিয়ে যেতে হলো চ্যাটার্জিকে, আর 'ডাক্তার নেই, চারটের সময় আসবেন। রেখে যান'—নার্সের হুকুমও মানতে হলো।

তারপর? উৎকোচের পথেও আসতে হয়েছে বৈকি। উৎকোচ আর ধরাধরি এই দুই পথেই তো অসাধ্যসাধন হয়। এই তো জগতের সবচেয়ে সেরা পথ। ট্রেনে চড়ে বসার পর আর ভয় করে না। চ্যাটার্জি কি নিজের ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে ভাগ্নী খুঁজতে বেরোবে।

আর পুলিশ? তার কাছে জবাব আছে মল্লিকা নাবালিকা নয়।

আর ততদিনে—পুলিশ যতদিনে খুঁজে পাবে, হয়তো রেজেষ্ট্রি করেই ফেলতে পারবে।

রেজেষ্ট্রি? হ্যাঁ, ওটা চাই। টাই তো রক্ষামন্ত্র তারপর অনুষ্ঠানের বিয়েও হবে বৈকি! প্রভাত বলে 'ওটা নাহলে মন ওঠে না। সেই যে ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি—'

মল্লিকাও তার স্বপ্নসাধের কথা বলে, 'জানো, ছেলেবেলায় এক পিসতুতো দিদির বিয়ে দেখেছিলাম, সেই থেকে সেইরকম 'কনে' হবার যে কি সাধই চেপে বসেছিল মনে, খেলাঘরে বিয়ে-বিয়ে খেলতাম। কনে হয়ে ঘোমটা দিতাম! ঘোমটা খুলে অদৃশ্য অদেখী বরের দিকে চোখ খুলে তাকালাম!'

'উঃ, ওইটুকু বয়েস কম পাকা তো ছিলে না?' প্রভাত হেসে ওঠে।

চলন্ত ট্রেনের কামরা। জানালা দিয়ে হু-হু করে দুরন্ত বাতাস আসছে, মল্লিকা গল্প করছে তার ছেলেবয়েসে দুরন্তপনার কথা।

কেমন করে গাছে চড়ে বসে থেকে মা'কে নাজেহাল করতো। কেমন করে পারানির মাঝিদের সঙ্গে ভাব করে নৌকায় চড়ে গঙ্গার এপার ওপার হতো।

হ্যাঁ, গঙ্গার তীরেই গ্রাম। যোগের স্নানে লোক আসতো এ-গ্রাম ও-গ্রাম থেকে। মল্লিকা সেই ভীড়ে মিশে মেলা তলায় ঘুরতো।

আবার মা'র সঙ্গে মা'র কাজও করেছি বৈকি। ওই অতটুকু বেলাতেই করেছি। তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়েছি। ছোট কাচা শাড়ী পরে চন্দন ঘষেছি, ফুল তুলে রেখেছি। তারপর কোথা দিয়ে কি হলো, ফুলের বন থেকে গিয়ে পড়লাম পাঁকের গর্তে। স্বর্গ থেকে পড়লাম নরকে। ওর থেকে কোনোদিন উদ্ধার পাবো, সে আশা—

কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে যায় মল্লিকার অশ্রু টলমল দু'টি চোখে।

'আমার জীবন, যেন একটা গল্পের কাহিনী।'

মল্লিকা চেয়ে থাকে সুদূর আকাশের দিকে।

তা চ্যাটার্জির জীবনেও একটা গল্পকথা বৈকি।

চাটুজ্যেবামুনের ঘরের ছেলে, বাপ সামান্য কি চাকরি করে, আবার

যজমানীও করে। ছেলে ছোট থেকে উচ্ছন্নের পথে। নীচু জাতের ঘরে থাকে, তাদের সঙ্গে তাড়ি খায়, গাঁজা খায়। ঝকঝকে কাজ করতে বললে হি-হি করে হাসে আর বলে, 'বাগ্দীর ঘরের ভাত খেয়ে আমার তো জাত-জন্মের বালাই নেই। ছুঁলে তোমার শালগেরামের জাত যাবে না?

কিন্তু ছেলেবেলায় সেই দুষ্টুমি বয়েস হতেই পরিণত হলো কেউটে বিষে। একবছর বাগ্দীদের হাতে মার খেয়ে হাড় ভেঙে ঘরে পড়ে রইলো তিন মাস, তখন বাপের কাছে দিব্যি লাগলো, কান মললো, নাকে খৎ দিলো, আর সেরে উঠে মানুষ হয়েই একদিন রাতের অন্ধকারে গেল নিরুদ্দেশ হয়ে। আর সেই রাত্রে বাগ্দীদের সেই রঙ্গিণী বৌটাও হলো হাওয়া। যার জন্যে মার খেয়ে হাড় ভাঙা।

তারপর বহু বহুকাল পাত্তা নেই, অবশেষে একদিন ভগ্নিপতিকে, অর্থাৎ মল্লিকার বাপকে, একটা চিঠি লিখে জানালো, 'বেঁচে আছি, তবে এমন জড়িয়ে পড়েছি যে যাওয়া অসম্ভব। ঠিকানা দিলেন, বাবা মরলে একটা খবর দিও। যতই হোক বামুনের ছেলে নেহাত শূয়োর গরুটা আর খাবো না সে সময়। ছেলে চলে যেতে মেয়েজামাইকে কাছে রেখেছিল চাটুজ্যের বাপ।

তা বাপ মরতে চিঠি দিয়েছিল ভগ্নিপতি।

আর সেই খবর পেয়েই চাটুজ্যে গ্রামে চলে এসে বাসের ভাঙা ভিটেটুকু আর দু'পাঁচ বিঘে যা ধানজমি ছিল, বেচে দিয়ে বোনভগ্নিপতিকে উচ্ছেদ করে আবার স্বস্থানে প্রস্থান করেছিল।

এসব কথা মল্লিকা তার মা'র মুখে শুনেছে। তখনও সে শিশু। তারপর তার বাপ মরেছে। মা লোকের বাড়ি ধান ভেঙে, বড়ি দিয়ে কাজকর্মে রেঁধে দিন গুজরাণ করে মেয়েটাকে মানুষ করে তুলেছিল। তা সে মাও মরলো! আর কেমন করে না জানি খবর পেয়ে মামা এসে ধরে নিয়ে গেল।

কে জানতো যে সেই তখন থেকেই মতলব ভাঁজছিল চাটুজ্যে।

'তখন তো বুঝিনি'—মল্লিকা নিশ্বাস ফেলে বলে, 'মামার মুখে মধু, ভেতরে বিষ। মুখে মধুর মোহে তখন খুব ভালোবেসে ফেললাম। মনে হলো, মামার নামে যা কিছু নিন্দে শুনেছি, সব বাজে। কিন্তু বয়েস হবার সঙ্গে-সঙ্গে —'

শিউরে ওঠে মল্লিকা। চুপ করে যায়।

প্রভাত ওর মুখের দিকে তাকায়। সরল পবিত্র মুখ।

সত্যি, মানুষ কি এতই সস্তা জিনিস যে, সামান্য খুঁত হলেই তাকে বর্জন করতে হবে?

দূর পথে পাড়ি। কত কথা কত গল্প। সেই বাগ্দীদের বৌটা ?

সেটা নাকি আর কার সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল। মামা বলতো, 'আপদ গেছে! হাড় জ্বালিয়ে খেয়েছে আমার!' এখন আর কিছু নেই মামার, শুধু পয়সা আর পয়সা।

আচ্ছা, এর মাঝখানে লেখাপড়া শিখলো কখন মল্লিকা? এমন কায়দাদুরস্ত হলো কি করে? তা-তার জন্য মামার কাছে ঋণী বৈকি!

যে উদ্দেশ্যেই হোক, মেম রেখে ইংরিজি শিখিয়েছে মামা, শিখিয়েছেন চালচলন।

না, উদ্দেশ্যটা মহৎ নয়। যত অবাঙালী খদ্দেরের জন্যে—তবু যে ভাবেই হোক মল্লিকা তো পেয়েছে কিছু!

বাংলা? সেটা সম্পূর্ণ নিজের আকুলতায় আর চেষ্টায়। পার্শেলে বই আনিয়ে-আনিয়ে—

তাতে আপত্তি ছিল না মামার? না। এদিকে যে আবার মল্লিকার তোয়াজ করতেন। বুঝতেন তো মল্লিকাই অর্ধেক আকর্ষণ! স্টেশনে একা গেলে লোক আসতে চায় না, মল্লিকা গেলে ঠিক বঁড়শি গাঁথে।

হ্যাঁ, ওখানে সব আছে। মদ, জুয়া, ভেজাল কালোবাজার! তারাই তো দামী খদ্দের। আর ওই জন্যই তো পুলিশের অত ভয় চাটুজ্যের। পুলিশের লোক সন্দেহ হলেই—

সব কথাই বলছি তোমায় সব কথাই বলবো।' মল্লিকা বলে, প্রথম যেদিন তোমার ঘরে এসেছিলাম, সেদিন ঠকিয়েছিলাম তোমায়। অভিনয়।

'অভিনয়।' আড়ষ্ট হয়ে তাকায় প্রভাত।

মল্লিকা মুখ তুলে বলে, 'হ্যাঁ অভিনয়। অভিনয় করতে করতেই তো বড় হয়েছি। মামার শিক্ষায় করেছি। আবার মামাকে ঠকাতেও অভিনয় করেছি। সেদিন গিয়েছিলাম মামার শিক্ষায় তোমার পকেট থেকে চিঠি চুরি করতে।'

চিঠি চুরি! পৃথিবীটা দুলে ওঠে প্রভাতের। কিন্তু মল্লিকা অকম্পিত।

সে সব বলবে। তারপর প্রভাত তাকে দূর করে দিক, আর মুখ না দেখুক, তাও সইতে পারবে। বলে, মরতে ইচ্ছে হতো মাঝে মাঝে। কিন্তু রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শময়ী এই পৃথিবীর দিকে তাকাতে মনটা কেঁদে উঠতো। নিজের ওপর মায়ায় ভরে যেতো মন। আর কল্পনা করতো, কবে কোনদিন আসবে তার ত্রাণকর্তা।'

আর তিনজন আশ্বাস দিয়েছিল। 'প্রথমবার একজন বাঙালী মহিলা।'

'মহিলা।'

হ্যাঁ, একজন নার্স। স্বাস্থ্যান্বেষনে এসেছিলেন। বলেছিলেন মল্লিকাকে নিয়ে যাবেন। তাকে সুস্থ জীবনের স্বাদ এনে দেবেন কিন্তু হঠাৎ একদিন মল্লিকাকে না বলে পালিয়ে গেলেন।

'তারপর আপনার মত দু'জন যুবক। সহানুভূতি দেখিয়েছেন উদ্ধার করে নিয়ে যাবেন বলেছেন, যাবার সময় ভুলে গেছেন।'

'তার মানে, ওই আশা দিয়ে রেখে বিশেষ সুবিধে আদায় করে নিয়েছে।' প্রভাত রাগ করে বলে।

মল্লিকা মুখ তুলে বলে, 'পৃথিবীতে দেবতা আর ক'জন জন্মায়?

প্রভাত তার হাতের ওপর একটা হাত রাখে, ঈষৎ চাপ দেয়। তারপর বলে, 'কিন্তু মনে আছে তো? তোমার মামা গরীব ব্রাহ্মণ! মামী হঠাৎ মারা যাওয়ায় অকূল পাথরে পড়েছেন। ছোট্ট একটি দোকান আছে, সেইটে ছেড়ে বাংলাদেশে এসে ভাগ্নীর জন্যে পাত্র খুঁজবেন, এমন অবস্থা নয়। দৈবক্রমে আমার সঙ্গে পরিচয়। আমি ব্যানার্জি শুনে, হাতে স্বর্গপ্রাপ্তি—' হেসে ওঠে প্রভাত।

মল্লিকা বলে, 'ভুলে যাবো না।'

না, ভুলে গেল না তারা।

এই গল্প দিয়ে ভোলালো বাড়ীর লোককে, আত্মীয়বর্গকে।

না, প্রথমটা কঠিন হয়ে গিয়েছিলেন বৈকি। কিন্তু মল্লিকার নম্রতা, মল্লিকার দুঃখগাথা, আর মল্লিকার রূপ—এই তিন অস্ত্রে কাবু হয়ে যেতে দেরি হলো না তাঁদের!

মামা চাটুজ্যে, বাপ মুখুজ্যে! এ মেয়েকে খুব অসম্ভ্রম করা যায় না। তবু তল্লাস করতে ছাড়লেন না প্রভাতের মা। মল্লিকার বাপের দেশ রিষড়েয় খোঁজ করলেন—আঠারো বিশ বছর আগে সুরেশ মুখুজ্যে বলে কেউ ছিল কিনা।

ছিল! ছিল বৈকি! তাদের জ্ঞাতি তো রয়েছে এখনও।

মা মরতে মেয়েটাকে মামা পাঞ্জাবে না মাদ্রাজে কোথায় যেন নিয়ে গিয়েছিল, সে তথ্যও পরিবেশন করলো কেউ-কেউ!

মামাটার হাঁড়ির হাল হয়েছে? হবেই তো! বাইরের ভিটেটুকু থেকে গরীব বোনকে উচ্ছেদ করা পয়সা করেছিল, সে পয়সা থাকে?

তা না থাক! করুণাময়ীর শান্তিটা তো থাকলো! প্রভাতজননী করুণাময়ী নিশ্চিন্তচিত্তে বৌ বরণ করে ঘরে তুলেছিলেন।

টালবাহনা করে ছুটি বাড়িয়ে নিয়েছে প্রভাত, উঠে পড়ে চেষ্টা করেছে ফের বদলি হবার। মেডিকেল সার্টিফিকেট দাখিল করেছে ওই 'দেহাতী

পাঞ্জাবী' জলহাওয়া সহ্য হচ্ছে না তার।

'আমার জন্যে কত জ্বালা তোমার!'

মল্লিকা গভীর কালো চোখত্ব'টি তুলে তাকায়।

আর কোনোদিন ওকে রূপসী মনে হয় না, মনে হয় না লাবণ্যময়ী।

কাকীমা অবশ্য বিয়েতে আসেননি, নিজের গালে মুখে চড়িয়েছেন, আর আগে কেন গেঁথে ফেলেননি বলে। তার শেষ আক্ষেপের কামড় দিয়েছে বড়জার কাছে চিঠিতে, তাঁর বোন ভগ্নিপতি কি পরিমাণ দানসামগ্রী, আর কি পরিমান নগদ গহনা দিতে প্রস্তুত, আর হিসেব দাখিল করে।

প্রভাত হাসে। মল্লিকার কাছে। বলে, 'উ', ভাগ্যিস ওই দানসামগ্রী আর নগদের কবলে পড়ে যাওনি।'

ওদের হাওড়ার বাড়ীতে এখনও গ্রাম গ্রাম গন্ধ। ঘরে গৃহদেবতা. উঠোনে তুলসীমঞ্চ, রান্নাঘরে শুচিতার কড়া আইন।

তা ছাড়া গোশালে আছে গরু, পুকুরে আছে মাছ!

মল্লিকা বিভোর হয়, বিগলিত হয়। এই তো ছিল স্বপ্ন!

ভাবে, ভগবান, আমার জন্যে এত রেখেছিলে তুমি?

প্রথম প্রথম সর্বদা একটা অশুচিবোধ তাকে সব কিছুতে বাধা দিতো: শাশুড়ী ডাকতেন, 'বৌমা, আজ লক্ষ্মীপূজা, ঘরেদোরে একটু আলপনা দিতে হয়। পারবে তো? মেলেচ্ছ দেশে মানুষ, দেখনি তো এসব। যাক, যা পারো দাও।'

মল্লিকা ভয়ে কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তারপর আস্তে-আস্তে এগিয়ে যায়। কিন্তু পারাটা তার না 'পারার' মত হয় না। মনের জগতে ভেসে ওঠে শৈশবে-দেখা মায়ের হাতের কাজ! এ বাড়ী ওবাড়ী থেকে আলপনা দিতে ডাকতো মল্লিকার মাকে! ডাকসাইটে কর্মিষ্ঠ ছিলেন।

শাশুড়ী ডাকেন, 'বৌমা, একখানা সিল্কের শাড়ী-টাড়ী কিছু জড়িয়ে আমার ঠাকুরঘরে একবার এসো তো, চন্দন ঘষে, ফুলক'টায় একটু মালা গেঁথে দেবে।'

মল্লিকা কম্পিত চিত্তে ভাবে, মুহূর্তে ভয়ানক একটা কিছু হয় না তার! হঠাৎ পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে যাওয়া কি ওই রকম কিছু?

শাশুড়ি ডাকেন 'কই গো বৌমা—'

ছুটে যাওয়া ভিন্ন গতি থাকে না।

ক্রমশঃ ভয় ভাঙে। নিজেই এগিয়ে যায়।

কিন্তু রাত্রে কাতরতায় ভেঙে পড়ে, 'আমার এতে পাপ হচ্ছে না?'

প্রভাত আদরে ডুবিয়ে দেয়। বলে, 'কি আশ্চর্য। পুণ্যি না হয়ে

পাপ হবে? এসব তো পুণ্যকর্ম, বরং যদি কিছু পাপ থেকে থাকে, ধুয়ে মুছে যাবে। কিন্তু এখনো এত কাতর কেন তুমি মল্লিকা। আমি তো তোমায় বলেছি, স্বেচ্ছায় অন্যায় না করলে পাপ স্পর্শ করে না।'

ধীরে ধীরে বুঝি কেটে যায় সমস্ত গ্লানি! আর একজন্মে জন্ম নেয় মল্লিকা! মন বদলাচ্ছে।

নখের আগায় নেল্ পালিশের বদলে হলুদের ছোপ, ঠোঁটে লিপস্টিকের বদলে পানের রাচা, সুর্মাহীন চোখ নম্র কোমল। শাড়ী পরার ভঙ্গিমা বদলে ফেলেছে মল্লিকা। বদলাচ্ছে জামার গড়ন।

মল্লিকা আস্তে-আস্তে তার মা'র মত হয়ে যাচ্ছে। পুণ্যবতী সতীমায়ের মত! যে মা তার খেটে খেয়েছে, কিন্তু সম্মান হারায়নি।

কিন্তু অনাবিল সুখ মানুষের জীবনে কতক্ষণ? প্রভাতের কাকার চিঠি আসে, 'বিয়ে তো আমরাও একদা করেছিলাম বাপু, কিন্তু এভাবে উচ্ছন্ন যায়নি। আর বেশি ছুটি নিলে চাকরিতে ছুটি হয়ে যাবে। শীঘ্র চলে এসো। এবার একেবারে খোদ রাজধানী? তাছাড়া কোয়ার্টার্স পাওয়া যাবে।'

এখনো ভাইপোর জন্য কাকার দরদের পরিচয়ে কাকীমা বিরূপ। কিন্তু কাকা নিজ নীতিতে অটল আছেন।

চিঠিখানা হাতে নিয়ে মাকে দেখায় প্রভাত। মা বলেন তো বটে! কিন্তু আমার যে অভ্যাস খারাপ করে দিলি বাবা! বৌমাটিকে ছেড়ে—

প্রভাত বলে, 'উঃ মা! নিজের ছেলেটিকে ছেড়ে এতদিন থাকতে পারলে—'

মা হাসেন। বলেন, 'কি করবো। মেয়েটা বড় মায়াবিনী।'

'মায়াবিনী' শব্দের নতুন অর্থে হাসে প্রভাত।

আর মল্লিকাকে গিয়ে ক্ষ্যাপায়, 'ওগো মায়াবিনী, কি মায়া জানো!'

মল্লিকার চোখে কিন্তু শঙ্কা ঘনায়।

দিল্লী। দিল্লী যে বাঘের গুহার তল্লাটে! মামাকে মাঝে—মাঝেই আসতে হয় দিল্লীতে। মামার বেশীর ভাগ খদ্দের 'দিল্লীর'।

প্রভাত বলে, 'দিল্লী কতবড় শহর, কত তার লোকসংখ্যা! কে সন্ধান রাখবে, কোন কোয়ার্টাসে সেই মিসেস ব্যানার্জি বাস করেন, যাঁর পুরোনো নাম ছিল মল্লিকা।'

'না গো, আমার ভয় করছে।'

'তবে চাকরি-বাকরি ছেড়েই দেওয়া যাক্, কি বলো?

'তাই দাও না গো।' মল্লিকা লুটিয়ে পড়ে। 'কলকাতায় একটা

চাকরি জোগাড় করে নিতে পারবে না।'

'হয়তো 'পারি! কিন্তু লোকের কাছে 'পাগল' নাম কিনতে চাই না; বুঝলে? কেন ভয় পাচ্ছ?'

কিন্তু ভয়! ভয়! ভয় যে মল্লিকার স্নায়ুতে শিরাতে পরিব্যাপ্ত!

কিন্তু শেষ পর্যন্ত মল্লিকার ভয়ই জয়ী হয়।

লোকের কাছে 'পাগল' নামই কিনে বসে প্রভাত।

প্রভাতের দুই দাদা, যারা বাড়ীর মধ্যেই আড়াল তুলে মায়ের সঙ্গে পৃথকান্ন হয়ে বাস করছেন, তাঁরা ছি-ছি করেন এবং পুরাণ উপপুরাণ থেকে শুরু করে আধুনিক ইতিহাস পর্যন্ত স্ত্রীরবশ পুরুষের কি কি অধোঃগতি হয়েছে, তাঁর নজীর দেখান।

কাকা সম্পর্ক ছেদ করেন, এবং পাড়া-প্রতিবেশী গালে হাত দেয়।

'দিল্লী' নামক ইন্দ্রপুরীর স্বর্গীয় চাকরী যে কেউ স্বেচ্ছায় বিসর্জন দেয়, এ লোকের ধারণার বাইরে। শুধু করুণাময়ী ছোট ছেলের এই অমতিতে পাঠ-বাড়ীতে হরিলুঠ দিয়ে আসেন।

ধারেকাছে দুই ছেলে-বৌ, কিন্তু করুণাময়ী থাকতেন বেচারীর মত। নিসঃহায় নিরাভিভাবক। অথচ তেজ আছে ষোল-আনা, তবে পৃথকান্ন ছেলেদের সাহায্য নিতেন না। অসময়ে দরকার পড়লে বরং পাড়ার লোকের কাছে জানাতেন, তো ছেলেদের নয়।

শাশুড়ীর এই অহংকারে ছেলের বৌরাও ডেকে কথা কইতো না।

প্রভাত এসে পর্যন্ত করুণাময়ী একটা সহায় পেয়েছেন। তা ছাড়া ছোটবৌয়ের রূপগুণ! যেটা বড়-মেজ বৌকে 'থ' করে দেবার মত। করুণাময়ীও একটা রাজ্যের অধিশ্বর হয়েছিল। এই ক'মাস।

তবু মনের মধ্যে বাজছিল বিদায় রাগিনী! ফুরিয়ে যাবে, ফুরিয়ে যাবে, এই আবু হোসেনের রাজ্যপাট! ফুরিয়ে যাবে সংসার করা।

ছুটি ফুরোলেই বৌ নিয়ে লম্বা দেবে প্রভাত, আর আবার দুই বৌয়ের দাপটের মাঝখানে পড়ে করুণাময়ীকে শুধু হরিনামের মালা সম্বল করে মান-মর্যাদা বজায় রাখতে হবে।

কলকাতায় চাকরি জোগাড় হয়। প্রভাত এসে মাকে প্রণাম করে বলে, 'মাইনে অবশ্যি এখানে ও চাকরির থেকে কম, কিন্তু ভবিষ্যৎ খারাপ নয়।

করুণাময়ী আশীর্বাদের সঙ্গে অশ্রুজল মিলিয়ে বলেন, 'তা হোক। তা হোক। ঘরের ছেলে ঘরের ভাত খাবি, কি বা খরচ। আমি বলছি এই চাকরিতেই তোর উন্নতি হবে।'

'তাহ'লে খুশি ?'

'হ্যাঁ বাবা, খুব খুশি।'

ঘরে গিয়ে মল্লিকাকেও সেই প্রশ্ন করতে যায়। কিন্তু ঘরে পায় না মল্লিকাকে। কোথায় সে ?

রান্নাঘরে ? ঠাকুরঘরে ? গোয়ালে ?

না। ছাতে উঠেছে মল্লিকা।

প্রভাত এসে আলশের ধারে বসে পড়ে। 'উঃ খুব খাটালে। এই চুড়োয় বসে আছো যে ?'

'খুঁজবে বলে !' মল্লিকা হাসে।

কিন্তু হাসিটা কেমন নিষ্প্রভ দেখায়।

'আমি কিন্তু ভেবেছিলাম আজ আমার জন্যে পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকবে।'

'ইস ! সেইরকম বাড়ি কিনা !'

'আহা, বাড়ি মানে তো বড় বৌদি, মেজ বৌদি ! ওঁদের নিন্দের কিছু এসে যায় না। যাক্, খুশি তো ?'

খুশি ! মল্লিকা অমন চমকে ওঠে কেন ? কেন বলে 'কিসের খুশি ?'

বাঃ, চমৎকার দিল্লীর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদের পাকা বনেদ গাঁথা হলো না ? 'ন্যাশনাল ইণ্ডাস্ট্রির, কাজটা পেয়ে গেলাম না আজ !'

'ওমা ! তাই বুঝি ! সত্যি হলো ?' মল্লিকা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

কিন্তু প্রভাতের হঠাৎ মনে হয় মল্লিকার এই উচ্ছ্বাসটা যেন রঙ্গমঞ্চের অপটু অভিনেত্রীর 'শেখা ভঙ্গির' মত !

ভুরু কুঁচকে বললো, 'কই, খুব খুশি তো মনে হচ্ছে না।'

মল্লিকা জোরে হেসে উঠলো, 'কি যে বলো ! আমি বলে তোমাদের ঠাকুরের কাছে পুজো মেনেছিলাম, যাতে তোমার আগের চাকরিটা ঘোচে, এখান থেকে আর কোথাও যেতে না হয়।'

প্রভাত হাসে। বলে, 'আমাদের ঠাকুর নয়, তোমার ঠাকুর, সকলের ঠাকুর।'

মল্লিকা মাথা দুলিয়ে বলে, 'হ্যাঁ গো মশাই তাই।'

তবু প্রভাতের মনে হয় মা'র কাছে যে আন্তরিক অভিনন্দন পেলো, মল্লিকার জন্যেই তো—

এখানে টাকার অঙ্ক কম বলে ?

কিন্তু তাই কি হতে পারে ? মল্লিকার দিল্লীর ভীতি তো দেখেছে সে ?

তবে কেন তেমন খুশি হলো না মল্লিকা ?

কিন্তু সত্যিই কি মল্লিকা খুশি হয়নি ?

নিজেই সেকথা ভাবছে মল্লিকা। খুশি-খুশি, খুশিতে উপছে পড়া উচিত ছিল তো তার। কিন্তু তেমন হচ্ছে না কেন ? কেন হঠাৎ কেমন একটা শূন্যতাবোধ নিস্তেজ করে দিচ্ছে ! কেন মনে হচ্ছে কোথা কি বুঝি একটা জমা ছিল তার, সেটা আর রইলো না। কি সেই জমা ? কি সেই ফুরিয়ে যাওয়া ?

কিন্তু ঘরকুনো প্রভাত বড় খুশিতেই আছে।

হাওড়া থেকে বালি, অফিস থেকে বাড়ি, খাবার ঘর থেকে শোবার ঘর, মা'র স্নেহছায়া থেকে স্ত্রীর অঞ্চলছায়া।

তাঁতির মাকুকে এর বেশী আর ছুটোছুটি করতে হয় না। আবাল্যের পরিবেশ মনকে সর্বদা সুধারসে সিক্ত করে রাখে, মাঝখানের বিদেশবাসের তিনটে বছর ছায়ার মত বিলীন হয়ে যায়।

এতদিনে বুঝি প্রভাত জীবনের মানে খুঁজে পায়।

কিন্তু ক্রমশঃ জীবনের মানে হারাচ্ছে কেন মল্লিকা ? কেন ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হয়ে যাচ্ছে। স্তিমিত হয়ে যাচ্ছে ?

হয়তো বা মাঝে-মাঝে একটু রুক্ষও।

ছকে-বাঁধা সংসারের সুনিপুণ ছন্দের মধ্যেও কি আর স্বাদ খুঁজে পাচ্ছে না ? ভোর থেকে সুরু করে রাত্রি পর্যন্ত গৃহস্থালীর কাজগুলির ভার পেয়ে যে সে প্রতিমুহূর্তে কৃতার্থ হয়েছে। বিগলিত হয়েছে তুলসীতলায় প্রদীপ দিতে, লক্ষ্মীর ঘরে ধূপ-ধুণো দিতে, পূর্ণিমায় পূর্ণিমায় সত্যনারায়ণের জন্যে মালা গাঁথতে, চন্দন ঘষতে।

সেই কৃতার্থমন্যতা কোথায় গেল ? কাজগুলো যান্ত্রিক হয়ে উঠছে কেন ?

সংসারী গৃহস্থের মূর্তপ্রতীক প্রভাত। সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরে অসময়ে ফুলকপির জোড়া হাতে ঝুলিয়ে, ভাবতে-ভাবতে আসছে মাকে বলবে, 'মা, দু'টোই যেন তুমি চিংড়িমাছ দিয়ে রেঁধে শেষ করে দিয়ো না। তোমার নিরামিষ ঘরে রাঁধবে একটা—'

মনটা আনন্দে ভাসছে, সিনেমার টিকিট কাটা আছে দু'জনের। মল্লিকা একটু যেন মনমরা হয়ে গেছে। ছেলেমানুষ, একটু আমোদ। আহ্লাদের দরকার আছে বৈকি। ভাবছে বলবে, 'মল্লিকা, তোমার সেই ফুলশয্যার শাড়ীটা পরো আজ। খোঁপায় দাও রজনীগন্ধার মালা—'

বাড়ীর কাছে থমকে দাঁড়াল। ও পাশে মল্লিকার জানালার নীচে কে একটা লোক দাঁড়িয়ে! কিন্তু চকিত ছায়া। মুহূর্তে বাগানের দিকে কোন পথে যেন মিলিয়ে গেল লোকটা।

জানলা দিয়ে উকি মারছিল কি উদ্দেশ্যে ?

কিছু চুরিটুরি করে পালালো না তো ?

তাড়াতাড়ি এসে বাড়ি ঢুকে ডাকলো, 'মা !'

মল্লিকা দালানে এদিক থেকে এসে দাঁড়ালো।

বললে, 'মা পাঠবাড়ি গেছেন।'

'ও, আজ সোমবার। কিন্তু তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে ?'

মল্লিকা অচঞ্চল কণ্ঠে বলে, 'এইতো এখানেই, কেন ?'

'আর কেন'! নির্ঘাত একটা কিছু গেছে। জানলার কাছে তোমার শাড়ীটাড়ী কিছু ছিল ?' বলতে-বলতে ঘরে ঢুকে গিয়ে প্রভাত বলে, জানলার নীচে একটা লোক দাঁড়িয়ে উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছিল মনে হলো, আমি আসবার আগেই সাঁ করে চলে গেল।'

মল্লিকা বলে, 'কই, জানালার কাছে তো কিছু ছিল না।'

'যাক! ছিল না তাই রক্ষে। ছিঁচকে চোরদের জানো না। জানলায় আঁকশি দিয়ে ঘরের জিনিস বার করে নেয়। ঘরে যখন থাকবে না, বাগানের দিকের জানলাটা বন্ধ করে রেখো।'

হ্যাঁ, বাগানের দিকের জানলা বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয় প্রভাত স্ত্রীকে। কিন্তু জানালা কি শুধু ঘরেই থাকে ?

আর সেইটে আটকাতে পারলেই কি সব নিরাপদ।

'মা বলেছেন, আমরা যেন দরজায় চাবি লাগিয়ে মেজদির কাছে চাবিটা রেখে চলে যাই।'

'কেন, মা কোথায়' ?

মল্লিকা বলে, 'পাঠবাড়িতে কীর্তন না কি আছে।'

'কীর্তন'! প্রভাত হাসে, 'মা'র ওই রোগ। কোথাও কীর্তন হলে আর মা'—

'হ্যাঁ।' মল্লিকা হাসে, 'আমায় বলছিলেন, সিনেমা দেখে কি হয়, কীর্তন শোনার আনন্দ আছে, পুণ্যি আছে।'

প্রভাতও হাসে। বলে, 'যার যাতে আনন্দ!'

ফুলশয্যার শাড়ীর কথা তোলবার আগেই অপরূপ সাজসজ্জায় ঝলমলিয়ে আসে মল্লিকা। পাতলা জরিদার শাড়ী। জমি-জরানো লম্বা বেণী। ঠোঁটে গাঢ় রক্তিমা, নখে রঙের পালিশ। গালেও বুঝি একটু কৃত্রিম রঙের ছোঁয়াচ। সুর্মাটানা চোখে কেমন একটু বিলোল কটাক্ষ হেসে বলে 'কেমন দেখাচ্ছে।'

প্রভাত হেসে বলে, 'বড্ড বেশী রূপসী। একটু যেন ভয় করছে।'

কিন্তু প্রভাতের সেই তুচ্ছ কৌতুকের কথাটুকু কি কোনও ক্রুর

ভাগ্যদেবতাকে নিষ্ঠুর কৌতুকের প্রেরণা দিলো? তাই ভয় এলো ভয়ঙ্কর মূর্তিতে!

সিনেমা হল থেকে প্রভাতের বাড়ি ফিরতে এই পথটা একটু গা-ছমছমে করে বটে। এরই আশেপাশে নাকি হাওড়ার বিখ্যাত গুণ্ডাপাড়া। কিন্তু সন্ধ্যার শো'তে সিনেমা দেখে তো কতবার ফিরেছে প্রভাত আর প্রভাতের পাড়ার লোকেরা। দু'দিন আগেও নাইট শো'য় ছবি দেখে এসেছে প্রভাতের মেজদা, মেজবৌদি।

তবু পাড়ার লোক আর জ্ঞাতিগুষ্ঠি ধিক্কার আর ব্যঙ্গের স্রোত বহালো।

'হবেই তো! সুন্দরী রূপসী বৌকে সঙ্গে কার রাত ন'টায় গুণ্ডাপাড়া দিয়ে···ছি-ছি, এত কায়দাও হয়েছে একালের ছেলেদের! ···হলো তো, বৌকে চিলে ছোঁ মেরে নিয়ে চলে গেল, ভ্যাবা হয়ে দেখলি তো দাঁড়িয়ে? ···হ্যাঁ, তবু রক্ষে যে তোকে খুন করে রাস্তায় শুইয়ে রেখে যায়নি।'···

আবার একথাও বললো, 'পাড়া কি এত নিশুতি হয়ে গিয়েছিল সত্যি যে অতবড় কাণ্ডটা কারুর চোখে পড়লো না, অতখানি চেঁচামেচি কারুর কানে গেল না? ভয়ানক একটা চেঁচামেচি, ধ্বস্তাধ্বস্তি হয়েছে নিশ্চয়ই।'

চেঁচামেচি, ধ্বস্তাধ্বস্তি? হ্যাঁ, পুলিশকে তাই বলতে হয়েছে বৈকি—।

বলতে হয়েছে একসঙ্গে চার-পাঁচজন গুণ্ডা ঝাঁপিয়ে পড়ে—

কিন্তু প্রভাত তো জানে একটাই মাত্র লোক। যে লোকটা একখানা ছোট গাড়ি নিয়ে পথের একধারে চুপ করে বসেছিল চালকের আসনে, গাড়ির দরজা খুলে। স্পষ্ট সাদা চোখে দেখেছে প্রভাত, সেই খোলা দরজা দিয়ে ঝপ্ করে ঢুকে পড়েছে মল্লিকা!

আর প্রভাত? প্রভাত তো তখন রাস্তার ওপারে পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে রঙিন মশলা দিয়ে মিঠে পান সাজাচ্ছিল। হঠাৎ যে মল্লিকার রঙিন মশলা দেওয়া মিঠে পান খাবার ইচ্ছে হয়েছিল।

গাড়ির নম্বর? না, সে আর দেখবার অবকাশ হয়নি প্রভাতের। গাড়ির পেছনে বৃথা ছুটতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়েছিল! কিন্তু চালকের মুখটা দেখা হয়ে গিয়েছিল তার পাশের দোকানের আলোতে।

চিনতে পেরেছিল বৈকি। ওর সঙ্গে কতগুলো দিন একটা জিপের মধ্যে গায়ে-গায়ে বসে কত মাইল রাস্তা পাড়ি দিয়েছে প্রভাত।

বৌ হারিয়ে চুপ করে বসে থাকা যায় না।

পুলিশ-কেস্ করতে হচ্ছে বৈকি!

হাওড়া অঞ্চলের অনেক গুণ্ডাকেই দেখতে যেতে হচ্ছে প্রভাতকে, সনাক্ত করতে। কিন্তু কই। সেই চার-পাঁচটা লোককে তো—নাঃ—তাদের বার

করতে পারছে না পুলিশ।

হাওড়া অঞ্চলে দুর্বৃত্তের অত্যাচারের একটা খবর খবরের কাগজেও ঠাঁই পেয়েছে বৈকি! তা ও ব্যাপারে আর আজকাল কেউ তাকিয়ে দেখে না।

কেউ লক্ষ্য করেনি। কিন্তু কে কত লক্ষ্য করে?

কত লোকে তো হেঁটে গেছে এ পথে? টুকরো ওই কাগজটুকু তো তাদের কারো চোখে পড়েনি। আশ্চর্য! পড়লো, প্রভাতের চোখেই পড়লো। কিছু না, শুধু একটুকরো কাগজে প্রভাতের বাড়ির নির্ভুল ঠিকানা লেখা!

হাতের লেখাটা প্রভাতের চেনা। মল্লিকার অনেক লেখাই তো দেখেছে সে, এই দীর্ঘ সময়টার মধ্যে।

এক বিদায় আরেক আরম্ভ

—বুদ্ধদেব বসু

আজ চেলসী হোটেলে আমাদের শেষ দিন, সন্ধ্যেবেলা ন্যু ইয়র্ক ছেড়ে যাচ্ছি, অনেক বই, কাপড়-চোপড়, আর ঘরকন্নার জন্য যা-কিছু এখানে কিনতে হয়েছিলো—কিছু ডাকে, কিছু জাহাজে পাঠানো হয়ে গেছে। গত তিন সপ্তাহের মধ্যে অনেকগুলো বিদায়ভোজের, গত তিন দিনের মধ্যে অনেকগুলো টেলিফোন বিনিময় হ'লো। পাড়ার যে-সব দোকানে বেশি যাওয়া-আসা করতুম—মুদিখানা, ধোপাখানা, মাংসের দোকান, মনোহারী দোকান—কাল ঘুরে-ঘুরে তাদের কাছে বিদায় নিয়ে এসেছি।

'চলে যাচ্ছেন? আবার কবে আসবেন। ফিরে গিয়ে আপনার দেশের কোনো একটা ছবি যদি পাঠান!'

চার মাস ছিলাম এই শহরে তিন মাস এই হোটেল চেলসীতে। আজ আমাদের বসবাসে ভরা ঘর দু'টো যেন করুণভাবে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে, যেন নিঃশব্দে বলছে, 'কেন চলে যাচ্ছো, আমরা তো কোনো দোষ করিনি।' কিন্তু মন খারাপ করার সময় নেই, এখনো ঢের গোছ-গাছ বাকি! কত ছোটোখাটো জিনিস চারদিকে ছড়িয়ে আছে এখনো, ছোটো-বড়ো নানান ধরনের ব্যাগগুলো অপূর্ণ বিবর নিয়ে অপেক্ষামান! প্র. ব বোঝাপড়া করবেন তাদের সঙ্গে, আমি সাহায্য করতে গেলে বরং তাঁর ব্যাঘাত ঘটাবো। কিন্তু আমার লেখার টেবিলের দেরাজগুলোতে এখন আর হাত না দিলে চলে না।

এই একটা কাজ শেষ মুহূর্তের জন্য বাকি থেকে গেছে—তাই কাগজপত্র ছড়িয়ে বসেছি, কিন্তু বেশি দূর এগোতে পারিনি। কোনটা থাকে সর্বদা। চেষ্টা করেছি আগেও, দু'-একবার বেশী রাত্রে কোনটা ত্যাজ্য আর কোনটা রক্ষণীয় সে বিষয়ে মনস্থির করা সহজ হয়নি—কখনোই তা সহজ হয় না আমার পক্ষে, তার ফলে শাস্তিও কিছু কম পাই না। জরুরী আর বাজে কাগজ এমনভাবে মিশে থাকে যে যখন যেটার খোঁজ পড়ে তখনই সেটি অদৃশ্য হয়ে যায়? বই, চিঠি, এটা ওটা খুঁজে-খুঁজে আয়ু ও উদ্যমের অপব্যয় আমার জীবনের এক শোচনীয় দুর্ঘটনা। কিন্তু এখন আর সময় নেই, মনে বল এনে নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ করতে হলো। সাদা, শক্ত, কড়মড়ে কাগজে ঝকঝকে টাইপ করা চিঠি একের পর এক ছিন্ন হলো

সশব্দে ; বিল, রসিদ, খবর কাগজের পত্রিকা লুটিয়ে পড়লো ঝড়া পাতার মতো, নানারকম বিজ্ঞাপন পুস্তিকা সবেগে নিক্ষিপ্ত হলো বাজে কাগজের ঝুড়িতে—আর সেই ঝুড়িগুলোকে পরিষ্কার করার জন্য বার-বার আমাকে হোটেলের গলিতে উঠে যেতে হলো ; শেষ পর্যন্ত প্রকাণ্ড সরকারি জঞ্জালের ধামাটাতেও আর এক তিল ঠাঁই রইলো না ! ধ্বংস থেকে যা বেঁচে গেলো তা দুটো খামে ভ'রে কোনো একটা তোরঙ্গে গুঁজে দিলাম—কিন্তু ঠিক সেগুলোই বাঁচাবার যোগ্য ছিলো কিনা, সে বিষয়ে এখনো আমার সংশয় ঘোচেনি। দেরাজগুলো শূন্য হবার সঙ্গে-সঙ্গেই আমার যেন এখানকার সঙ্গে বাঁধন আলগা হয়ে গেলো—কিন্তু প্র. ব. এখনো লটবহরের সঙ্গে লড়াই করছেন ; তাঁর রান্না আছে ; ধার-করা বাসন ধুয়ে রাখা, টুকরো কাগজ আর দড়িদড়া-ছিটানো ঘর দু'টোর হাল ফেরানো—এই সব কর্তব্যেও অবহেলা করা চলবে না।

দ্রুত কেটে গেল দিন, বিকেলে বৃষ্টি নামলো স্লেট-রঙা আকাশ থেকে, আমার এক ছাত্রী গাড়ি নিয়ে এলেন। এখনও ঠিক সময় হয়নি, কিন্তু হোটেলের সামনে গাড়ি দাঁড় করানো অসম্ভব, আর ব'সে থেকে কি-ই বা হবে আর। মোটামুটি নিয়ে যাত্রা করা গেল। বাইরে বৃষ্টি, কারোরই তেমন মন ভালো নেই, ইস্ট-সাইড টার্মিনাল পর্যন্ত মিনিট কুড়ির পথটুকু কেউ তেমন কথাবার্তা বললে না। ছাত্রীটি আমাদের নামিয়ে দিয়েই বিদায় নিলেন—এখানেও সেই পার্কিং-এর সমস্যা, তাছাড়া গাড়িটি তাঁর নিজেরও নয়। এস্কালেটরে উঠে এলাম আমাদের এয়ার-লাইনের কাউণ্টারে, আমাদের এক আত্মীয়া আছেন আমাদের সঙ্গে। গিয়ে দেখি, আমাদের আর-এক ছাত্রী অপেক্ষা করছেন।

প্রায় সর্বদাই দেখেছি, প্লেন-কোম্পানীর কর্মচারীরা ছাত্রীদের সাহায্য করতে উৎসুক, আর তাদের সাবলীল ভঙ্গি ও সহাস্য মুখচোখ দেখে নেহাৎ আনকোরা বিদেশীর মনেও আশার সঞ্চার হ'তে পারে। কিন্তু আমাদের ভাগ্যে ললনাজাতির যে প্রতিনিধি আজ আবির্ভূত, তার মুখের পেশী স্বভাবের বা অদৃষ্টের দোষ অল্পবয়সেই পাথর হয়ে গেছে। প্রথমেই সে এমন ক'রে আমাদের দিকে তাকালে—বা তাকালে না—যেন আমরা কোনো অপরাধ করে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি, আর তাকে ভাবতে হচ্ছে আমাদের পক্ষে উপযুক্ত দণ্ডাবিধান কি হ'তে পারে।

তারপর বললে—'এই সব মাল আপনাদের ? এগিয়ে দিন ! হ্যাঁ—ওটাও—ওটাও—হাতব্যাগও দিতে হবে।'

তার গলার আওয়াজ কাঠের মতো নীরস, তার মুখ এমন কঠোর

যেন ভগবানের মানদণ্ডে আমাদের পাপী আত্মার তৌল করা হচ্ছে। আর তারপর সে ঠাণ্ডা চোখে আমার দিকে একবার তাকালে, তার বিচারে আমাদের জরিমানা হ'লো একশো-তিরিশ ডলার—সংখ্যাটাকে ন্যু ইয়র্ক শহরেও তুচ্ছ বলা যায় না।

সত্য কথা, মাল আমাদের অত্যাধিক ছিলো, আর আইনত যা দেয় তা দিতেই হবে, তা নিয়ে আমার কিছু বলার নেই। তাছাড়া আমরা আমাদের নিজেদেরই নির্বুদ্ধি বা অবিবেচনার খেসারৎ দিয়েছি, অতএব বলবোই বা কাকে। কিন্তু আমার যা খারাপ লাগলো—এখনো ভাবতে খারাপ লাগছে—তা ঐ কর্মিণীর দুর্বিনীত ও অ-মানবিক ভঙ্গি, আমাদের এই অর্থদণ্ডে সে যেন বেশ সুখী হয়েছে মনে হ'লো, যেন তার কোনো গোপন প্রতিহিংসা সে আমাদের উপর দিয়ে চরিতার্থ করলে। একবার সে বলতে পারতো যে বাড়তি মাল অনেক কম খরচে এয়ার-পার্শেলে পাঠিয়ে দেওয়া যায়। আমাদের খেয়াল না-থাকলেও তার কর্তব্য ছিলো তা মনে করিয়ে দেওয়া; চোখে বা ঠোঁটের রেখায় কিঞ্চিৎ সমবেদনা প্রকাশ করলেও আমরা তাকে অন্তত পক্ষে মানুষ ব'লে চিনতে পারতাম। সে-সব দূরে থাক—তার সারা দেহের নীরব কাঠিন্য দ্বারা আমাদের স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলে যে, তার কোম্পানীর প্লেনে আমাদের সহযাত্রী হওয়াটা সে একেবারেই পছন্দ করছে না। এর আগে অর্ধেক পৃথিবী ভ্রমণ ক'রে এসেছি আমরা, নানা দেশের বিমান ব্যবহার করতে হয়েছে, কিন্তু কোথাও এমন বিচারক-দৃষ্টির সম্মুখীন হ'তে হয়নি, কোথাও দেখিনি এমন নিস্তাপ ব্যবসাদারি, বা ব্যবহার এমন নীরুক্তভাবে ন্যূনতম। একটু হাসি, একটু চোখ তুলে তাকানো, ভাষায় ও আচরণে একটুখানি ক্ষণকালীন সহৃদয়তা—এই ছোটোছোটো বিনা খরচায় ব্যাপারগুলোতে আমাদের বেঁচে থাকার সুখ কি-পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে, তার প্রমাণ পেয়েছি দিনে-দিনে, অসংখ্য বার এই আমেরিকাতেই আমাদের দুর্ভাগ্য, যে এবার বিদায়ের মুহূর্তটি কাউন্টারধারিণী সেগুলিকেও ম্লান ক'রে দিলে।

কিন্তু একটা ভূমিকা মাত্র। আজ যেন সবখানেই অব্যবস্থা ও অমনযোগ দেখছি, যা এই ইস্ট-সাইড টার্মিনালে একেবারেই অপ্রত্যাশিত। নীচে এসে খুঁজে পাই না বাস, কারো কাছে কোনো সাহায্য পাবার আশা দেখছি না; বাসগুলো একের পর এক আসছে, দাঁড়াচ্ছে, চ'লে যাচ্ছে; কাটছে মিনিটের পর মিনিট, আমরা অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে আছি। এ-রকম অস্থির মন নিয়ে কিছু ভাবা যায় না, কোনো কথা ভালো করে বলা যায় না, বিদায়ের বেদনা অসম্মানিত হ'য়ে স'রে যায়। আমার

ছাত্রীটি বার-বার বলেছেন—'আমি যাই, এক ছুটে গরম কফি নিয়ে আসি? যা বৃষ্টি—কফি ভালো লাগবে।'

'থাক—এক্ষুনি হয়তো সময় হ'য়ে যাবে। আসলে সময় পেরিয়ে গেছে ততক্ষণে, শ্বেতাঙ্গদের বিখ্যাত সময় নিষ্ঠাতেও ফাটল ধরল আজ, আমি যখন প্রায় ভাবতে শুরু করেছি যে সত্যি আমরা লণ্ডনে কাল পৌঁছাবো কিনা, এমন, এক মুহূর্তে হঠাৎ প্র, ব, বলে উঠলেন। 'ঐ তো ঐ বাসটায় আমাদের মাল তুলছে! চলো!'

একটু দূরে দাঁড়িয়েছে সেটা, গেটের নম্বর কাউন্টারকন্যার সংবাদের সঙ্গে মেলেনি, দৈবাৎ আমাদের চোখে না পড়লে কে জানে হয়তো ঐখানেই পড়ে থাকতে হ'তো। চলো তাহ'লে—চলি তাহলে— চিঠি লিখো —হয়তো আবার দেখা হবে।

নীল্‌চে জানলার বাইরে আমার ছাত্রী ও আত্মীয়ার মুখ মিলিয়ে গেলো; বাস বেরিয়ে এলো আকাশের তলায় কয়েক মিনিট পরেই নদীর তলায় সুড়ঙ্গে ঢুকলো। পিছনে পড়ে র'ইলো ছিপছিপে স্কাইক্রেপার নিয়ে মানহাটান, ইস্ট নদী পেরিয়ে ব্রুকলিনের মফস্বল, ছোট-বড়ো কারখানা, ইটরঙের বিমর্ষ চেহারা ফ্ল্যাট বাড়ি, ক্রমশঃ ফাঁকা মাঠের বিস্তার ডাইনে-বায়ে উপরে-নিচে হাইওয়ে বেঁকে গেছে, মস্ত হোটেল; কাঁচের বাড়িতে ঝকঝকে ব্যাঙ্ক, আকাশের পাখির মতো প্লেন দেখা যাচ্ছে। অনেকবার উঠেছি, নেমেছি আইডলওয়াইল্ডে, কিন্তু এখনো আমি এই বন্দরের ভূগোল জানি না, কত বড়ো এর আয়তন সে-বিষয়ে আমার ধারণা অস্পষ্ট। শুধু এ কথা বলতে পারি যে, আইডলওয়াইল্ড নিজেই এক মস্ত শহর, কিংবা অনেকগুলো ছোট শহরের সমষ্টি, প্রত্যেক এয়ারলাইন্স আলাদা-আলাদা অট্টালিকা গড়েছে, এখানে সেগুলোরও আকার প্রকাণ্ড। আমরা যে লাইনে যাচ্ছি তার আস্তানার কোনো এক দরজার সামনে বাস আমাদের নামিয়ে দিলে।

মনে হচ্ছে, দুর্ভাগ্য আমাদের সঙ্গ নিয়েছে, কোন গেট থেকে প্লেনটা ছাড়বে, এই তথ্যটুকু সংগ্রহ করতে দশমিমিট ধ'রে চেষ্টা করতে হলো। এক নম্বর গেট? কোনদিকে সেটা? প্রশ্নের উত্তর দিতে কাউকে তেমন ইচ্ছুক দেখা গেলো না, আমরা প্রায় আন্দাজে একটা সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে বুঝলাম, ভুল করিনি, চলমান প্লেনের দিকে, কিন্তু চলা কি সোজা! ক্যামেরা, টাইপরাইটার, তিনটে ছোটো ব্যাগ, দু'টো ওভারকোট, একটা বর্ষাতি —আমরা দু'জনে ভাগাভাগি ক'রে এই সব বহন করছি। কোনটা হাতে, কোনটা কাঁধ থেকে ঝুলছে, কোনটা লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে, বর্ষাতিটা

বার-বার আমার পায়ে জড়িয়ে আমাকে পালিশ করা পিছল মেঝেতে ফেলে দেবার চেষ্টা করেছে। কয়েক পা পর-পর হেঁটে হাঁপিয়ে পড়েছি, একটু দাঁড়িয়ে দম নিচ্ছি বার-বার, পথ যেন অন্তহীন; যেখান দিয়ে চলেছি সেই বিরাট লম্বা করিডরে না আছে বাইরের কোন আভাস, না কোনো দোকানপাট বা লোকজন, অন্যমনস্ক হবার কোন উপায় নেই—শুধু আমাদের অনেক আগে আরো দু'চারজন যাত্রী দেখে অনুমান করছি যে ঠিক পথে চলেছি। পৃথিবীর কোনো-কোনো এয়ারপোর্ট নির্মমভাবে হাঁটিয়ে নেয় যাত্রীদের, বিজ্ঞান এত পেরেছে, আর এর কোনো প্রতিকার করতে পারে না? একবার কেউ ভাবে না যে যাত্রীরা সাধারণত ক্লান্ত থাকে, কিছু মাল সকলকেই নিজেকে বইতে হয়, আর এমন কোনো শর্তও করা যায় না যে, প্লেনের টিকিট কিনতে হ'লে ভীমতুল্য পুরুষ হ'তে হবে। একবার এই আইডলওয়াইল্ডেই—যখন ন্যু ইয়র্ক থেকে মাত্র শিকাগো যাচ্ছি—এক উল্টো অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছিল। যাত্রীদের শেষ যেখানটায় বসতে দিলে তার ঠিক বাইরেই, প্রায় দেয়ালে গা ঠেকিয়ে প্লেন দাঁড়িয়েছিলো, আমরা কল্পনাও করিনি যে-রকম হতে পারে, কিন্তু কয়েক পা হাঁটার পরেই একটা অন্ধকারের মধ্যে ঢুকতে হ'লো না, সিঁড়ি পর্যন্ত উঠতে হলো না, মাঠ পর্যন্ত পেরোতে হলো না,—সেটাই প্লেন। অন্য সব হাঁটাহাঁটির কথা ছেড়েই দিচ্ছি। আজকের দিনে এই রকমই হওয়া উচিত, কিন্তু দুঃখের বিষয়, পদাতিকবৃত্তির এই অতিকাম্য ও সম্ভবপর সংকোচন সেই একবার ছাড়া দেখিনি।

অবশেষে করিডরের অবসান দেখা গেলো, এইবার একটা সিঁড়ি বেয়ে আমাদের নামতে হবে। সরু সিঁড়ি, যাত্রীর ভীড়ে গিশ গিশ্ করছে; আমরা ভেবেই পেলাম না এত লোক কখন এবং কোত্থেকে এলো। হাঁটি-হাঁটি পা-পা ক'রে অগ্রসর হচ্ছি—ঐ যে প্লেন; যাক, বসতে পারা যাবে এতক্ষণে। কিন্তু প্লেনের মধ্যেও আমাদের সুখী হবার মতো কিছু ঘটলো না।

ঢুকেই মনে হলো, অন্যান্য বিমানের তুলনায় ব্যবস্থা এখানে কৃপণ। চেয়ারগুলো ছোট, সারিগুলোর মধ্যে ব্যবধান অল্পই, আমার মতো খর্বকায় ব্যক্তিকেও হাঁটু দু'টো নিয়ে বিব্রত হতে হলো। হাতমালগুলো গুছিয়ে রাখার সময় হোস্টেসের কোনো সাহায্য পাওয়া গেল না! ডিনারের সময় ট্রে-টা যেন বুকের উপর চেপে রইলো, স্থানের অভাবে হাতনাড়া সহজ হলো না; সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকতে হলো, পাছে কোনো থালা-বাটি উলটে পড়ে যায়। সন্ত্রস্ত থাকার আর-এক কারণ, আমার ডানদিকের বৃদ্ধা মহিলাটি। তাঁর মাথায় অদ্ভুত টুপি (মহিলারা ছাতের তলাতেও টুপি প'রে থাকতে

পারেন, যা পুরুষের নিষিদ্ধ), গলায় পায়রার ডিমের মতো বড়ো-বড়ো মুক্তোর মালা, আর তাঁর বসবার ভঙ্গিটি এমন, যেন উপস্থিত অন্য সকলেই তাঁর অন্যমনস্ক দৃষ্টিপাতেরও অযোগ্য। এমনিতে বসবার জায়গা ছোট, পায়ের তলায় আবার আমাদেরই কিছু হাত-মাল ছড়ানো, তার উপর এই গম্ভীরা দেবীকে প্রতিবেশী পেয়ে আমরা আরো বেশি আড়ষ্ট হ'য়ে রইলুম। একবার তাঁর হাঁটু ডিঙিয়ে আমাকে যখন উঠে যেতে হ'লো, আমি সেই অনিবার্য অপরাধের জন্য প্রভূতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করলেও তিনি প্রায় নীরব রইলেন; ফলে আমি মনে-মনে স্থির করলুম, যে আর যে-কটা ঘণ্টা এই বিমানবন্দী অবস্থায় আছি, এই আসন ছেড়ে ওঠার কোনো চেষ্টাই করবো না।

কিন্তু ডিনারের মধ্যপথে তিনি হঠাৎ আমাকে জিগ্যেস করলেন আমাদের দেশ কোথায়। তাঁর মুখে কথা শুনে আমি ব'র্তে গেলুম, মনে-মনে ধন্যবাদ দিলুম দ্রাক্ষাদেবতাকে, যিনি স্বভাবমূকের রসনাতেও দু'-একটা কথা জুড়িয়ে দিতে পারেন! 'আপনি বোধহয় আমেরিকান নন?' না, তিনি ইংরেজ; ভাগাভাগি ক'রে ইংলণ্ডে আর আমেরিকায় থাকেন; মানহাটানে ফ্ল্যাট আছে; এখন ফিরে যাচ্ছেন স্বদেশে তাঁর নিজের বাড়িতে। হঠাৎ একসঙ্গে এতগুলো কথা ব'লে ফেলে মহিলাটি অত্যন্ত অনুতপ্ত হলেন, পরমুহূর্তেই তাঁর মুখে ভাবলেশহীন গাম্ভীর্য ফিরে এলো।

শুধু তাঁরই নয়, আমাদের হোস্টেসদের মুখও ভাবলেশহীন। যদিও এক গ্লাস জলের জন্য আমাদের পাঁচবার প্রার্থনা ও আধঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়েছিলো, তবু এ-কথা সত্য যে অবশেষে আমরা জল পেয়েছিলাম, অতএব এ-কথা বলা যাবে না যে তারা কর্তব্য করেনি। হয়তো সবকিছুই করছে, কিন্তু সেই কর্মের কোনো শ্রী নেই; যে সেবিত হচ্ছে, সে হৃষ্ট বা কৃতজ্ঞ হ'তে পারছে না। মনে পড়লো এটা ইংরেজের বিষয়ে যুগে-যুগে বিদেশীরা যা ব'লে এসেছে, আজ মামুলী হ'লেও মিথ্যে হয়ে যায়নি। এই জেট-প্লেনের অভ্যন্তরও বৃটিশ শ্লেষ্মায় থমথম করছে, আবহাওয়া ধূসর ও নিস্তাপ, কেউ হাসে না, কোনো আমন্ত্রণ বা অভ্যর্থনা নেই—রসরক্তবর্জিত হ'য়ে কর্তব্যের কঙ্কাল শুধু উপস্থিত। মনে এলো জাপানী প্লেনের স্মৃতি, তার উদার ও সুন্দর আতিথেয়তা, মেয়েদের নম্রতা ও লাবণ্য; দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাইরের দিকে তাকালুম।

দীর্ঘায়িত ডিনার এতক্ষণে শেষ হয়েছে, অবশেষে হেলান দিয়ে বসতে পারছি, প্লেনের বাতি ম্লান হয়ে বিশ্রামের সংকেত জানালে। রাত এগারোটা, কিন্তু আকাশ এখনো পরিষ্কার দিন! বারোটা নাগাদ হালকা হয়ে রাত নামলো, তন্দ্রা আর অনারামের মধ্যে অস্পষ্টভাবে কেটে যেতে লাগলো

মুহূর্তগুলি। কিছুক্ষণ পরে তাকিয়ে দেখি, বাইরের রাত্রি এরই মধ্যে লুঠ হয়ে গেছে, আকাশের রং পাণ্ডুর। দেখতে-দেখতে আলো হয়ে গেলো চারিদিক, রোদ ফুটলো।

হঠাৎ মাইক্রোফোনে ঘোষণা শুনলাম, 'এখন লণ্ডনের বেলা সাতটা আমরা একটু পরেই ব্রেকফাস্ট পরিবেশন করছি।' আমাদের হাতের ঘড়ি পাঁচ ঘণ্টা এগিয়ে দিতে হলো।

* * *

লণ্ডনে এসে প্রথমেই অনুভব করলাম—শীত। এই উত্তরদ্বীপে গ্রীষ্ম নেই, শুধু অধিক আর অল্প শীত আছে; জুন মাসের রোদ্দুরের দিনেও ওভারকোটের আলিঙ্গন ছাড়া যায় না। ইংরেজরা এতেই আবহমানভাবে অভ্যস্ত; বিদেশীরা এতে কষ্ট পায় শুনলে তারা মৌখিক সহানুভূতি জানায়, কিন্তু মনে-মনে অবাক না হয়ে পারে না যে, এমন চমৎকার ঠাণ্ডাও কোনো মনুষ্যরূপ জীবের অপ্রিয় বোধ হতে পারে। ক্লাবের মতো, ক্রিকেটের মতো, চিরজীবী রাজা অথবা রাণীর মতো, এই শীতেও তাদের বৈশিষ্ট্যের একটি প্রতীক, গৌরবের একটি অভিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক উপায়ে তা নিবারণের চেষ্টা তাদের মতে অকুলীনের লক্ষণ। আমেরিকার কেন্দ্রতাপন—তা অন্যান্য সাধারণ মানুষের পক্ষে যতই উপাদেয় হোক, ইংরেজের তা অনুমোদনের অযোগ্য, নিজের দেশে সেই ব্যবস্থাকে তারা বেশীদূর প্রশ্রয় দেয়নি;—তথাকথিত গ্রীষ্মকালে ইংলণ্ডে এসে আপনি যদি শীতে না কাঁপেন, আমি বলবো আপনি মহাবল অথবা ভাগ্যবান পুরুষ। আমি কেঁপেছি নানা স্থানে —নানা সময়ে—ট্যাক্সিতে রাত্রে, পার্কে বিকেলে, কোনো আপিশে বসে দুপুরবেলা (হা ভগবান, কৃত্রিম তাপ নেই, আবার শার্সিও খুলে রাখে এরা!), অন্য এক গ্রীষ্মে অক্সফোর্ডে এক রাত্রে শীত প্রায় কাঁদিয়ে ছেড়েছিলো আমাকে। ঘরের কোণে খুদে একটা তাপযন্ত্র ছিলো, সেটার কোনো এক ছিদ্রপথে একটি করে শিলিং ফেলে দিলে ঘণ্টাখানেক ঠিক সেটুকু তাপ দিবে, যাতে পা দু'টো হিম হয়ে জমে না যায়। আবার যন্ত্রটি যেখানে বসানো তা থেকে বিছানা বেশ দূরে, ঐ ক্ষীণ তাপটুকু পেতে হলেও কুঁজো হয়ে চেয়ারে বসে থাকা চাই। বার দুই শিলিং নিক্ষেপ করার পরে আমার মনো হলো যে, মরুভূমিতে যেমন জল, তেমনি তাপও এখানে মরীচিকা মাত্র; কষ্ট যদি পেতেই হয়, তাহ'লে অন্তত রানীমার্কা টাকাও বাঁচানো যাক; কাঁপতে-কাঁপতে কম্বলের তলায় কুঁকড়ে ঢুকে গেলাম, আর শুয়ে-শুয়েও সারারাত ধরে কাঁপতে হলো।

আজও আমরা প্রথমে যে হোটেলটায় উঠলাম, তার লাউঞ্জে ঢোকামাত্র

এমন শীত লাগলো, যে ওভারকোট পর্যন্ত খোলা চলে না। এখানেও আছে বৈদ্যুতিক তাপযন্ত্র, আমাদের অনুরোধে কেউ একজন সেটা চালিয়েও দিলে, কিন্তু তার ফলে অবস্থার কোনো পরিবর্তন অনুভূত হলো না। এক পেয়ালা চা আর একখণ্ড বিস্কুটের সাহায্যে দেহে কিঞ্চিৎ উত্তম সঞ্চারের চেষ্টা করা গেলো। উত্তমের প্রয়োজন ছিলো আমাদের; এই হোটেল ভুল করে আমাদের যে ঘর দিয়েছে ত'র সংলগ্ন বাথরুম নেই, আর সকালবেলা তোয়ালে কাঁধে দরজার বাইরে আমি দাঁড়িয়ে থাকতে নারাজ। মিসেস এম্—, আমাদের গাইড, স্থানীয় এক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি তিনি, অন্য হোটেলে টেলিফোন করার জন্য উঠে গেলেন। একটু পরে ফিরে হাসি-মুখে বললেন, 'চলুন—পেয়েছি।'

'আলাদা বাথরুম আছে তো?'

'আছে বইকি।'

এই দ্বিতীয় হোটেলটার বাইরের চেহারা কেমন ছিলো তা আমি এরই মধ্যে ভুলে গেছি, কিন্তু এক জরাজীর্ণ লিফটে চড়িয়ে সরু বারান্দা বেয়ে যে-ঘরটাতে আমাদের নিয়ে আসা হ'লো, তার দিকে দৃষ্টিপাতের বিস্ময়ে আমার বহুকাল মনে থাকবে। ঘরের আয়তন এমন যে খাট আর টেবিল বাদ দিয়ে মেঝে বলতে বিশেষ কিছু নেই, যেটুকু বা ছিলো তাও আমাদের বাক্স-তোরঙ্গে ভ'রে গেছে, দরজা থেকে লাফিয়ে খাটে ওঠার দশা, এরই মধ্যে দাঁড়াই কোথায়, বসি কোথায়, আর মালপত্রই বা খুলি কেমন ক'রে—'বাথরুম? বাথরুম কোথায়?' 'কেন—ঐ যে!' একটি যুবক ভৃত্য দেয়ালের গা থেকে প্লাষ্টিকের পর্দা সরিয়ে দিলে, অন্ধকারে চোখ মিটমিট ক'রে আন্দাজে বুঝলুম যে সেই খুপরিতে দু'টো শাওয়ার বসানো আছে। এরা কি পাগল? এই শীতের দেশে ঘরের মধ্যে শাওয়ার খুলে স্নান করবে কে?

'এই শাওয়ার—'যুবকটি বুঝিয়ে বললে, 'এই বেসিনে হাত মুখ ধোবেন, অন্যান্য প্রয়োজনের জন্য দোতলায় নেমে যেতে হবে—ঐদিকে সিঁড়ি।' আমরা হতভম্ব।

'ম্যাডাম, আমরা এক রাত্রিহীন দিন ও নিদ্রাহীন রাত্রি কাটিয়ে অসংস্কৃত অবস্থায় আপনাদের দেশে পৌঁছেছি; এয়ার-পোর্টে পৌঁছবার পর তিনঘণ্টা কেটে গেলো, এর মধ্যে বলতে গেলে একবার বসিনি, ঘোরাঘুরির উপরেই আছি। স্নানের, প্রসাধনের, বিশ্রামের প্রয়োজন আমাদের জরুরী, কিন্তু এই হোটেলের এই ঘরে তার কোনোটাই সাধিত হবার আশা দেখছি না। আমরা ধ'রে নিচ্ছি আপনি জানতেন না এই ঘরটা কেমন হবে, হয়তো আমাদের মতোই অপ্রস্তুত হয়েছেন, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি যে এক্ষুণি

আবার তৃতীয় হোটেলের জন্য সচেষ্ট হ'তে বললে আপনার মন উৎফুল্ল হ'য়ে উঠবে না। আপনাকে কষ্ট দিতে হলো, ব'লে আমরা গভীরভাবে ক্ষমাপ্রার্থী; আমরা জানি, এই মহানগরীর সব হোটেলেই এখন ভীড়াকান্ত, আমাদের তৃতীয় চেষ্টাও বিফল হ'তে পারে, তবু, আমরা অদৃষ্টবাদীহিন্দু হ'য়েও, এ-ক্ষেত্রে পুরুষকারে নির্ভর করতে বাধ্য হচ্ছি, বাধ্য হচ্ছি আপনাকে বলতে যে আমরা এই কক্ষরূপ পিঞ্জর থেকে এ-মুহূর্তে বেরিয়ে পড়তে চাই। শুধু নিজের জন্য নয়, আপনার জন্যেও বলছি এ-কথা। আপনিই বলুন, যদি আমাদের এই ঘরে একটা দিনও কাটাতে হয়, তা'হলে কি আপনাদের বিখ্যাত রাজধানী বিষয়ে একটা বিশ্রী ভুল ধারণা নিয়ে আমরা ফিরে যাবো না? লণ্ডনের হোটেল যে বৌবাজারের মেস-এর নামান্তর নয়, "বাথরুম" বলতে ঠিক কি বোঝায় তা যে আপনার স্বজাতির জানা আছে, অন্তত সেটুকু তো প্রমাণ হওয়া চাই? ভাববেন না আমরা সস্তা বাসা খুঁজছি, সাধ্যের অতীত খরচ করতে বলেন তো তা-ই করবো, তবু আমরা একটু জেনে যেতে চাই যে সভ্যতার ভারবাহী এই নগরে ন্যূমোনিয়া বিষয়ে নিঃশঙ্ক হয়ে স্নান, এবং অন্যান্য বিষয়ে আমাদের মতো বিদেশী অতিথির স্বাচ্ছন্দ্যসাধন সম্ভব। অতএব আমাদের অন্য যে-কোনো স্থানে নিয়ে চলুন, শুধু অনুগ্রহ ক'রে এমন কোথাও নিয়ে যাবেন না, যেখানে আমরা বর্ণের জন্য বর্জিত হবো।'

এই স্বগতোক্তি আমার মনের মধ্যে নিঃশব্দে ওঠা-পড়া করলে, শুধু এর চুম্বকটুকু দু'-চার কথায় মিসেস এম-কে শুনিয়ে দিলুম। তাঁর মুখে প্রত্যাশিত ছায়া পড়লো।

দুর্ভোগ্যের কথা আর বাড়িয়ে লাভ কি, সংক্ষেপে বলি। আমরা কয়েক মিনিটের মধ্যে পুনশ্চ বাক্স-প্যাঁটরা নিয়ে গাড়িতে উঠলুম, হাইড পার্ক অতিক্রম ক'রে যেখানে পৌঁছলুম, সেই বাসাটা নেহাৎ মন্দ নয়। ঘর ছোট, কিন্তু রাস্তার দিকে বড়ো-বড়ো জানলা আছে, আছে সত্যিকারের একান্ত বাথরুম, তিনজন রোগা লোক ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে দাঁড়াতে পারে এমন একটি আলমারির আকারের লিফটও আছে। এক-তলায় খাবার ঘর; আর দোতালায় লাউঞ্জ থেকে চোখে পড়ে হাইড পার্কের সবুজ বিস্তার, দুপুরে, বিকেলে রোদে লুটিয়ে পড়ে সেই ঘর দুটিতে, দীর্ঘদিন শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত তার অন্তরাগের আলো বিলিয়ে যায়। রোদ, আলো, একটু শারীরিক আরাম—এতে আমাদের মনের অবস্থায় মুহূর্তে কি তফাৎ ঘটিয়ে দেয়! স্নানের পরে যখন লাঞ্চে যাবার উদ্যোগ করছি, তখন এলেন আমাদের পুরনো বন্ধু, বাঙালী অধ্যাপক; তাঁর চুল সাদা, মুখ সৌম্য ও হাস্যমণ্ডিত, পরনে কুচকুচে কালো দিশি ছাটের ইজের কোর্তা।

ইনি দীর্ঘকাল প্রবাসী বলতে গেলে কর্মজীবন ইউরোপেই কাটিয়েছেন, কিন্তু তার বাঙালীত্ব একতিল ক্ষুণ্ণ হয়নি—না ভাষায়, না ব্যবহারে, না ব্যক্তিত্বে, এবং ধ্যানধারণা যতখানি পশ্চিমী হয়েছে, তা কলকাতায় ব'সেও অনেকেরই হয়ে থাকে। এই প্রবীণ, সহৃদয়, ও সুদর্শন ও সদালাপী পণ্ডিতকে দেখে আমরা বারো ঘণ্টার দুঃখের স্মৃতি ভুলে গেলাম ; বিশ্রামের প্রয়োজন আমার আর তেমন জরুরী বলে মনে হ'লো না। অবশিষ্ট দিন তাঁরই সঙ্গে কাটলো আমাদের।

অরন্ধনের নিমন্ত্রণ

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

এক-একজন লোকের স্বভাব বড়ো খারাপ। বকুনি ভিন্ন তারা একদণ্ডও থাকতে পারে না, শ্রোতা পেলে বকে যাওয়াই তাদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সুখ। হীরেন ছিল এই ধরনের মানুষ। তার বকুনির জ্বালায় সকলে অতিষ্ঠ। অফিসে যারা তার সহকর্মী, শেষ পর্যন্ত তাদের অনেকের স্নায়ুর রোগ দেখা দিলে, অনেকে চাকরি ছাড়বার মতলব ধরলে।

সব বিষয়ের প্রতিভার মতই বকুনী-প্রতিভাও পৈতৃক শক্তির আবশ্যক রাখে। হীরেনের বাবার বকুনিই ছিল একটা রোগ। শেষ বয়সে তাঁকে ডাক্তার বারণ করেছিল, তিনি বেশি কথা যেন না বলেন। তাতে তিনি জবাব দিয়েছিলেন, তবে বেঁচে থাকাটা কি ডাক্তারবাবু? যদি দু' একটা কথাই কারোর সঙ্গে বলতে না পারলুম। কথা বলতে-বলতেই হৃদপিণ্ড দুর্বল হবার ফলে তিনি মারা যান। মার্ডার টু দি কজ।

এ হেন বাপের ছেলে হীরেন, বাইশ বছরের যুবক, আপিসে কাজ করে, আবার রামকৃষ্ণ মঠেও যাতায়াত করে, বিবাহ করার ইচ্ছে নেই। শুনেছিলাম সন্ন্যাসী হয়ে যাবে। এতদিনে হয়েও যেত, কিন্তু রামকৃষ্ণ আশ্রমের লোকেরা এ বিষয়ে তাকে উৎসাহ দেয়নি; হীরেন সন্ন্যাসী হয়ে দিন-রাত মঠে থাকতে শুরু করলে এক মাসের মধ্যেই মঠ জনশূণ্য হয়ে পড়বে।

হীরেনের এক বৃদ্ধা পিসিমা থাকতেন দূর পাড়াগাঁয়ে, স্টেশন থেকে দশ-বারো ক্রোশ নেমে যেতে হয় এক গ্রামে। পিসিমার আর কেউ নেই, হীরেন সেখানে একবার পিসিমাকে দেখতে গেল। বুড়ী অনেকদিন থেকেই দুঃখ করে চিঠিপত্র লিখছিল।

সে গ্রামের সবাই এতদিন জানতো যে, তাদের কুমী অর্থাৎ কুমুদিনীর মতো বকুনিতে ওস্তাদ মেয়ে সে অঞ্চলে নেই। কুমীর বাবা গ্রাম্য পুরোহিত ছিলেন। কিন্তু যেখানে যখন পুজো করতে যেতেন, আগ্‌ডুম-বাগ্‌ডুম বকুনির জ্বালায় যজমান ভিটে ছেড়ে পালাবার জোগাড় করতো, বিয়ের লগ্ন উত্তীর্ণ হবার উপক্রম হত।

কুমীর বাপের বকুনি-প্রতিভার একটা বড় দিক ছিল এই যে, তার বকুনির জন্য কোন বস্তুর প্রয়োজন হত না। যত তুচ্ছ বিষয়ই হোক না

কেন, তিনি তাই অবলম্বন করে বিশাল বকুনির ইমারত গড়ে তুলতে পারতেন, মনে যথেষ্ট উৎসাহ ও শক্তি এবং সঙ্গে-সঙ্গে অসাধারণ বলবার ও ছবি গড়বার ক্ষমতা না থাকলে মানুষে এমন বকতে পারে না বা শ্রোতাদের মনোযোগ ধরে রাখতে পারে না। তার মৃত্যুতে গ্রামের সকলেই দুঃখ করে বলেছিল—আজ থেকে গ্রাম নিঝুম হয়ে গেল।

দু'একজন বলেছিল—এবার আমসত্ব খুব সাবধানে রৌদ্রে দিও, মুখুজ্যে মশায় মারা গিয়েছেন, কাক-চিলের উৎপাত বাড়বে। অর্থাৎ তাদের মতে গাঁয়ে এতদিন কাক-চিল বসতে পারত না মুখুজ্যে মশায়ের বকুনির চোটে। নিন্দুক লোক কোন্ জায়গায় নেই ?

কিন্তু হায়! নিন্দুকের আশা পূর্ণ হয় নি বা মুখুজ্যে মশায়ের হিতাকাঙ্ক্ষীদের দুঃখ করবারও কারণ ঘটেনি। মুখুজ্যে মশায় তাঁর আট বৎসরের মেয়ে কুমীকে রেখে গিয়েছিল। পিতার দুর্লভ বাক্-প্রতিভার অধিকারিণী হয়েছিল মেয়ে। এমন কি তার হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে অনেকেই সন্দেহ করলেন যে, মেয়ে তার বাপকে ছাড়িয়ে না যায়। সেই কুমীর বয়স এখন তেরো চোদ্দ। সুশ্রী, উজ্জ্বল, শ্যামবর্ণ, কোঁকড়া-কোঁকড়া একরাশ চুল মাথায়, বড়-বড় চোখ, মিষ্টি গলার সুর, একহারা গড়ন, কথার খই, কথায় খিল-খিল হাসি, মুখে বুকনি ফুটছে দিনরাত।

শুভক্ষণে দু'জনের দেখা হল। হীরেন সকালবেলা পিসিমার ঘরের দাওয়ায় বসে প্রাণায়াম অভ্যাস করবার চেষ্টা করছে, এমন সময় পিসিমা আপন মনে বললেন—দুধ কি আজ দিয়ে যাবে না ? বেলা যে তেতপ্পর হল - ছেলেটা যে না খেয়ে শুকিয়ে বসে আছে, একটু চা করে দেব, তার দুধ নেই—আগে জানলে রাতের বাসি দুধ রেখে দিতাম যে—

রাতের বাসি দুধ রোজ রাখো কিনা—বলতে-বলতে একটি কিশোরী এক ঘটি দুধ হাতে বাড়ীর পেয়ারা গাছটার তলায় এসে দাঁড়াল।

পিসিমা বললেন—দুধের ঘটিটা রান্না ঘর থেকে বের ক'রে নিয়ে আয় দিকি, এনে দুধটা ঢেলে দে—

কিশোরী চঞ্চল লঘুপদে রান্না ঘরের মধ্যে ঢুকল, দুধ ঢেলে যথাস্থানে রেখে এসে আমতলায় দাঁড়িয়ে হাসিমুখে বললে—শোন ও পিসি, কাল কি হয়েছে জানো ?—হি—হি—

পিসিমা বললেন—কি ?

এই কথার উত্তরে আমতলায় দাঁড়িয়ে মেয়েটি হাত-পা নেড়ে একটা গল্প জুড়ে দিল—কাল দুপুরে নাপিত বাড়িতে ছাগল ঢুকে নাপিত বৌ যে কাঁথা পেতেছিল, সে কাঁথা চিবিয়ে খেয়েছে। এইমাত্র ঘটনাংশ

গল্পের। কিন্তু সে-কি বলবার ভঙ্গি, সে-কি কৌতুকপূর্ণ কলহাসির উচ্ছ্বাস, সে-কি হাত পা নাড়ার ভঙ্গি; পিসিমার চায়ের জল গরম হ'ল, চা ভিজানো হ'ল, হাওয়া তৈরি হ'ল, পেয়ালার ঢালা হ'ল—তবুও সে গল্পের বিরাম নেই।

পিসিমা বললেন—ও কুমী মা, একটু ক্ষান্ত দাও, সকালবেলা আমার অনেক কাজকর্ম আছে—তোমার গল্প শুনতে গেলে সারা দুপুরটা যাবে—এই চা-টা আর খাবারটুকু তোর এক দাদা···ওই বড় ঘরে দাওয়ায় বসে আছে দিয়ে আয় দিকি।

কুমী বিস্ময়ের সুরে বললে—কে পিসি?

তুই চিনিস্ নে, আমার বড় জ্যেঠতুতো ভায়ের ছেলে—কাল রাত্তিরে এসেছে—তবে চা তৈরি করবার আর এত তাড়া দিচ্ছি কি জন্যে? তুই কি কারো কথা শুনতে পাস, নিজের কথা নিয়েই বে-হাতি—

কুমী সলাজ মুখে চা ও খাবার দাওয়ার ধারে রেখে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু হীরেন তাকে অত সহজে যেতে দিতে প্রস্তুত নয়। সে কুমীর নাপিত বাড়িতে ছাগলের কাঁথা চিবানোর গল্প শুনেছে এবং মুগ্ধ, বিস্মিত, পুলকিত হয়েছে এইটুকু মেয়ের ক্ষমতায়।

সে বললে—খুকী, তোমার নাম কি?

—কুমুদিনী—

হীরেন বললে—এই গাঁয়েই বাড়ি তোমার বুঝি? ও পাড়ায়? তা ছাগলের কথা কি বলছিলে? বেশ বলতে পার—

কুমী লজ্জায় ছুটে পালাল।

কিন্তু কুমুদিনীকে আবার কি কাজে আসতে হল। হীরেনের সঙ্গে একটু-একটু করে পরিচয় হয়েও গেল। দু'জন-দু'জনের গুণের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ। দু'জনেই ভাবে এমন শ্রোতা কখনো দেখি নি। তিন দিন পরে দেখা গেল পিসিমার দাওয়ার সামনে উঠোনে দাঁড়িয়ে কুমী এবং দাওয়ার খুঁটি হেলান দিয়ে বসে হীরেন ঘণ্টাখানেক ধরে পরস্পরের কথা শুনছে, হীরেন অনর্গল বকে যাচ্ছে, কুমী শুনছে—আর কুমী যখন অনর্গল বকছে তখন, হীরেন মন দিয়ে শুনছে।

সেবার পাঁচ-ছ'দিন পিসিমার বাড়ি থেকেই হীরেন চলে এল।

কুমী যাবার সময় দেখা করলে না বলে হীরেন খুব দুঃখিত হ'ল, কিন্তু হীরেন চলে যাবার পরে কুমী দু'তিনদিন মনমরা হয়ে রইল, মুখে হাসি নেই, কথা নেই।

বুড়ী পিসিমার প্রতি হীরেনের টানটা যেন হঠাৎ বেড়ে উঠল। যে হীরেন দু'বছর তিন বছরেও অনেক চিঠিপত্র লেখা সত্ত্বেও এদিকে বড় একটা

মাড়াতো না, সে ঘন-ঘন পিসিমাকে দেখতে আসতে শুরু করলো।

আজ বছর দুই আগের কথা। হীরেনকে পিসিমা বলেছিলেন—হীরু বাবা, যদি এলি তবে আমার একটা উপকার করে যা। আমার তো কেউ দেখবার লোক নেই তোরা ছাড়া। নবস্থপুরের ধরণী বগমারের কাছে একগাদা টাকা পাব জমির খাজনার দরুন। একবার গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করে টাকাটার একটা ব্যবস্থা করে আয় না বাবা?

হীরেন এসেছে দু'দিন পিসিমার বাড়ি বেড়িয়ে আম খেয়ে স্ফূর্তি করতে। সে জষ্ঠি মাসের দুপুর রোদে খাজনার তাগাদা করে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরতে আসে নি। কাজেই নানা অজুহাত দেখিয়ে সে পরদিন সকালেই সরে পড়েছিলো। এখন সেই হীরেন স্বতঃপরবৃত্ত হয়ে একদিন বললে পিসিমা, তোমার এই নবস্থপুরের প্রজার বাকি খাজনার কিছু হয়েছে? যদি না হয়ে থাকে, তবে এই সময় দাও, না হয় একবার নিজেই যাই। এখন আমার হাতে তেমন কাজকর্ম নেই, তাই ভাবছি তোমার কাজটা করে দিয়ে যাই।

ভাইপোর সুমতি হচ্ছে দেখে পিসিমা খুব খুশী।

হীরেন সকালে উঠে নবস্থপুরে যায়, দুপুরের আগেই ফিরে এসে সেই যে বাড়ি ঢোকে আর সারাদিন বাড়ি থেকে বেরোয় না। কুমীকেও প্রায়ই দেখা যায় পিসিমার উঠোনে, নয়তো আমতলায়, নয়তো দাওয়ার পইঠাতে বসে হীরুদার সঙ্গে গল্প করতে। কাক-চিল পাড়ায় আর বসে না।

জ্যোৎস্না উঠেচে। কুমী বললে—চললুম হীরুদা।

—এখনই যাবি কেন বোস একটু—

উঠোনের ধারে একটা নালা। হঠাৎ কুমী বললে—জ্যোৎস্না রাতে এলোচুলে লাফিয়ে নালা পার হলে ভূতে পায়। আমায় ভূতে পাবে দেখবে দাদা—হি হি-হি,হি—তারপর লাফালাফি করে নালাটা বারকতক এপার-ওপার করছে, এমন সময় ওর মা ডাক দিলেন—ও পোড়ামুখী মেয়ে, এই ভরা সন্ধ্যেবেলা তুমি ও কি করছ? তোমায় নিয়ে আমি যে কি করি? ধিঙ্গী মেয়ে, এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান যদি তোমার থাকে?

হীরেন ভালো মানুষের মতো মুখখানি করে হ্যারিকেন-লণ্ঠনটা মুছে পরিষ্কার করতে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

মায়ের পিছু-পিছু কুমী চলে গেল, একটু অনিচ্ছার সঙ্গেই গেল, মুখে তার অপ্রতিভের হাসি। হীরেন মন-মরা ভাবে লণ্ঠনের সামনে কি একখানা বই খুলে পড়তে বসবার চেষ্টা করলে।

মাসের পর মাস যায়, বছরও ঘুরে গেল। নতুন বছরের প্রথমে

হীরেনের চাকরিটা গেল, আপিসের অবস্থা ভাল নয় ব'লে। এই এক বছরের মধ্যে হীরেন পিসিমার বাড়ি আরও অন্ততঃ দশবার এল গেল এবং এক বছরের মধ্যে হীরেন বুঝেছে, কুমীর মতো মেয়ে জগতে আর কোথাও নেই। বিধাতা একজন মাত্র কুমীকে সৃষ্টি করেছেন। কি বুদ্ধি, কি রূপ, কি কথাবার্তা বলার ক্ষমতা, কি হাত নাড়ার ললিত ভঙ্গি, কি লঘুগতি চরণছন্দ।

প্রস্তাবটা কে উঠিয়েছিল জানি নে, বোধহয় হীরুর পিসিমাই। কিন্তু কুমুদিনীর জ্যাঠামশাই সে প্রস্তাবে রাজী হন নি, কারণ তাঁরা কুলীন; হীরেনরা বংশজ। কুলীন হয়ে বংশজের হাতে দিয়ে দেবেন তিনি, একথা ধারণা করাই অন্যায়।

হীরু শুনে চটে গিয়ে পিসিমাকে বললে—কে তোমায় বলেছিল পিসিমা, ডেকে অপমান ঘরে আনতে? আমি তোমার পায়ে ধরে সেধেছিলুম কুমীর সঙ্গে আমার বিয়ে দাও? সবাই জানে আমি বিয়ে করব না, আমি রামকৃষ্ণ আশ্রমে ঢুকব। সব ঠিকঠাক হয়ে গিয়েছে, এবার এই ইয়েটা মিটে গেলেই—

কুমীর কানে কথাটা গেল যে, হীরু এই সব বলেছে। সে বললে হীরুদাকে বিয়ে করতে আমি পায়ে ধরে সাধতে গিয়েছিলুম যে! বয়ে গেল—সন্ন্যাসী হবে তো আমার কি?

হীরু তল্পী বেঁধে পরদিনই পিসিমার বাড়ি থেকে নিজের বাড়ি চলে গেল। হীরুর বাড়ীর অবস্থা এমন কিছু ভাল নয়। এবার তার কাকা আর মা একসঙ্গে বলতে শুরু করলেন—সে যেন একটা চাকরির সন্ধান দেখে। বেকার অবস্থায় বাড়ী বসে কতদিন আর চলবে?

হীরুর কাকার এক বন্ধু জামালপুরে রেলওয়ে কারখানার বড়বাবু, কাকার পত্র নিয়ে হীরু সেখানে গেল এবং মাস দুই তাঁর বাসায় বসে বসে খাওয়ার পর কারখানার আপিসে ত্রিশ টাকা মাইনের একটা চাকরি পেয়ে গেল।

লাল টালি-ছাওয়া ছোট্ট কোয়ার্টারটি হীরুর। বেশ ঘর-দোর, বড়-বড় জানালা। জানালা দিয়ে মারক পাহাড় দেখা যায়; কাজকর্মের অবসরে জানালা দিয়ে চাইলেই চোখে পড়ে টানেল দিয়ে ধোঁয়া উড়িয়ে ট্রেন যাচ্ছে-আসছে। শান্টিং ইঞ্জিনগুলো, ঝক-ঝক শব্দ করে পাহাড়ের নীচে সাইডিং লাইনের মুড়োয় গিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে। কয়লার ধোঁয়ায় দিনরাত আকাশ-বাতাস সমাচ্ছন্ন।

একদিন রবিবারে ছুটির ফাঁকে—সে আর তার কাকার বন্ধু সেই বড়-

বাবুর ছেলে মণি, মারুক পাহাড়ের ধারে বেড়াতে গেল। মণি ছেলেটি বেশ পাটনা ইউনিভার্সিটি থেকে বি-এস-সি দিয়েছে এবার, তার বাবার ইচ্ছে কাশী হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে তাঁকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ানো। কিন্তু মণির তা ইচ্ছে নয়, সে কলকাতার সায়েন্স কলেজে অধ্যাপক রমেনের কাছে ফিজিক্স পড়তে চায়। এই নিয়ে বাবার সাথে তার মনান্তর চলছে। হীরু জানতো এসব কথা।

বিকাল বেলা। জামালপুর টাউনের আওয়াজ ও ধোঁয়ার হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে ওরা দক্ষিণ দিকে পাহাড়ের ওপর দিয়ে অনেকটা চলে গিয়েছে। নীল অতসী ও বনতুলসীর জঙ্গল হয়ে আছে পাহাড়ের মাথায় সেই জায়গাটায়। ঘন ছায়া নেমে আসছে পূর্ব-দিকে শৈলসানুতে, একটি বন্য লতায় হলদে ক্যামেলিয়া ফুলের মতো ফুল ফুটেচে, খুব নীচে কুলী-মেয়েরা পাহাড়তলীর লম্বা লম্বা ঘাস কেটে আঁঠি বাধচে। পূর্বদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় সমতল মাঠ, ভুট্টাক্ষেত খোলার বস্তি, কেবল দক্ষিণে, পূর্ব-পশ্চিমে টানা পাহাড়শ্রেণী ও শালবন থৈ-থৈ করচে, আর সকলের ওপরে উপুড হয়ে পড়চে—নিকট থেকে দূরে সুদূরে প্রসারিত মেঘমুক্ত সুনীল আকাশ।

একটা মহুয়াগাছের তলায় বসে মণি বাড়ী থেকে আনা স্যাণ্ডউইচ, ডিমসিদ্ধ, রুটি এবং জামালপুর বাজার থেকে কেনা জিলাপী একখানা খবরের কাগজের ওপর সাজালো—থার্মোফ্ল্যাস্ক খুলে চা বার করে একটা কলাই করা কাপে ঢেলে বললে—এসো হীরুদা—

দেখলে, হীরু অন্যমনস্ক ভাবে মহুয়াগাছের গুড়িটা ঠেস দিয়ে সামনের দিকে চেয়ে বসে আছে।

—খাবে এসো, কি হ'ল তোমার হীরুদা?

হীরু নিরুৎসাহ ভাবে খেতে লাগল। সারা বিকালটি যতক্ষণ পাহাড়ের ওপর ছিল, কেমন যেন অন্যমনস্ক, উদাস—কি যেন একটা ভাবচে। মণি ভাবলে, পাহাড়ে বেড়ানোটাই মাটি হয়ে গেল হীরুদার জন্য। পাহাড় থেকে নামবার পথে হীরু বললে—মণি, একটি মেয়েকে বিয়ে করবে ভাই?

মণি হো-হো করে হেসে উঠে বললে—কি ব্যাপার বলতো হীরুদা? তোমার আজ হয়েচে কি?

—কিছু হয়নি, বলো না মণি? একটি গরীবের মেয়েকে বিয়ে ক'রে দায় উদ্ধার করো না—তোমার মতো ছেলের—

—কি; তোমার কোনো আপনার লোক? তোমার নিজের বোন নাকি?

—বোন না হ'লেও বোনের মতই। বেশ দেখতে মেয়েটি, সুশ্রী

বুদ্ধিমতি।

—আমার কথায় তো কিছু হবে না, তুমি বাবা-মাকে বলো। একে তো লেখাপড়া নিয়েই বাবাকে চটিয়ে রেখেছি, আবার বিয়ে নিয়ে চটালে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। বাবার মেজাজ বোঝো তো?

রাত্রে নিজের ছোট্ট বাসাটিতে হীরু কথাটা আবার ভাবলে। আজ পাহাড়ের উপর উঠে তার কেমন সব গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। কুমীর কথা তাহ'লে সে মোটেই ভোলে নি। নীল আকাশ, নির্জনতা, ফুটন্ত বন্যক্যামেলিয়া ফুল, বনতুলসীর গন্ধ—সবসুদ্ধ মিলে একটা বেদনার মতো তার মনে এনে দিয়েচে কুমীর হাসিভরা ডাগর চোখ দুটি স্মৃতি, তার হাত নাড়ার ললিতভঙ্গি। তার অনর্গল বকুনি···সে-তো সন্ন্যাসী হ'য়ে যাবে রামকৃষ্ণ আশ্রমে সবাই জানে, মিথ্যেই পিসিমা কুমীর মাকে বিয়ের কথা গিয়েছিলেন বলতে। কিন্তু কুমীকে জীবনে সুখী করে দিয়ে যেতে হবে। এটা তার একটা কর্তব্য।

সাহসে ভর ক'রে মণির বাপের কাছে সে প্রস্তাবটা করলে। হীরুকে মণির বাপ-মা স্নেহ করতেন; তাঁরা বললেন—মেয়ে যদি ভালো হয়, তাঁদের কোন আপত্তি নেই। তাঁরা চাকরি উপলক্ষ্যে পশ্চিমে থাকেন এ অবস্থায় স্ব-ঘরের মেয়ের সন্ধান পাওয়াও কঠিন বটে। যখন সন্ধান পাওয়া গিয়েচে ভালো মেয়ের—আর মণির বিয়ে যখন দিতেই হবে, তখন মেয়েটিকে দেখে আনতে দোষ কি?

কুমীর জ্যাঠাকে আগেই চিঠি লেখা হয়েছিল, কিন্তু তাঁরা সমস্ত জিনিষটাকে অবিশ্বাস করে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। অত বড়লোকের ছেলেকে জামাই করার দুরাশা তাঁদের নেই। হীরুর যেমন বুদ্ধি।

কিন্তু হীরু পূজোর ছুটিতে সত্যিই মণির এক জ্যাঠতুতো দাদাকে মেয়ে দেখাতে নিয়ে এল।

কুমী এসে হীরুর পায়ের ধুলো নিয়ে নমস্কার করলে।

হীরু বললে—ভালো আছিস কুমী?

—এতদিন কোথায় ছিলে হীরুদা?

—চাকরি করছি যে পশ্চিমে জামালপুরে। সাত-আট মাস পরে দেশে ফিরচি।

—ও কাকে সঙ্গে করে এনেচ?

হীরু কেসে গলা পরিষ্কার করে বললে—ও এক বন্ধুর দাদা—

—তা এখানে এসেছে কেন?

—এসেছে গিয়ে ইয়ে—এমনি বেড়াতেই এসেচি ধরো—তবে—

—তোমার আর ঢোক গিলতে হবে না। আমি সব জানি, কেন ওসব চেষ্টা করছ হীরুদা?

হীরু বললে—যাও—অমন করো না ছিঃ; চুল-টুল বেঁধে দিতে বলো গিয়ে। ওঁরা খুব ভাললোক, আর বড়লোক। জামালপুরে ওঁদের খাতির কি! আমি অনেক কষ্টে ওঁদের এখানে এনেচি। বড় ভালো হবে, এ বিয়ে যদি ভগবানের ইচ্ছেয় হয়—

অনেক কষ্টে কুমীকে রাজী করিয়ে তার চুল বাঁধা হ'ল, মেয়ে দেখানোও হ'ল। দেখানোর সময় মেয়ের অজস্র গুণ ব্যাখ্যা করে গেল হীরু। কুমী কিন্তু পাঞ্জাব প্রদেশ কোন দিকে, তা বলতে পারলে না, তাজমহল কে তৈরী করেছিল, সে সম্বন্ধেও দেখা গেল সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। হাতের লেখা বেঁকে গেল। গান গাইতে জানে না বললে—যদিও সে ভালোই গাইতে জানে এবং তার গলার সুরও বেশ ভালো।

সঙ্গের ভদ্রলোকটির মেয়ে দেখা শেষ ক'রেই ফিরতি নৌকাতে রেলষ্টেশনে চলে গেলেন। রাত্রের ট্রেনেই তিনি খুলনায় তাঁর শ্বশুরবাড়ী যাবেন। যাবার সময় ব'লে গেলেন—মতামত চিঠিতে জানাবেন।

হীরু তাঁকে নৌকাতে তুলে দিয়ে ফিরে এসে কুমীকে বললে—কি ক'রে বললে—গান গাইতে জান না? ছিঃ একি ছেলেমানুষী ওরা শহরের মানুষ, গান শুনলে খুব খুশী হয়ে যেত। এমনি তো ঘরের কোণে খুব গান বেরোয়? আর এর বেলা—

কুমী রাগ ক'রে বললে—ঘরের কোণে গান গাইবে না তো, কি আসরে বসে গাইতে যাবে? পারব না যার-তার সামনে গান গাইতে।

হীরুও রেগে বললে—তবে থাকো চিরকাল আইবুড়ো ধিঙ্গী হয়ে। আমার কি? কুমীর বাড়ীর ও পাড়ার সবাই এজন্য কুমীকে ভর্ৎসনা করলে। গান গাও-না গাও, গান গাইতে জানি, একথা বলার দোষ ছিল কি? ছিঃ। কাজটা ভালো হয় নি।

বলা বাহুল্য, ভদ্রলোকের কাছ থেকে কোন পত্র এল না এবং হীরু পূজার ছুটি অন্তে জামালপুর গিয়ে শুনলে, যে মেয়ে পছন্দ হয়নি।

মাস পাঁচ-ছয় কেটে গেল। কি অদ্ভুত পাঁচ-ছ-মাস! কাজ করতে-করতে জানালা দিয়ে যখনই উঁকি দিয়ে বাইরের দিকে চায়, তখনই সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে, কুমীকে কতবার জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে···হাত-পা নেড়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে হেসে গড়িয়ে পড়ে কুমী গল্প করছে ···নিম্ব ফুলের গন্ধভরা কত অলস চৈত্র দুপুরের স্মৃতিতে মধুর হয়ে উঠেছে, বর্তমান কর্মব্যস্ত দিনগুলি···

ইতিমধ্যে এক ছোকরা ডাক্তারের সঙ্গে তার আলাপ হ'য়ে গেল নতুন এম-বি পাস ক'রে জামালপুরে প্র্যাকটিশ করতে এসেচে, বেশ সুন্দর চেহারা, বাড়ীর অবস্থাও খুব ভালো, তার জ্যাঠামশাই এখানে বড় চাকরি করেন। কথায়-কথায় হীরু জানতে পারলে, ছোকরা এখনও বিয়ে করে নি এবং কুমীদের পালটি ঘর। অনেক বুঝিয়ে সে তার জ্যাঠামশাইকে মেয়ে দেখতে যেতে রাজী করালে। মেয়ে দেখাও হ'ল—কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই হ'ল না। তাদের কুটুম্ব পছন্দ হয় নি, শোনা গেল। একে তো অজ পাড়াগাঁ, দ্বিতীয়তঃ তারা ভেবেছিলেন পাড়াগাঁয়ের জমিদার কিংবা অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে, অমন গরীব তাঁদের চলবে না।

মাস তিনেক পরে হীরু আর এক বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে গিয়ে পিসিমার বাড়ী হাজির হ'ল। কুমীদের বাড়ীর সবাই বললে—হীরু বড় ভালো ছেলে, কুমীর জন্য চেষ্টা করচে প্রাণপণে।

কিন্তু অত বড়-বড় সম্বন্ধ এনে ও ভুল করচে, ওসব কি আমাদের কপালে জোটে? মেয়ে পছন্দ হ'লেই বা অত টাকা দেবো কোত্থেকে।

কুমীর সঙ্গে খিড়কী দোরের কাছে হীরুর দেখা! কুমী বললে—হীরুদা, তুমি কেন এসব পাগলামি করচ বল তো? বিয়ে আমি করবো না, তোমার দু'টি পায়ে পড়ি, তুমি ওসব বন্ধ কর।

হীরু বলল—ছিঃ লক্ষ্মী দিদি, অমন করে না, এবার যে জায়গায় ঠিক করচি, তাঁরা খুব ভালো লোক, এবার নির্ঘাত লেগে যাবে—

কুমী লজ্জায় রাঙা হয়ে বলল—তুমি কি বল হীরুদা! আমার রাত্রে ঘুম হচ্চে না, লাগবে কি-না লাগবে তাই ভেবে। মিছিমিছি আমার জন্য তোমাকে লোকে যা-তা বলে, তা-জানো? তুমি ক্ষান্ত দাও, তোমার পায়ে পড়ি হীরুদা—

হীরু এসব কথা কানে তুললে না। পাত্রপক্ষের লোক নিয়ে এসে হাজির করলে, কিন্তু কুমী কিছুতেই এবার তাদের সামনে আসতে রাজী হ'ল না। সে দস্তুরমতো বেঁকে বসলো। হীরু বাড়িতে গিয়ে বললে—পিসিমা, আপনারা দেরী করচেন কেন?

কুমীর মা বললেন—এসে বোঝাও না মেয়েকে বাবা। আমরা তো হার মেনে গেলাম। ও চুলে চিরুণী ছোঁয়াতে দেবে না, উঠবেও না, বিছানায় পড়েই রয়েচে।

কুমী ঘর থেকে বললে—পড়ে থাকব না তো কি? বারে-বারে সং সাজতে পারবো না আমি, কারো খাতিরেই না। হীরুদাকে বলো না—সং সেজে বেরুক ওদের সামনে। হীরু ঘরের মধ্যে ঢুকে কড়া সুরে বললে—কুমী ওঠ,

কথা শোন—যাও, চুল বাঁধবে যাও—

—আমি যাব না—

—যাবি নে, চুলের মুঠি ধরে নিয়ে যাব—ওঠ -দিন-দিন ইয়ে হচ্চে—না? ওঠ্ বলচি—

কুমী দ্বিরুক্তি না করে বিছানা ছেড়ে দালানে চুল বাঁধতে বসে গেলে, সাজানো-গোছানোও বাদ গেল না, মেয়ে দেখানোও হল, কিন্তু ফল সমানই দাঁড়ালো, অর্থাৎ পাত্রপক্ষ বাড়ী গিয়ে চিঠি দেবে বলে গেলেন।

জামালপুরের কাজে এসে যোগ দিল হীরু। কিন্তু সে যেন সর্বদাই অন্যমনস্ক। কুমীর জন্য এত চেষ্টা করেও কিছুই দাঁড়ালো না শেষ পর্যন্ত! কি করা যায়? এদিকে কুমীদের বাড়ীতেও তার পসার নষ্ট হয়েচে, তার আনা সম্বন্ধের ওপর সবাই আস্থা হারিয়েছে। হারাবারই কথা। এবার সেখানেও কথা তুলবার মুখ নেই তার। অত বড়-বড় সম্বন্ধ নিয়ে যাওয়াই বোধহয় ভুল হয়েচে। কুমীর ভালো ঘর জুটিয়ে দেবার ব্যাকুল আগ্রহে সে ভুলে গিয়েছিল যে, বড়তে ছোটতে কোনদিন খাপ খায় না। লজ্জায় সে পিসিমার বাড়ী যাওয়া ছেড়ে দিল।

বছর দুই-তিন কেটে গেল। হীরু চাকরিতে খুব উন্নতি করে ফেলেচে তার সুন্দর চরিত্রের গুণে। চিফ্ ইঞ্জিনীয়ারের আপিসে বদলি হ'ল দেড়শো টাকায়, মার্চ মাস থেকে।

হীরু আর সেই হীরু নেই। এমনিই হয়, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। প্রতিদিন, প্রতি মাস, প্রতি বৎসর তিলে-তিলে মানুষের দেহের ও পরিবর্তন হচ্ছে—অবশেষে পরিবর্তন এমন গুরুতর হয়ে ওঠে যে, বহুকাল পরে আবার সাক্ষাৎ হ'লে আগের মানুষটিকে আর চেনাই যায় না। হীরু ধীরে-ধীরে বদলেচে। অল্প-অল্প করে সে কুমীকে ভুলেচে। রামকৃষ্ণ আশ্রমে যাবার বাসনাও তার নেই বর্তমানে। এর মূলে একটা কারণ আছে সেটা এখানে বলি। জামালপুরে একজন বয়লার-ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন, তাঁর বাড়ী হুগলী জেলায়। রুড়কীর পাস ইঞ্জিনীয়ার বেশ মোটা মাইনে পেতেন। কিন্তু অদৃষ্টের দোষে তাঁর ছ'টি মেয়ের বিয়ে দিতে তাঁকে সর্বস্বান্ত হতে হয়েচে। এখনও একটি মেয়ে বাকি।

হীরুর সঙ্গে এই পরিবারের বেশ ঘনিষ্ঠতা জন্মেছিল। সুরমা হীরুর সামনে বার হয়, তাকে দাদা ব'লে ডাকে, কখনও কখনও নিজের আঁকা ছবি দেখায় গল্প করে, গান শোনায়। একদিন হঠাৎ হীরুর মনে হ'ল—সুরমার মুখখানা কি সুন্দর! আর চোখ দু'টি—পরেই ভাবল—ছিঃ এসব কি ভাবছি? ওসব ভাবতে নেই।

আর একদিন অমনি হঠাৎ মনে হ'লো—কুমীর চেয়ে সুরমা দেখতে ভালো—কি গায়ের রং সুরমার ! তখনই নিজের এ চিন্তায় ভীত ও সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। না, কি ভাবনা এসব, মন থেকে এসব জোর করে তাড়াতে হবে। কিন্তু জীবনকে প্রত্যাখান করা অত সহজ হ'লে আজ গেরুয়াধারী স্বামীজীদের ভীড়ে পৃথিবীটা ভর্তি হ'য়ে যেতো। হীরুর বয়েস কম, মন এখনও মরে নি, শুষ্ক, জীর্ণ, এক অতীত মনোভাবের কঙ্কালের সঙ্গে নিজেকে বেঁধে রাখতে তার নবীন ও সতেজ মন ঘোর আপত্তি জানালে। কুমীর সঙ্গে যা কিছু ছিল, সে শুকিয়ে শীর্ণ হয়ে গিয়েছে আলো-বাতাস ও পৃথিবীর স্পর্শ না পেয়ে।

সুরমাকে বিয়ে করার কিছুদিন পরে সুরমার বাবা বয়লার ফাটার দুর্ঘটনায় মারা গেলেন ; রেল কোম্প্যানী হীরুর শাশুড়ীকে বেশ মোটা টাকা দিলে এজন্যে ; প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকাও যা পাওয়া গেল, তাতে মেয়ের বিয়ের দেনা শোধ করেও হাতে ছ'সাত হাজার টাকা রইল। সুরমার মা ও একটি নাবালক ভায়ের দেখাশোনার ভার পড়েছিল হীরুর উপর, কাজেই টাকাটা সব এসে পড়লো হীরুর হাতে। সে টাকায় কয়লার ব্যবসা আরম্ভ করল। চাকরি প্রথমে ছাড়ে নি, কিন্তু শেষে রেল কারখানায় কয়লার কণ্টাক্টার নিয়ে একবার বেশ মোটা কিছু লাভ করে চাকরি ছেড়ে দিয়ে ব্যবসাতে ভালো ভাবেই নামল।

সুরমাকে বিয়ে করার চার বছরের মধ্যে হীরু একজন কণ্ট্রাক্টার হয়ে পড়ল। শাশুড়ীর টাকা বাদ দিয়েও নিজের লাভের অংশ থেকে সে তখন ত্রিশ-চল্লিশ হাজার টাকা কারবারে ফেলেচে।

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে হীরুর চালচলন বদলে গিয়েচে। রেলের কোয়ার্টার ছেড়ে দিয়ে মুঙ্গেরে গঙ্গার ধারে বড় বাড়ী ভাড়া নিয়ে সেখানেই সকলকে রেখেচে। রেলে জামালপুরে যাতায়াত করে রোজ, মোটর এখনও করে নি তবে বলতে শুরু করেচে মোটর না থাকলে আর চলে না ; ব্যবসা রাখতে গেলে ওটা নিতান্তই দরকার, বাবুগিরির জন্যে নয়।

হায় এই সময় দেশ থেকে পিসিমার চিঠি এল, তিনি আর বেশিদিন বাঁচবেন না। বহুকাল হীরুকে দেখেন নি তিনি, তাঁর বড় ইচ্ছে মুঙ্গেরে হীরুর কাছে কিছুদিন থাকেন ও, দু-বেলা গঙ্গাস্নান করবেন।

সুরমা বললে—আসতে যখন চাইছেন, নিয়ে এস গে—আমিও তাঁকে কখনও দেখি নি—আমরা ছাড়া আর তাঁর আছেই বা কে ? বুড়ো হয়েচেন—যে ক'দিন বাঁচেন, এখানেই গঙ্গাতীরেই থাকুন।

বাসায় আর এমন কেউ ছিল না যাকে পাঠানো যায় পিসিমাকে আনতে

কাজেই হীরুই দেশে রওনা হলো।

* * *

ভাদ্রমাস। দেশ এবার ভেসে গিয়েচে অতিবৃষ্টিতে। কোদ্‌লা নদীতে নৌকোই ক'রে আসবার সময় দেখলে জল উঠে দু-পাশের আউস ধানের ক্ষেত ডুবিয়ে দিয়েচে। গোয়ালবাসির বিলে জল এত বেড়েচে যে, নৌকোয় বুড়ো মাঝি বললে, সে তার জ্ঞানে কখনও এমন দেখে নি। গোয়ালবাসী ও চিত্রাঙ্গপুর গ্রাম দু'খানা প্রায় ডুবে আছে।

অথচ এখন আকাশে মেঘ নেই, শরতের সুনীল আকাশের নীচে রৌদ্র ভরা মাঠ, জল বাড়াবার দরুণ নৌকা চললো মাঠের মধ্য দিয়ে, বড় বাবলা বনের পাশ কাটিয়ে ঘন সবুজ দীর্ঘ লতানে বেত ঝোপ কড়-কড় ক'রে নৌকার ছইয়ের গায়ে লাগচে, মাঠের মাঝে বন্যার জলের মধ্যে জেগে আছে ছোট-ছোট ঘাস, তাতে ঘন ঝোপ।

পিসিমাদের গ্রামে নৌকা ভীড়তে দুপুর হয়ে গেল। এখানে নদীর পাড় খুব উচু বলে কূল ছাপিয়ে জল ওঠে নি; দু'-পাড়েই বন, এক-দিকে হ্রস্ব ছায়া পড়েচে জলে, অন্য পাড়ে খর রৌদ্র। এই বনের গন্ধ নদীর জলের ছলছল শব্দ···বাঁশবনে সোনার সড়কীর মতো নতুন বাঁশের কোঁড় বাঁশঝাড়ের মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে···এই শরৎ দুপুরের ছায়া···এই সব অতি পরিচিত দৃশ্য একটিমাত্র মুখ মনে করিয়ে দেয়—অনেক দিন আগের মুখ···হয়তো একটু অস্পষ্ট হয়ে গিয়েচে, তবুও সেই মুখ ছাড়া আর কোনো মুখ মনে আসে না। নদীর ঘাটে নেমে, পথ চলতে চলতে সে মুখ ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল মনের মধ্যে—এক ধরনের হাত-নাড়ার ভঙ্গি আর কি বকুনি, অজস্র বকুনি!···জগতে আর কেউ তেমন কথা বলতে পারে না। অনেক দূরের কোন্ অবাস্তব শূন্যে ঘুরচে সুরমা, তার আকর্ষণের বাইরে এ রাজ্য। এখানে সুরমা কে? এখানকার বন, নদী, মাঠ, পাখি সুরমাকে চেনে না।

পিসিমা যথারীতি কান্না-কাটি করলেন অনেকদিন পরে ওকে দেখে। আরও ঢের বেশি বুড়ী হয়ে গিয়েছেন, তবে এখনও অথর্ব হন নি। বেশ চলতে-ফিরতে পারেন। হীরুর জন্যে ভাত বাড়াতে যাচ্ছিলেন, হীরু বললে—তোমায় কষ্ট করতে হবে না পিসিমা, আমি চিঁড়ে খাব। ওবেলা বরং রেঁধো।

অনেকবার বলি-বলি করেও কুসীর কথাটা সে কিছুতেই পিসিমাকে জিগ্যেস করতে পারলে না. একটু বিশ্রাম ক'রে বেলা পড়লে সে হাট-তলার মধু ডাক্তারের ডাক্তারখানায় গিয়ে বসল। মধু ডাক্তারের চুল

দাড়িতে পাক ধরেচে, একটি ছেলে সম্প্রতি মারা গিয়েছে—সেই গল্প করতে লাগল!

গ্রামের মক্তবের ওই বুড়ো মৌলবী এখনও আছে; এখনও সেইরকম নিজের অঙ্ক শাস্ত্রে পারদর্শিতার প্রসঙ্গে সাব ইনস্পেক্টর মহিমবাবুর গল্প করে। মহিমবাবু ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে এ অঞ্চলে স্কুল সাব-ইনস্পেক্টরী করতেন। এখন বোধ হয় মরে ভূত হয়েচেন কিন্তু কোন একবার মক্তব পরিদর্শন করতে এলে নিজেই শুভঙ্করীর একটা অঙ্ক দিয়ে নিজেই কষে বুঝিয়ে দিতে পারেন নি, সে গল্প আজও এদেশে প্রচলিত আছে। এই মৌলবী সাহেবের মুখেই হীরু এ গল্প বহুবার শুনেচে।

সন্ধ্যা হবার পূর্বেই হীরু হাটতলা থেকে উঠল। মধু ডাক্তার বললে বসো হীরু, সন্ধ্যেটা জ্বালি—তারপর. এক হাত খেলা যাক, এখন না বড়ই হয়েচ, পুরনো দিনের কথা একেবারে ভুলে গেলে যে!

হীরু পথশ্রমের অজুহাত দেখিয়ে উঠে পড়ল। তার শরীর ভাল নয়, পুরোনো দিনের এই সব আবেষ্টনীর মধ্যে এসে পড়ে সে ভালো করে নি।

কুমী এখানে আছে কিনা, এ কথাটা মধু ডাক্তারকেও সে জিজ্ঞেস করবে ভেবেছিল। ওদের একই পাড়ায় বাড়ী। কুমী মধু ডাক্তারকে কাকা বলে ডাকে। কুমীদের সম্বন্ধে মাত্র সে এইটুকু শুনেছিল সে, কুমীর জ্যাঠামশাই বছর পাঁচেক হোল মারা গিয়েচেন এবং জ্যাঠতুতো ভাইয়েরা ওদের পৃথক করে দিয়েচে।

অন্যমনস্কভাবে চলতে-চলতে সে দেখলে কখন কুমীদের পাড়াতে, একেবারে কুমীদের বাড়ীর সামনেই এসে পড়েচে। সেই শিউলি গাছটা, এই গাছটাতে একবার সাপ উঠে পাখীর ছানা খাচ্ছিল, কুমী তাকে ছুটে গিয়ে খবর দিতে, সে এসে সাপ তাড়িয়ে দেবার জন্য ঢিল ছোঁড়াছুঁড়ি করে। এ পাড়ার গাছপালায় ঘাসে-পাতায়, সন্ধ্যার ছায়ায়, শাঁকের ডাকে কুমী মাখানো। এইরকম সন্ধ্যায় কুমীদের বাড়ী বসে সে কত গল্প করতো কুমীর সঙ্গে!

চুপ করে সে শিউলিতলায় খানিকটা দাঁড়িয়ে রইল।...

তার সামনের পথটা দিয়ে তেইশ-চব্বিশ বছরের একটি মেয়ে দু'টো গরুর দড়ি ধরে নিয়ে আসচে। কুমীদের বাড়ীর কাছে বাঁশতলায় যখন এল, তখন হীরু চিনতে পারলে সেই কুমী।

প্রথমটা সে যেন অবাক হয়ে গেল আড়ষ্টের মত দাঁড়িয়ে রইল। সত্যিই কুমী? এমন অপ্রত্যাশিতভাবে একেবারে তার চোখের সামনে! কুমীই

বটে, কিন্তু কত বড় হয়ে গিয়েচে সে!

হঠাৎ হীরু এগিয়ে গিয়ে বললে—কুমী কেমন আছ? চিনতে পারো?

কুমী চমকে উঠল, অন্ধকারে বোধ হয় ভাল করে চিনতে পারলে না, বললে—কে?

—আমি হীরু।

কুমী অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ তার মুখ দিয়ে কথা বার হ'ল না। তারপর এসে পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করে হীরুর মুখের দিকে চেয়ে বললে—কবে এলে হীরুদা? কোথায় ছিলে তুমি এতকাল? সেই জামালপুরে?

—আজই দুপুরে এসেচি।

আর কোন কথা তার মুখ দিয়ে বেরুল না! সে কেবল একদৃষ্টে কুমীর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কুমীর কপালে সিঁদুর, হাতে শাঁখা, পরনে একখানা আধময়লা শাড়ি—যে কুমীকে সে দেখে গিয়েছিল ছ-সাত বছর আগে, এ তো সে কুমী নয়। সে কৌতুহলোচ্ছাস-কলহাস্যময়ী কিশোরীকে এর মধ্যে চেনা যায় না। এ যেন নিরানন্দের প্রতিমা, মুখশ্রী কিন্তু আগের মতোই সুন্দর। এতদিনেও মুখের চেহারা কিন্তু এতটুকু বদলায়নি।

কুমী বললে—এসো আমাদের বাড়ী, হীরুদা। কত কথা যে তোমার বলবো-বলবো করে কতদিন রইলাম। তুমি এ পথে আর এলেই না।

হয়েচে! সেই কুমী! ওর মুখে হাসি সেই পুরানো দিনের মতই আবার ফুটে উঠেচে। হীরু ভাবলে, আহা ওর বকুনির শ্রোতা এতদিন পায়নি, তাই ওর মুখখানা ম্লান।

—তুই আগে চল কুমী।

—তুমি আগে চল হীরুদা!

চার-পাঁচ বছরের একটি ছেলে রোয়াকে বসে মুড়ি খাচ্ছিল। কুমীকে দেখে বললে—ওই মা এসেচে।

—বসো হীরুদা, পিঁড়ি পেতে দিই! মা বাড়ী নেই, ও পাড়ায় গিয়েছে রায়-বাড়ী, কাল ওদের লক্ষ্মীপুজোর রান্না রেঁধে দিতে। আমি ছেলেটাকে মুড়ি দিয়ে বসিয়ে রেখে গরু আনতে গিয়েছিলুম দীঘির পাড় থেকে। উঃ কতকাল পরে দেখা হীরুদা! বসো—বসো। কি খাবে বল তো? তুমি মুড়ি ছোলা খেতে ভালবাসতে। বসো, সন্ধ্যেটা দেখিয়ে ছোলা চড়িয়ে গরম-গরম ভেজে দি। ঘরে ছোলাও আছে, নারকোলও

আছে। দাঁড়াও আগে পিদিমটা জ্বালি।

সেই মাটির ঘর সেই রকমই আছে। সেই কুমী সন্ধ্যা-প্রদীপ দিচ্চে পুরানো দিনের মতো, যখন সে কত রাত পর্যন্ত ওদের বাড়ী বসে গল্প করতো। তবুও কত—কত পরিবর্তন হয়ে গিয়েচে! কত ব্যবধান এখন তার কুমীর মধ্যে।

কুমী প্রদীপ দেখিয়ে ছোলা ভাজতে বসল। একটু পরে ওকে খেতে দিয়ে সামনে বসল সেই পুরানো দিনের মতই গল্প করতে। সেই হাত-পা নাড়া, সেই বকুনি সবই সেই। কত কথা বলে গেল। হীরু ওর দিকে চেয়ে থাকে, চোখ আর অন্যদিকে ফেরাতে পারে না। কুমীও তাই।

হীরু বল্ললে—ইয়ে, কোথায় বিয়ে হ'ল কুমী?

কুমী লজ্জায় চোখ নামিয়ে বললে—সামটা।

—তা বেশ।

তারপর কুমী বললে, ক'দিন থাকবে এখন হীরুদা?

—থাকবার জো নেই, কাজ ফেলে এসেচি, পিসিমাকে নিয়ে কালকেই যাবো। পিসিমা চিঠি লিখেছিলেন বলেই তো তাঁকে নিতে এলাম।

—না-না হীরুদা সেকি হয়? কাল ভাদ্র মাসের লক্ষ্মী পুজো, কাল কোথায় যাবে? থাকো এখন দু'দিন। তুমিও তো বিয়ে করেচ, বৌদিকে নিয়ে এলে না কেন? দেখতাম। ছেলেমেয়ে ক'টি?

—দু'টি ছেলে, একটি মেয়ে।

—বেশ-বেশ! আচ্ছা আমার কথা মনে পড়তো হীরুদা?

মনে খুব পড়তো না, কিন্তু এ কথাও ঠিক যে, এখন মনে পড়চে যে সুরমা ও জামালপুর অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। বড়লোকের মেয়ে সুরমা তার মনের মতো সঙ্গিনী নয়, তার সঙ্গে সব দিক থেকে মেলে—খাপ খায় কুমীর। অথচ সুরমার জন্য দামী মাদ্রাজী শাড়ী কিনে নিয়ে যেতে হবে কলকাতা থেকে যাবার সময়। সুরমা বলেচে, যাচ্ছ যখন দেশে, ফিরবার সময় কলকাতা থেকে পূজোর কাপড় কিনে এনো। এখানে ভালো জিনিস পাওয়া যায় না, দরও বেশী।

আর কুমীর পরনে ছেঁড়া আধময়লা কাপড়। না-দরিদ্র গৃহলক্ষ্মীকে বড়লোকী উপহার দিয়ে সে তার অপমান করবে না!

কুমী বকেই চলেচে। অনেকদিন পরে আজই ও আনন্দ পেয়েছে। নিরানন্দ অসচ্ছল সংসারে একঘেয়ে কর্মের মধ্যে বালিকা বয়সের শত আনন্দের স্মৃতি নিয়ে পুরনো দিনগুলো হঠাৎ আজ সন্ধ্যায় কেমন ক'রে ফিরেছে!

ঘণ্টা দুই পরে কুমীর মা এলেন। বললেন—এই যে জুটেচ দু'টিতে? আমি শুনলুম দিদির মুখে যে হীরু এসেচে। কাল লক্ষ্মীপুজো, তাই রায়দের বাড়ী রান্না করে দিয়ে এলাম! তা ভালো আছিস বাবা হীরু? কুমী কত তোর কথা বলে। তোর কথা তো লেগেই আছে ওর মুখে; এই আজও দুপুর বেলা বলছিল. মা, হীরুদা নদীতে বন্যা দেখলে খুশী হোত; এবার তো বন্যা এসেচে, হীরুদা যদি দেখতো, খুব খুশী হোত না মা? তা, আমি তুই এসেছিস শুনেই দিদির ওখানে গিয়েছিলুম। বাড়ী নেই দেখে ভাবলাম, সে ঠিক আমাদের ওখানে গিয়েচে। তা সব ভাল বাবা, চট করে পুকুর থেকে কাপড় কেচে গা ধুয়ে আসি। গামছাখানা দে তো কুমী। খোকার জন্য তরকারী এনেচি কাঁসিতে। ওকে ভাত দে। এই ওর বিয়ে দিয়েচি সামটায়—বুঝলে বাবা হীরু? জামাই দোকানে সামান্য মাইনের খাতা-পত্র লেখা কাজ করে। তাতে চলে না। তার ওপর দজ্জাল ভাই-বৌ। খেতে পর্যন্ত দেয় না ভালো করে মেয়েটাকে। এই দেখো—এখানে এসেচে আজ পাঁচ মাস, নিয়ে যাবার নামটি নেই, বৌদিদির হুকুম হবে, তবে বৌ নিয়ে যেতে পারবে। মার এদিকে তো আমার এই অবস্থা মেয়েটার পরনে নেই কাপড়, জামাই আসে-যায়, কাপড়ের কথা বলি, কানেও তোলে না। আমি যে কি করে চালাই? তা সবই অদৃষ্ট! নইলে—

কুমী ঝাঁজালো সুরে বললে—আঃ যাও না, গা ধুয়ে এসো না—কি বকবক শুরু করলে—

অদৃষ্ট, হাঁ অদৃষ্টই। সে আজ কোথায়, আর কুমী কোথায় পড়ে কষ্ট পাচ্চে। পরনে কাপড় নেই, পেটে ভাত নেই। জীবনে আনন্দ নেই সাধ-আহ্লাদ নেই, কিছুই দেখলে না, কিছুই ভোগ করলে না, সবই অদৃষ্ট ছাড়া আর কি?

খানিক রাত্রে হীরু উঠল, কুমী প্রদীপ ধরে এগিয়ে দিলে পথ পর্যন্ত। বললে—আমাদের হ্যারিকেন লণ্ঠন নেই, একটা প্যাকাটি জ্বেলে দিই, নিয়ে যাও হীরুদা, বাঁশবনে অন্ধকার।

সকালে কুমী পিসিমার বাড়ী গেলো—কি হচ্চে হীরুদা—

—এই যে কুমী, কামিয়ে নিলাম। এইবার নাইবো। কুমী ঘরের মধ্যে ঢুকে বলল—কেন, কিসের তাড়া নাইবার এত সকালে? তোমার কিন্তু আজ যাওয়া হবে না হীরুদা—বলে দিচ্চি। আজ ভাদ্রমাসের লক্ষ্মীপুজোর অরন্ধন, তোমায় নেমন্তন্ন করতে এলুম। আমাদের বাড়ী। মা বললেন —যা গিয়ে বলে আয়।

হীরু আর প্রতিবাদ করতে পারলে না, কুমীর কাছে প্রতিবাদ করে কোনো লাভ নেই, সে জানে। কুমী খানিকটা পরে বললে—আমার অনেক কাজ হীরুদা, আমি যাই। তুমি নেয়ে সকাল-সকাল এস।

হীরু বেলা দশটার মধ্যে ওদের বাড়ী গেল। আজ আর রান্নার হাঙ্গামা নেই! কুমী বললে—আজ কিন্তু পান্তা ভাত খেতে হবে জানো তো? আর কচুর শাক—আর একটা জিনিস, বল তো? উঁহু···তুমি বলতে পারবে না।

কুমীর মা বললেন—কাল রাত্রে তুমি চলে গেলে মেয়ে অত রাত্রে তোমার জন্যে নারকেল কুমড়ো রাঁধতে বসল। বললে, হীরুদা বড় ভালবাসে মা, কাল সকালে খেতে বলব, রেখে রাখি।

কুমী স্নান সেরে এসে একখানা ধোয়া শাড়ী পরেচে, বোধহয় এই-খানাই তার একমাত্র ভালো কাপড়। সেই চঞ্চলা মুখরা বালিকা আর সে সত্যিই নেই, আজ দিনের আলোয় কুমীকে দেখে ওর মনে হ'ল—কুমীর চেহারা আরও সুন্দর হয়েচে, তবে ওর মুখে-চোখে একটা শান্ত মাতৃত্বের ভাব ফুটে রয়েচে, যেটা হীরু কখনো ওর মুখে দেখেনি। কুমী অনেক ধীর হয়েচে, অনেক সংযত হয়েচে। মাথায় সেই রকমের এক চাল চুল, মুখশ্রী এখনও সেইরকম লাবণ্যময়। তবুও যেন কুমীকে চেনা যায় না, বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে বালিকা কুমী অন্তর্হিত হয়েচে, এখন যে কুমীকে সে দেখচে, তার অনেকখানিই যেন সে চেনে না।

কিন্তু খানিকটা বসার পরেই হীরুর এ ভ্রম ঘুচে গেল। বাইরের চেহারাটা যতই বদলে যাক না কেন, তার সামনে যে কুমী বার হয়ে এল সে সেই কিশোরী কুমী। ওর যেটুকু পরিচিত, তা ওর মধ্য থেকে বার হয়ে এল—যেটুকু হীরুর অপরিচিত, তা নিজেকে গোপন রাখলে কি চমৎকার কুমীর মুখের হাসি। হীরুর মোহ নেই, আসক্তি নেই, আছে কেবল একটা সুগভীর স্নেহ, মায়া, অনুকম্পা···এ এক অদ্ভুত মনের ভাব কুমীকে সে সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে পারে তাকে এতটুকু খুশী করার জন্য।

কুমী বসে কত কী বকচে···পুরানো দিনের কথা তুলচে কেবল।

মনে আছে হীরুদা, সেই একবার জেলেদের বাঁশতলায় আলেয়া জ্বলেছিল—সেও তো এই ভাদ্রমাসে···সেই চারুপাঠ মনে আছে?

হীরুর খুব মনে আছে। সবাই। সবাই ভয়ে আড়ষ্ট, আলেয়া নাকি ভূত, যে দেখতে যায় তার অনিষ্ট হয়! হীরু সাহস করে এগিয়ে গিয়েছিল দেখতে, আর কুমী পিছু পিছু গিয়েছিল।

হীরু বলেছিল—আসছিস কেন পোড়ারমুখী, ভূতে ধরে নেবে—

কুমী ভেংচি কেটে বলেছিল—ইস্‌। ভূতে ধরে তোমাকে খাবে না—আমাকেই খাবে আলেয়া বুঝি ভূত? ও তো এক রকম বাষ্প, আমি পড়িনি বুঝি চারুপাঠ। শুনবে, বলবো ..অনেকের বিশ্বাস আছে আলেয়া এক প্রকার ভূতযোনি, বাস্তবিক ইহা ভূত নয়—

হীরু ধমক দিয়ে বলেছিল–রাখ তোর চারুপাঠ—আরম্ভ করে দিলেন এখন অন্ধকারের মধ্যে চারুপাঠ, বলে ভয়ে মরচি—

পরক্ষণেই কুমী খিলখিল করে হেসে বলেছিল—কি বললে হীরুদা, ভয়ে মরচো? হি-হি-হি-হি—এত ভয় তোমার যদি এলে কেন? চারু-পাঠ পড়লে ভয় থাকতো না...চারুপাঠ তো পড়নি?

সেই সব পুরানো গল্প, আলেয়া...আলেয়াই বটে। কুমীর যে খানিকটা পরিবর্তন হয়েচে, তা বোঝা গেল যখন ও গ্রামের এক বিধবা গরীব মেয়ের কথা তুললে। আগে এ সব কথা কুমী বলত না। এখন সে পরের দুঃখ বুঝতে শিখেচে। মুখুজ্যে-বাড়ীর বড় পুরীপান্নার মধ্যে হয় মুখুজ্যের এক বিধবা নাতনী নিতান্ত বালিকা--কি রকম কষ্ট পাচ্চে, পুকুরঘাটে কুমীর কাছে বসে নির্জনে মৃত স্বামীর রূপ-গুণের কত গল্প করে—এ কথা দরদ দিয়ে বলে গেল, সত্যিই মাতৃত্ব ওর মধ্যে জেগেচে, ওকে বদলে দিয়েচে অনেকখানি।

হঠাৎ কুমী বললে—ওই দেখো হীরুদা বকেই যাচ্চি। তোমায় যে খেতে দেবো, সে কথা মনে নেই।

তারপর সে উঠে তাড়াতাড়ি হীরুকে ঠাঁই করে দিয়ে ভাত বেড়ে নিয়ে এল। হাসিমুখে বললে—জামালপুরের বাবুর আজ কিন্তু পান্তা ভাত খেতে হবে। রুচ্‌বে তো মুখে? নেবু কাটি এখন অনেক ক'রে নারকেল-কুমড়ি আছে, কচুর শাক আছে।

এসব সত্যিই হীরু অনেকদিন খায় নি। যা-যা খেতে ভালবাসে, কুমী তার কিছুই বাদ দেয় নি। হীরু আশ্চর্য হয়ে গেল—কতকাল পরেও কুমী মনে রেখেচে এ সব কথা। খেতে বসে হীরু বললে—কুমী, ছেলে-বেলা ভালো লাগে, না এখন ভালো লাগে?

—এ কথার উত্তর নেই হীরুদা। ছেলেবেলায় তোমরা সব ছিলে, সে একদিন ছিল। এখনও তা বলে খারাপ লাগে না—জীবনে নানারকম দেখা ভালো–নয় কি?

কুমী একটা কথার উত্তর দে। তোর সংসারের টানাটানি খুব।

—কে বললে এ কথা? মা, মা বলেছিল সেই তো কাল রাত্তিরে? এ বাজে কথা, জানো তো মা যত বাজে বকে। বুড়ো হয়ে মা'র জিব

আরও আলগা হয়ে গেছে।

—কুমী আমার কাছে সত্যি বলবিনে ?

এ, তুমিও পাগলামি শুরু করলে। নাও, খেয়ে—নাও—যত বাজে বকতে পারো—মা-গো!—দাঁড়াও, পায়েসটা আনি—কচুর শাক পড়ে রইল কেন অতখানি ?—না, সে হবে না—

ছাখ, কুমী, আমার কাছে বেশী চালাকি করিস নে। তোকে আর আমি জানি নে ? কোদ্‌লার ঘাটে পায়ে খেজুর-কাঁটা ফুটে গিয়েছিল, মুখে একটু রা করিস নি, জানতে দিস নি কাউকে—

—আবার ?

হীরু চুপ করে গেল। এতখানি বলে সে ভালো করে নি, ঝোঁকের মাথায় বলে ফেলেচে। কুমী যা ঢাকতে চায়, ও তা বার ক'রে কুমীর আত্মসম্মানে ঘা দিতে চায় কেন ? ছিঃ—

কুমী বললে—আবার কবে আসবে হীরুদা ?

—সত্যি কথা যদি শুনতে চাস, আমার যেতে ইচ্ছে হচ্চে না কিন্তু।

—আবার বাজে বকতে শুরু করেচো হীরুদা। তোমার যা কিছু সব সামনে, চোখের আড়াল হ'লে আর মনে থাকে না। আর ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে যত বাজে বকুনি—

—তুমি তো জানো না একটু বাজে বকতে ? আমি ইচ্ছে করলে থাকতে পারিনে ভেবেছিস ?

—হ্যাঁ, থাকো না দেখি কাজকর্ম বন্ধ করে। বৌদি এসে চুলের মুটি ধরে নিয়ে যাবে না ?

—আচ্ছা সে যাক, একটা কথার উত্তর তোকে দিতেই হবে। আমি যদি এখানে থাকি, তুই খুশী হবি ?

উঃ মা-গো বুখ বুঁজে খেয়ে নাও দিকি ? কি বাজে বকতে পারো!

হীরু দুঃখিত ভাবে বললে—আমার এ কথাটারও উত্তর দিবি নে কুমী ? তুই এত বদলে গিয়েছিস, এ আমি ভাবতেই পারি নে। আচ্ছা বেশ—

কুমী হেসে প্রায় লুটিয়ে পড়তে-পড়তে বললে—তোমার কিন্তু একটু বদলায়নি হীরুদা, সেই রকম 'আচ্ছা-বেশ' বলা, সেই রকম কথায়-কথায় রাগ-করা। আচ্ছা কি বলব, বলো দিকি ? তুমি জানো না ও কথার কি উত্তর আমি দিতে পারি ? ভেবে ছাখো, তা হ'লে আমি বদলাই নি, বদলে গিয়েছ তুমি হীরুদা—

আচ্ছা কুমী, এতটা না, বকে সামান্য দু'কথার সাদা উত্তর দিস্ না কেন ? বকুনিতে আমি কি তোর সঙ্গে পারবো ?

—না তা তুমি পারবে কেন? বকতে তুমি একটুও জানো না।

—মন থেকে বলচিস?

—আমার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে হীরুদা, এতটা বদলে গিয়েচ তুমি? যাও—আমি তোমার আর কোন কথার উত্তর দেব না, তুমি না নিজের বুদ্ধির বড়ো অহঙ্কার করতে?

—কুমী রাগ করিস নে। অনেক কাজের মধ্যে থেকে আমার সূক্ষ্ম বুদ্ধিটা নষ্ট হয়ে গিয়েচে। যাক্, বাঁচলুম কুমী।

পায়েসটা খাও, তোমার পায়ে পড়ি। আর বকুনিটা কিছুক্ষণের জন্য ক্ষান্ত রাখো। কিছু পেটে গেল না এই অনাছিষ্টি বকুনির জন্যে।

কুমী পরদিন এসে বিছানা—বাক্স গুছিয়ে দেয়। ঘাট পর্যন্ত এসে ওদের নৌকাতে উঠিয়ে দিলে। নৌকা ছেড়ে যখন অনেকটা গিয়েচে, তখনও কুমী ডাঙায় দাঁড়িয়ে আছে। দু'পাড়ের নদীচর, নির্জন, দুপুরের রৌদ্র আজ বড়ো প্রখর, আকাশ অদ্ভুত ধরনের নীল, মেঘলেশ নীল। বন্যার জলে পাড়ের ছোটো কালকাসুন্দি গাছের রদ পর্যন্ত ডুবে গিয়েছে, কচুরি পানার বেগুনী ফুল চড়ার উপরে আটকে আছে। সেই সব বনজঙ্গল-ময় ডাঙ্গার পাশ দিয়ে চলেছে ওদের নৌকা। ঝোপের তলায় ছায়ায় ডাহুক চলছে। বন্যার জলে নিমগ্ন আখের খেতের আগাছাগুলো স্রোতের বেগে থর-থর করে কাঁপছে।

ছইয়ের মধ্যে পিসিমা ঘুমিয়ে পড়েছেন, নিস্তব্ধ ভাদ্র অপরাহ্ন! নৌকার তক্তায় উপর বসে-বসে হীরু কত কি ভাবছিল। এ গ্রামে যদি সে থাকতে পারত! মধু ডাক্তারের মতো হাটতলার ওষুধের ডিসপেন্সারি খুলে! ডাক্তারীটা যদি শিখতো সে! পূজোর বাজারটা ফিরবার সময় করতে হবে কলকাতা থেকে—অন্ততঃ দেড়শো টাকার বাজার। আসবার সময় খুব উৎসাহ করে সুরমার কাছ থেকে ফর্দ করে নিয়ে এসেছে—

একটা মানুষের মধ্যে মানুষ থাকে অনেকগুলো! জামালপুরের হীরু অন্যলোক, এ হীরু আলাদা। এ বসে-বসে ভাবছে, কুমীদের রান্নাঘরের অরন্ধনের নিমন্ত্রণ খেতে বসেছিল, সেই ছবিটা। অনবরত ওই একটাই ছবি।

কুমী বলছে—আমার কথা মনে পড়তো হীরুদা?—

কুমী এখনও কি ঠিক তেমনি হাত-পা নেড়ে কথা বলে—ঠিক সেই ছেলেবেলাকার মতো!—আচ্ছা, আর কারোর সঙ্গে কথা বলে অমন আনন্দ হয় না কেন! সুরমার সঙ্গেও তো রোজ কথা হয়—কই—

রেলের বাঁশির আওয়াজে হীরুর চমক ভাঙলো। ওই ষ্টেশনের ঘাটটা দেখা দিয়েছে! সিগন্যাল নামানো, বোধ হয় ডাউন ট্রেনটা আসবার আর দেরী নেই।

স্বপ্নের ট্রেন

প্রফুল্ল রায়

বারো চোদ্দ বছর আগেও প্রায়ই ভোরের দিকে একটা স্বপ্ন দেখতো অশোক। স্বপ্নটা অদ্ভুত—একটা ট্রেনে করে সে চলেছে। ট্রেন লাইনের দুধারে আদিগন্ত ধানের ক্ষেত, পাটের ক্ষেত। মাঝে মাঝে বেত ঝোপ, সোনাল আর পিঠক্ষীরার জঙ্গল, হিজল বন, বউন্যা বন। যতদূর চোখ যায়, সোনালী রোদে মাঠঘাট ভেসে যাচ্ছে। আর রোদের সোনা গায়ে মেখে ঝাঁক ঝাঁক পাখি উড়ছে। কত রকমের যে পাখি—শালিক, সিদ্ধিগুরু, বুলবুলি, কানি বক, হলদিবনা, পাতিবক, বুনো টিয়া। মনে হত, অগুনতি রঙিন কাগজের টুকরো কেউ বাতাসে ছড়িয়ে দিয়েছে। মাথার ওপর পেজা তুলোর মতো মেঘ ভেসে বেড়াত; তাদের ফাঁকে ফাঁকে উজ্জ্বল নীলাকাশ।

ট্রেনটা কখন যেন অশোককে বিশাল এক নদীর পাড়ে স্টিমারঘাটে পৌঁছে দিত। সেখানে জেটির গায়ে আগে থেকেই প্রকাণ্ড একটা স্টিমার দাঁড়িয়ে আছে। অনেক লোকের সঙ্গে ঘোরের মধ্যে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে সেই স্টিমারটায় গিয়ে উঠত অশোক। উঠে কিন্তু কোথাও বসত না; জলের ধার ঘেঁষে রেলিঙ ধরে ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে থাকত।

কখন এক সময় গম্ভীর ভোঁ দিয়ে স্টিমার ছেড়ে দিত। তারপর শুধু জল আর জল। মাঝে মাঝে চাপ-বাঁধা কচুরিপানা; দূরে দূরে কালো কালো বিন্দুর মতো অসংখ্য ভাউলে কি মহাজনী নৌকো। ঢেউ ছুঁয়ে ছুঁয়ে খয়েরী ডানার শঙ্খচিল উড়ত। সুযোগ পেলেই বাঁকানো ঠোঁটে রুপোর মতো চকচকে চাঁদা কি কাজলি মাছ বিঁধিয়ে তুলে আনত।

তারপর একেকটা স্টিমারঘাটা আসত। রাজাবাড়ি, ভাগ্যকুল, তারপাশা, লৌহজঙ। যেখানে স্টিমার ভিড়ত, কোত্থেকে মোচার খোলার মতো টলতে টলতে অনেকগুলো এক মাল্লাই খাবারের নৌকো চলে আসত। কত রকমের খাবার—কাঁচা গোল্লা, অমৃতসাগর কলা, পাতক্ষীর—

তারপাশা না লৌহজঙ পেরিয়ে স্টিমারটা যখন মুন্সীগঞ্জের দিকে চলেছে, ডেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অশোক যখন ভাবছে কতক্ষণে মুন্সীগঞ্জের স্টিমারঘাটায় নেমে পাঁচ ছ' মাইল দূরে তাদের সেই বজ্রযোগিনী গ্রামে পৌঁছুবে, কতক্ষণে ছেলেবেলার সেই সব বন্ধু—রাশেদ, কামাল বা আত্তিকুলদের দেখবে, ঠিক তখনই ভারী ঘড়ঘড়ে কফ-বসা গলার ডাকে ঘুম ভেঙে যেত অশোকের!

কোনদিনই ষ্টিমারটা মুন্সীগঞ্জে পৌঁছুতে পারত না, তার আগেই ওই ঘড়ঘড়ে গলাটা শোনা যেত। গলাটা বাবার।

বাবা ডাকত, 'খোকা উঠে পড়, সকাল হয়ে গেল।'

ধড়মড় করে উঠে বসত অশোক। ঘুমের চোখে প্রথমটা বুঝে উঠতে পারত না, কোথায় আছে। কিছুক্ষণ পর মাথার ভেতর থেকে স্বপ্নের ট্রেন আর ষ্টিমারটা মিলিয়ে গেলে সে দেখতে পেত, নর্থ ক্যালকাটার দমবন্ধ বুক-চাপা গলির শেষ মাথায় কত কালের পুরনো এক ঘরে তিন ঠ্যাংওলা তক্তাপোষের (বাকি পা'টা ইঁট সাজিয়ে সাজিয়ে করে নেওয়া হয়েছে) নোংরা চিটচিটে বিছানায় বসে আসে। ঘরটার কোন দেয়ালেই পলেস্তারা নেই; কোণে কোণে ঝুল জমে আছে।

ঘরের একধারে তক্তাপোষ, আরেক ধারে আলনা, আলনার পাশেই স্তূপাকার ট্রাঙ্ক, ছেঁড়া সুটকেশ, টিনের বাক্স। তক্তাপোষের তলায় ডাঁই-করা হাঁড়ি-কুড়ি-ডেকচি, বেতের ঝোড়া, ভাঙা কুঁজো, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এসব বাদ দিলে মেঝেতে যে জায়গাটুকু পাওয়া গেছে তাতে ঢালা বিছানা। সেখানে বাবা, ছোট দুই ভাই পল্টু আর হীরু শুত।

অশোক দেখতে পেত, বাবাই শুধু জেগেছে। হীরু আর পল্টু বুকের কাছে হাঁটু মুড়ে তখনও ঘুমিয়ে। ওভাবে শোওয়া ওদের চিরকালের অভ্যাস।

বাবা কোনদিন বলত, 'সাড়ে পাঁচটা বেজে গেল খোকা; এবার বেরিয়ে পড়। এরপর গেলে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে ভীষণ ভিড় হয়ে যাবে।'

চোখ রগড়ে বাবার দিকে তাকাত অশোক। এই বাবা, নর্থ ক্যালকাটার শ্বাসরুদ্ধ গলির দেড়খানা ঘরের ভাড়াটে—একদা মুন্সীগঞ্জের কাছে বজ্রযোগিনী গ্রামে সাড়ে তিনশ' কানি জমির মালিক ছিল। তখন শখ করে গ্রামের স্কুলে বিনা মাইনেতে হেডমাস্টারি করত বাবা; দেশে থাকতে কী চমৎকার স্বাস্থ্য ছিল। কিন্তু নর্থ ক্যালকাটার ভাড়াটে বাবাকে দেখলে খুব কষ্ট হত। শরীরে গ্যারগেরে হাড় ছাড়া তখন আর কিছুই ছিল না; চোখ দুটো ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল; গাল-টাল বসে মুখটা ভেঙেচুরে গিয়েছিল; কণ্ঠার হাড় গজালের মতো ঠেলে উঠেছিল। দেশ থেকে চলে আসার পর সাড়ে তিনশ' কানি জমির মালিক বাবা এক বছর ঘোরাঘুরির পর মারোয়াড়ি ফার্মে আড়াই শ' টাকা মাইনের একটা কেরানীগিরি জোটাতে পেরেছিল। ওই টাকায় সাত জনের সংসার চালিয়ে নিজের স্বাস্থ্য আর কতটা ভাল রাখা যায়।

বাবা আবার তাড়া লাগাত, 'আর বসে থাকিস না। মুখটুখ ধুয়ে নে—'

কিছু না বলে তক্তাপোষ থেকে নেমে পড়ত অশোক। তারপর বাঁ

হাতের তালুতে একটুখানি মাজন ঢেলে বাবার বিছানার পাশ দিয়ে বাইরে চলে যেত।

এ ঘর থেকে বেরুলেই ডান-হাতি ফালি ঘরটায় মা আর দুই ছোট বোন, ছায়া আর পুতুল রাত্তিরে শুত। অত তাড়াতাড়ি ছায়া বা পুতুল উঠত না। তবে মা উঠে ততক্ষণে উনুনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

এ গলিতে রোদ আসে না। শীত-গ্রীষ্ম বারোমাস, সব সময় এখানে বিষণ্ণ সন্ধ্যা ঘনিয়ে থাকে। দিনের বেলাতেই আলো জ্বালতে হয়। অশোক রান্নাঘর পেছনে ফেলে ছাই, মাছের কাঁটা আর রাজ্যের আবর্জনা ছড়ানো ভাঙা-চোরা কলতলায় চলে যেত। আরো কিছুক্ষণ পর এক কাপ চা এবং দু'খানা বাসি রুটি খেয়ে বেরিয়ে পড়ত।

কোনদিন বাবা তার ঘুম ভাঙিয়ে বলত, 'জুট মিলের মিস্টার চ্যাটার্জির সঙ্গে দেখা করে আয়। আটটার মধ্যে ভদ্রলোক বেরিয়ে যান; তাড়াতাড়ি না গেলে দেখা হবে না।'

অশোক বলত, 'কত দিন তো গেলাম; কিছু হবে বলে মনে হয় না।'

বাবা বলত, 'আবার যা; আমাদের অবস্থার কথা ভাল করে বল—'

'যেদিন যাই সেদিনই তো বলি।'

'চ্যাটার্জি কী বলে?'

'এমনি কিছু বলে না। তবে—'

'তবে কী?'

'শ পাঁচেক টাকা পেলে একটা চাকরি জুটিয়ে দিতে পারে।'

বাবার চোখদুটো হঠাৎ ঘোলাটে হয়ে যেত। একটু চুপ করে থেকে মুখে বলত, 'বলবি চাকরি হলে মাস মাস কিছু কিছু করে টাকাটা দিয়ে দেব।'

অশোক বলত, 'আগে টাকা না দিলে চাকরি করে দেবে না!'

'তবু একবার যা।'

কোনদিন বাবা তাকে ঘুম থেকে তুলে কোন সরকারী বড় অফিসার কিংবা এম-এল-এ, এম-পি'র বাড়ি পাঠিয়ে দিত।

চাকরির জন্য এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ এবং এর-ওর বাড়ি ঘুরতে ঘুরতে কবে থেকে যে ভোরবেলায় সেই স্বপ্নের ট্রেনটার আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল অশোকের মনে নেই।

॥ দুই ॥

বারো চোদ্দ বছর পর উনিশ' একাত্তরের এপ্রিলে শেষ রাতের স্বপ্নে সেই ট্রেনটা হঠাৎ আজ আবার দেখা দিল। শুধু দেখাই দিল না, অশোককে

তুলে নিয়ে আদিগন্ত মাঠের মাঝখান দিয়ে, উজ্জ্বল নীলাকাশের তলা দিয়ে সেই বিশাল নদীটার পাড়ে ষ্টিমারঘাটার দিকে ছুটতে লাগল।

অশোক দেখল, তার গায়ে যোদ্ধার সাজ। অনুভব করল চোয়াল শক্ত, চোখেমুখে কঠিন প্রতিজ্ঞা জ্বলছে।

ট্রেনটা যখন ষ্টিমারঘাটার কাছাকাছি পৌঁছেছে সেই সময় কার কান্নার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। লাফ দিয়ে উঠে আবছা অন্ধকারে অশোক দেখল, নর্থ ক্যালকাটার সেই পুরনো বাড়ির তিন ঠ্যাংওলা তক্তাপোষে তার ঠিক পাশেই নমিতা (অশোকের স্ত্রী) ঘুমোচ্ছে। নমিতার পেটে সাত মাসের বাচ্চার ভার। রোগা ভাঙা-চোরা শরীর; চোখের কোলে গাঢ় কালি; চুল উঠে উঠে কপালটা মাঠের মতো প্রকাণ্ড; সেদ্ধ করা মাংসের মতো ফ্যাকাসে ঠোঁট, চোখ দুটো আধবোজা। হাঁ করে কাতলা মাছের মতো শ্বাস টানছে নমিতা। নিশ্বাসের তালে তালে তার শুকনো প্রায়-সমতল বুক উঠছে নামছে।

এই নমিতা, ক'বছর আগেও রক্তমাংসময়ী নারী ছিল। তখন কী চমৎকার স্বাস্থ্য তার। এখন হাড়ের ওপর পাতলা চামড়া ছাড়া মেয়েটার শরীরে আর কিছুই নেই। দশ বছরের বিবাহিত জীবনে তিনটে বাচ্চার জন্ম দিয়ে এবং চতুর্থটিকে ছ' সাত মাস পেটে রাখার ফলে সে একেবারে শেষ হয়ে গেছে।

কান্নার শব্দটা আসছেই। তক্তাপোষ থেকে নেমে পড়ল অশোক।

এ ঘরের সাজসজ্জা বারো চোদ্দ বছর আগের মতোই আছে। পরিবর্তনের মধ্যে বিয়ের পর একটা সস্তা আলমারি কিনেছিল অশোক; আলনার জায়গায় সেটা বসানো হয়েছে। আর আলনাটা চালান করা হয়েছে মা'র ঘরে।

মেঝে জুড়ে আগের মতোই বিছানা পড়ে। তবে সেখানে বাবা হীরু বা পল্টু শোয় না। বছর সাতেক হল বাবা মারা গেছে। হীরু চাকরি-বাকরি জুটিয়ে এখন নাসিকে; ন'মাসে ছ'মাসে ইচ্ছা হলে একখানা চিঠি দেয়। যা মাইনে পায় তাতে তারই নাকি চলে না; কাজেই বাড়িতে দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। বাড়ির সঙ্গে তার সম্পর্কটা খুব সরু সুতোয় ঝুলছে। সুতোটা যে কোনোদিন পট করে ছিঁড়ে যেতে পারে। পল্টু এখন হাজতে; কোথায় ওয়াগন ভাঙতে গিয়ে ধরা পড়েছে।

বাবা হীরু আর পল্টুর জায়গায় এখন মেঝেতে শোয় অশোকের তিন ছেলেমেয়ে। খুকি, মনা আর বাবলু।

খুকি আর মনা এখন ভালই আছে, তবে বাবলুটার 'জণ্ডিস'। বাবলু

কাঁদছে কি? ওদের পাশ দিয়ে ডান-হাতি খানিকটা এগিয়ে দেওয়ালের সুইচ টিপে লাইট জ্বালল অশোক। তারপর অল্প ঝুঁকে দেখল, বাবলু কাঁদছে না; খুকির গায়ে একটা পা তুলে ঘুমোচ্ছে।

এবার অশোক বুঝতে পারল, কান্নার শব্দটা আসছে পাশের ঘর থেকে। মা—মা-ই কাঁদছে।

তাড়াতাড়ি দরজা খুলে অশোক বাইরে এল। পাশের ফালি ঘরটার দরজায় ধাক্কা দিতে দিতে ডাকতে লাগল, 'মা—মা—'

একটু পর আধময়লা ধুতি-পরা বিধবা মা অশোকের মুখোমুখি দাঁড়াল। মা'র চোখ জলে ভেসে যাচ্ছিল।

এ ঘরটায় আজকাল মা পুতুল আর পল্টু থাকে। ছায়া নেই, বছর দুই আগে এ পাড়ার একটা ছোকরার সঙ্গে পালিয়ে গেছে।

অশোক বলল, 'কাঁদছ কেন মা?'

মা আঁচলে চোখ মুছে বলল, 'পল্টুটার জন্যে মনটা হঠাৎ এত খারাপ হয়ে গিয়েছিল—'

অশোক চুপ করে রইল। তিন দিন হল পল্টু পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। রোজ ছোটাছুটি করেও তাকে হাজত থেকে বার করে আনতে পারে নি অশোক।

মা আবার বলল, 'ছাখ না, পল্টুর জন্যে একটা জামিন যদি যোগাড় করতে পারিস—'

অশোক বলল, 'আমি তো চেষ্টা করছি মা। আজ অফিসের পর উকিলের কাছে যাব। উকিল ছাড়া জামিন পাওয়া যাবে না মনে হচ্ছে।'

মা আর কিছু না বলে কলতলার দিকে চলে গেল। মুখটুখ ধুয়ে এখনি তাকে উনুন ধরাতে হবে।

অশোকের আর ঘুম এল না। কিছুক্ষণ পর সকাল হলে বাজারের থলে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

গলি দিয়ে খানিকটা যাবার পর বাঁকের মুখে চায়ের দোকান। সেখানে আসতেই দেখা গেল, খবর কাগজ নিয়ে ক'টা লোক উত্তেজিতভাবে আলোচনা করছে। মুখ বাড়িয়ে অশোক চট করে হেডলাইন ক'টা পড়ে নিল। 'পাক জঙ্গীশাহীর হাতে এক লক্ষ লোক নিহত।' 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে।' 'নিরস্ত্র গ্রামবাসীর ওপর প্লেন থেকে বোমাবর্ষণ'। দেখতে দেখতে মার্চেন্ট অফিসের ক্লার্ক অশোকের (অনেক ঘোরাঘুরির পর এই চাকরিটা যোগাড় করতে পেরেছিল সে।) শীতল ধমনীতে রক্ত উত্তপ্ত হয়ে ফেনাতে থাকে। তার খুব ইচ্ছা চায়ের দোকানের উত্তেজক আলোচনায়

সে-ও যোগ দেয়। কিন্তু তাড়াতাড়ি বাজার সেরে বাড়ি ফিরেই মনা আর খুকিকে স্কুলে পৌঁছে দিতে হবে। ওদের মর্ণিং স্কুল। অশোক ওদের পৌঁছেই দ্যায় ; নিয়ে আসে পুতুল।

খুকিদের স্কুলে রেখে বাড়ি আসতে আসতে আটটা বেজে যায়। তারপর দাড়ি কামিয়ে স্নান করে নাকে-মুখে চাট্টি গুঁজে ট্রাম রাস্তায় আসতেই সাড়ে ন'টা পৌনে দশটা। অথচ এ্যাটেনডান্স কাঁটায় কাঁটায় দশটায়।···

আজ অফিসে আসতেই অশোক দেখতে পেল, ছেলে-ছোকরা-কেরানীরা পূর্ব বাংলার ব্যাপার নিয়ে দারুণ হৈ-চৈ করছে। আজকাল ট্রামে-বাসে রাস্তায় রেস্টুরেণ্টে পূর্ব বাংলা ছাড়া কথা নেই। সকালবেলা চায়ের দোকানে সম্ভব হয় নি, অশোক ভাবল, এখন একবার অফিসের ছেলেদের সঙ্গে গলা মেলায়। কিন্তু তখনই মনে পড়ে গেল, তার হাতে এক গাদা ফাইল জমা হয়ে আছে। বড় সাহেবের হুকুম, দু দিনের ভেতর ফাইলগুলো পরিষ্কার করে ফেলতে হবে।

কোনদিকে না তাকিয়ে নিজের টেবিলে গিয়ে স্তূপাকার ফাইলের মধ্যে মুখ গুঁজে দিল অশোক।

টিফিনের সময় পূর্ব বাংলা নিয়ে তাদের অফিসে ছোটখাটো একটা মিটিং হয়ে গেল। ঠিক হল সবাই কিছু কিছু চাঁদা তুলে পূর্ব বাংলার ব্যাপারে পাঠাবে। কেউ কেউ তক্ষুনি টাকা দিয়ে দিল। অনেকে দিতে পারল না ; সেই দলে অশোক। মাসের সবে আট তারিখ, এর মধ্যেই মাইনের টাকার চার ভাগের তিন ভাগ খরচা হয়ে গেছে। বাকি টাকায় বাইশটা দিন যে কি করে চলবে ? তার থেকে একটা পয়সা দেওয়াও অসম্ভব। তা ছাড়া ছুটির পর উকিলের বাড়ি যেতে হবে। উকিল দিয়ে জামিন দেওয়াতে গেলে বিশ তিরিশটা টাকা কি আর লাগবে না ? এ মাসে কত যে ধার হবে, কে জানে।

অশোক জানিয়ে দিল, আসছে মাসে মাইনে পেলে চাঁদার টাকাটা দেবার চেষ্টা করবে।

(খ)

দিন চারেক পর আবার শেষ রাতে স্বপ্নের ট্রেন চড়ে বসল অশোক। গায়ে সেইরকম যোদ্ধার সাজ। ট্রেনটা স্টিমারঘাটায় পৌঁছবার আগেই কচি গলার চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল, 'বাবা—বাবা—'

ধড়মড় করে উঠে অশোক দেখল, বাবলু তলপেটে হাত চাপ দিয়ে খুব কাঁদছে। তাড়াতাড়ি তক্তাপোষ থেকে নিচে বাবলুর তলপেটে হাত বোলাতে বোলাতে সে বলল, 'কী হয়েছে রে, কী হয়েছে ?

'খুব ব্যথা করছে।'

ক'দিন ধরে জণ্ডিসে ভুগছে ছেলেটা। চোখ মুখ, হাত-পায়ের চেটো, সব হলুদ বর্ণ। ডাক্তার একটা দামী ওষুধ কিনে খাওয়াতে বলেছিল। ওষুধের প্রেসক্রিপশনটা পকেটে পকেটে ঘুরছে, কেনা আর হচ্ছে না। আজ যেভাবে হোক কিনে আনতেই হবে।

অনেকক্ষণ হাত বুলোবার পর ছেলেটা নির্জীব হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।...

মাঝখানে দু দিন ছুটি নিয়েছিল অশোক। দু দিন পর আজ অফিসে এসে সে শুনল, পূর্ব বাংলায় ইয়াহিয়ার অত্যাচারে ভিটে-মাটি ছেড়ে যে সব শরণার্থী এপারে চলে আসছে তাদের সাহায্য দেবার জন্য একটা রিলিফ কমিটি তৈরি হয়েছে। কমিটিতে অশোকের নাম ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তাদের কোম্পানির ম্যানেজমেন্ট রিলিফ ফাণ্ডে পঁচিশ হাজার টাকা ডোনেসান দিয়েছে। সেই টাকায় ওষুধটোষুধ জামা কাপড় কেনা হয়ে গেছে। আজ দুপুরে সেই সব রিলিফ নিয়ে সীমান্তে যাওয়া হবে।

দারুণ উৎসাহী একটা ছোকরা কেরানী বলল, 'চলুন অশোকদা—'

অশোক বলল, 'আমি?'

'হ্যাঁ, আপনি। আপনাকে তো কোন ব্যাপারেই পাওয়া যায় না। নিজের ফ্যামিলি ছাড়া আপনি আর কিছু বোঝেন না।'

অল্প হাসল অশোক। তারপর মনে মনে ঠিক করে ফেলল, যাবে সে, ওদের সঙ্গে নিশ্চয়ই যাবে। তক্ষুনি তার মনে পড়ে গেল, বাবলুর ওষুধটা কেনা হয় নি। আজ সাউথ ক্যালকাটায় এক বন্ধুর কাছে ক'টা টাকা ধার করতে যাবার কথা আছে। নাঃ, রিলিফ নিয়ে সীমান্তে যাওয়া আজ আর সম্ভব না।

(গ)

দিন কয়েক পর স্বপ্নের সেই ট্রেন আবার দেখা দিল। আজো ষ্টিমারঘাটে পৌছুবার আগে ভারী কিছু পড়বার শব্দে লাফিয়ে উঠে বসল অশোক। তাড়াতাড়ি আলো জ্বালতেই দেখতে পেল নমিতা মেঝেতে পড়ে আছে আর রক্তে ঘর ভেসে যাচ্ছে। থেকে থেকে তার গলায় গোঙানির মতো ক্ষীণ শব্দ হচ্ছে আর রক্তের সমুদ্রে রোগা দুর্বল শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। খুব সম্ভব নমিতা বাথরুমে যেতে গিয়ে পা ফসকে পড়ে গেছে।

প্রথম কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকল অশোক। তার মাথার ভেতরটা একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছে। তারপর হঠাৎ হাত-পায়ের জোড়ে জোড়ে হাড়-মাংস-মজ্জার মধ্যে বরফ নামতে লাগল। এক দৌড়ে সে গিয়ে দরজা খুলে ফেলল। গলা চিরে চিৎকার করে ডাকল, 'মা—মা—'

ও ঘর থেকে মা, ছায়া আর পল্টু (অতি কষ্টে নগদ পঁচিশ টাকা খরচ করে পল্টুর জামিন যোগাড় করা গেছে) বেরিয়ে এল।

তারপর ডাক্তার, এ্যাম্বুলেন্স, হাসপাতাল। সব সেরে না-খাওয়া না-চান অশোক যখন অফিসে এল একটা বেজে গেছে।

অফিসে এসে অশোক শুনল, আজ ছুটির পর তাদের অফিসের এবং অন্যান্য অফিসের স্টাফরা মিছিল নিয়ে বাংলাদেশের স্বীকৃতির জন্য বিভিন্ন কনস্যুলেটে যাবে।

অশোক ভাবল, তার যাবার উপায় নেই। ছুটির পর তাকে যেতে হবে হাসপাতালে। তার আগে নমিতার জন্য কিছু ওষুধ কিনতে হবে, হাসপাতাল থেকে নিয়ে যেতে বলেছে। এবং তারও আগে ওষুধ কেনার জন্য অফিসের দারোয়ানের কাছ থেকে চড়া সুদে শ'খানেক টাকা ধার করতে হবে।

॥ তিন ॥

পল্টুর জন্য জামিন যোগাড় করতে করতে, বাবলুর ওষুধের জন্য ধার চাইতে চাইতে কিংবা নমিতার জন্য রোজ রোজ উদ্‌ভ্রান্তের মতো হাসপাতালে ঘুরতে ঘুরতে শেষ রাতের স্বপ্নে সেই ট্রেনটার আসা-যাওয়া আবার কবে বন্ধ হয়ে গেল।

যৌবনের শুরু থেকে একটা মধ্যবিত্ত লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে আছে অশোক। জীবনের অন্য কোন মহৎ যুদ্ধ তার জন্য নয়।

দ্বিতীয় মোনালিসা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

এবার বোম্বাইতে গিয়েছিলাম প্রায় বছর পাঁচেক বাদে। ওখানে বাঙালী ও মহারাষ্ট্রীয়দের মধ্যে আমার অনেক বন্ধুবান্ধব ছড়িয়ে আছে। অনেকদিন পর গেছি বলে প্রায় সকলের সঙ্গেই একবার করে দেখা করতে হয়। নেমন্তন্ন খেতে খেতে প্রাণ ওষ্ঠাগত। বিরাট ছড়ানো শহর বোম্বাই, এক মহল্লা থেকে আর এক মহল্লায় আমি ছুটোছুটি করে নেমন্তন্ন খেয়ে বেড়াতে লাগলুম।

ফেরার দিন ঘনিয়ে এলো। আরো অনেকের সঙ্গে দেখা করা বাকি। টেলিফোনে যাকে বলে ফেলেছি, অথচ হাতে আর সময় নেই। এই জন্যই খুব বড় কোন জায়গায় আমার যেতে বিশেষ ইচ্ছে করে না। সে সব জায়গায় শুধু চেনা লোকেদের সঙ্গেই দেখা হয়, আর কিছু দেখা হয় না। এর চেয়ে কোন নাম-না-জানা ছোটখাটো জায়গায় আমার একা একা বেড়াতে ভালো লাগে।

তবু এর মধ্যে একবার সুমিতাদির বাড়ি যেতেই হবে। উনি অনেক আগে বলে রেখেছেন। ওঁর ওখানে একদিন খেতে হবে। প্রায় রাজনৈতিক নেতাদের মতন ব্যস্ত ভঙ্গিতে আমি এক সকালে অন্য দু'বাড়ি ঘুরে তারপর হাজির হলাম সুমিতাদিদের বাড়িতে। ওঁর স্বামী ডাক্তার, ওঁরা বহু বছর ধরে আছেন বোম্বাইয়ে, সুতরাং বোম্বাইয়ের আশেপাশের কোন্ কোন্ জায়গা আমার দেখা উচিত তা ওঁরা খুব ভালো জানেন, সেই সব জায়গার কথা আমাকে শোনাতে লাগলেন। কিন্তু আমার আর সময় নেই। আগামী কাল ভোরবেলায় আমায় প্লেন ধরতে হবে।

সুমিতাদির ছেলের নাম আনন্দ, সে ছবি আঁকে। বছর কুড়ি-একুশ বয়েস, বেশ সুদর্শন এবং উৎসাহে ভরপুর ছেলেটি। তার দু' একটি ছবি এখানকার প্রদর্শনীতেও স্থান পেয়েছে। সে তার ছবিগুলো দেখাতে লাগল। আমি ছবির খুব একটা সমঝদার নই। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে ভালো বলাই নিয়ম, তাই বেশ ভালো ভালো বলে যাচ্ছিলাম। চোখে দেখতে ছবিগুলো ভালোই লাগছিল।

একটি বেশ বড় ফ্রেমে বাঁধানো ছবি বার করে সে বলল, দেখুন, আমার

এই ছবিটা একজিবিশনে প্রাইজ পেয়েছে।

আমি বললাম, বাঃ এটা তো দারুণ!

ছবিটি লিয়োনার্দো দা ভিঞ্চির 'মোনালিসা'র একটি কপি। রং অবশ্য অন্যরকম। কালো আর নীল রংয়ের ব্যবহারই বেশী। অনেকটা যেন ফটোগ্রাফের নেগেটিভের মত।

আমি প্রশংসা করার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ বলল, আপনি এই ছবিটা নেবেন?

সুমিতাদিও অমনি বললেন, হ্যাঁ, ছবিটা সুনীলকে উপহার দে।

আমি প্রবল আপত্তি করে উঠলুম। কারুর বাড়িতে গিয়ে কোন কিছুর প্রশংসা করা মানেই সেই জিনিসটি নেওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করা নয়। এরকম ভাবে কোন জিনিস নেওয়া আমার কাছে একটা অত্যন্ত অস্বস্তিকর ব্যাপার।

আমি যত না না করতে লাগলুম, ওঁরাও ততই জোর করতে লাগলেন। তখন আমাকে দৃঢ়ভাবে বলতেই হল যে, ছবিটা নিয়ে আসার পক্ষে অসম্ভব। তার কারণ, এখান থেকে আমাকে আরও তিন জায়গায় যেতে হবে, সব জায়গায় আমি এতবড় একটা ছবি সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে পারব না। তা ছাড়া আমি কলকাতায় ফিরব বিমানে, এই সাইজের একটি ছবি হাতে করে নিতে দেবে না। লাগেজ হিসাবে বুক করলেও ছিঁড়ে নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা।

আসল কথাটা হচ্ছে এই, কলকাতায় আমার বাড়িতে অতবড় একটা ছবি টাঙানোর জায়গা নেই। তা ছাড়া, মোনালিসার একটি কপি সম্পর্কেও আমার আগ্রহ প্রবল নয়।

সেদিন নিষ্কৃতি পেয়ে গেলাম।

কলকাতায় ফেরার মাস দেড়েক বাদে একদিন একজন অপরিচিত লোক এলেন আমার কাছে। লোকটি বললেন যে তিনি বোম্বাই থেকে আসছেন এবং তাঁর হাত দিয়ে সুমিতাদি আমার জন্য একটি জিনিস পাঠিয়েছেন।

বিশাল প্যাকেটটি দেখেই আমি বুঝলাম, ওটা সেই মোনালিসার ছবি।

সুমিতাদির ছেলে খুব যত্ন করে বাঁধিয়েছে ছবিটি। এঁকেছেও অনেক পরিশ্রম করে। ছবিটির বেশ কিছু গুণও রয়েছে। সুতরাং এমন একটা জিনিস আমাকে শুধু শুধু উপহার দেওয়ায় আমি তখনও একটু লজ্জা বোধ করলুম।

আমার ছোট ঘরটি বইয়ের র‍্যাকে ভর্তি। দেয়ালে অতবড় একটি ছবি টাঙানোর খুবই অসুবিধে। তা ছাড়া, বড় ছবি দেখতে হয় অনেকটা দূর থেকে, এত ছোট ঘরে এই ছবি মানায় না। কিন্তু উপায় তো নেই। ছবিটা রাখলাম আমার শোয়ার খাটের পাশেই মাটিতে।

খাটে শুয়ে শুয়ে আমি লিখি বা বই পড়ি। প্রায়ই চোখ চলে যায় ছবিটার দিকে। প্রত্যেকদিন দেখতে দেখতে ছবিটা আমার মুখস্থ হয়ে গেল। কোথায় কোন রং ঠিকমত মিশেছে বা মেশেনি, সব আমি এখন ধরতে পারি।

প্যারিসের ল্যুভর মিউজিয়ামে মূল মোনালিসা ছবিটি রাখা আছে। সাহেবরা এখন উচ্চারণ করে মোনালিজা কিন্তু বাংলাতে মোনালিসাই চলে গেছে। একদিন সকাল দশটা থেকে আমি ল্যুভর মিউজিয়াম দেখতে শুরু করেছিলাম। অতবড় বিরাট মিউজিয়াম একদিনে দেখা শেষ হয় না। চতুর্দিকে বিশ্ববিখ্যাত সব ছবি ও মূর্তি। বিকেলবেলা গেট বন্ধ হয়ে যাবার ঘণ্টা পড়েছে, তখন খেয়াল হয়েছিল, আরে, এখনো তো মোনালিসাই দেখা হয়নি! গাইডদের জিজ্ঞেস করে ছুটতে ছুটতে গিয়ে মোনালিসার ছবির সামনে দাঁড়ালাম। সত্যি কথা বলতে কী, আমি হতাশই হয়ে ছিলাম তখন!

যে-কোন ব্যাপার সম্পর্কেই আগে থেকে অনেক কিছু শোনা থাকলে সত্যি চোখে দেখার পর সেটা আর ঠিক মেলে না। কল্পনার কাছে বাস্তব হেরে যায়। এই জন্যই অনেকে তাজমহল দেখতে গেলেও হতাশ হয়।

আসল মোনালিসা ছবিটি খুব একটা বিরাট আকারেরও নয়। আরো অনেক ছবির মধ্যে একটি মাঝারি আকারের ফ্রেমে বাঁধানো ছবি। সামনে দাঁড়ালে মনে হয়, ওমা, এই সেই বিখ্যাত ছবিটা! কী জন্য এর এত নাম-ডাক।

এই মৃদুহাস্যমুখী নারীটিকে নিয়ে কতরকম জল্পনা-কল্পনাই হয়েছে এতকাল ধরে। অনেকের মতে, যে-মহিলাটিকে দেখে লিওনার্দো এই ছবিটি এঁকেছিলেন, সে সময় মহিলাটি ছিল গর্ভিণী। পিছনের পাহাড়ের পটভূমিকায় এক চিরকালের নারী। তার মুখের হাসিটির মধ্যে রয়ে গেছে সৃষ্টির রহস্য ইত্যাদি ইত্যাদি।

সুমিতাদির ছেলে আনন্দ অবশ্য পুরো ছবিটি আঁকেনি। পিছনের পটভূমিকা সে বাদ দিয়েছে, তার বদলে জুড়ে দিয়েছে একটা কালো রঙের চাঁদ। ঠোঁটের পাতলা হাসিটিই নেই, তার বদলে ফুটে উঠেছে এক ধরনের বিষণ্ণ গাম্ভীর্য। কিন্তু মুখের আদলটি ঠিক মোনালিসারই মতন। আর আসল মোনালিসার চেয়েও এই ছবিটি আকারে বড়।

একএক সময় চমকে উঠি। আমার শিয়রের কাছে একটি মেয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে। হঠাৎ মনে হতো জীবন্ত। এত কাছে কেউ ছবি রাখে না। কিন্তু আমাকে রাখতে হয়েছে বাধ্য হয়ে। কোন কোন দিন রাত্রে আলো জ্বেলে ঘুমিয়ে পড়ি, এক সময় ঘুম ভেঙে গেলে মনে হয়

মোনালিসা আমার মাথার ওপর ঝুঁকে আছে। এক্ষুনি যেন বলবে, এই ওঠো, অন্ধকার কর ঘর !

বাড়িতে যে-সব লোকজন আসে তারা ছবিটা দেখে নানারকম মন্তব্য করে।

কেউ বলে, বাঃ বেশ ভালো ছবিটা তো ! কোথায় পেলে ?

এটা কার ছবি ? মোনালিসা না ? ঠিক ধরেছি কিনা বল ?

কেউ কেউ প্রথমেই খুব সতর্ক ভাবে জিজ্ঞেস করে, এটা কার আঁকা ?

অর্থাৎ যদি এটা আমার নিজের আঁকা হয়, কিংবা কোন ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা আত্মীয়ের আঁকা হয়, তা হলে ভালো বলবে। আর যদি শোনে কোনো নতুন শিল্পীর, তা হলে বলবে মন্দ না।

একজন আমাকে বলেছিল, মাথার কাছে অত বড় একটা ছবি রেখেছ, তোমার ভয় করে না ?

না, করে না। ছবি দেখলে ভয় করবে কেন ? কিন্তু প্রত্যেকদিন দিনের অনেকখানি সময় ঐ ছবিটা দেখার ফলে মুখটা আমার মনের মধ্যে গেঁথে যায়। যখন তখন চোখ বুজলেও আমি ঐ মুখটা দেখতে পাই।

এরপর একটা অত্যাশ্চার্য ব্যাপার ঘটল। কোন একটা জরুরী কাজে আমি একটা ট্যাক্সি নিয়ে যাদবপুরের দিকে যাচ্ছিলাম, গড়িয়াহাট মোড় পেরুবার সময় বাঁ দিকের ফুটপাতের ওপর দাঁড়ানো একটি মেয়েকে দেখে আমি চমকে উঠলাম। মুখখানা খুব চেনা-চেনা। কোথায় যেন দেখেছি।

গোলপার্কে আসবার আগেই আমার মনে হল, ঐ মুখ তো ঠিক মোনালিসার মত। সাঙঘাতিক মিল আছে। এ রকম কখনো হয় !

আমি সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্সি- চালককে বললাম, ট্যাক্সিটা ঘোরাও তো ! সে একটু অবাক হল।

পুরো গোলপার্কটি ঘুরে, গড়িয়াহাট মোড়ের লাল বাতি পেরিয়ে আরও সামনে খানিকটা গিয়ে বাঁক নিয়ে যখন বাঁ দিকে এলাম, তখন সেখানে মেয়েটি নেই। হয়তো এর মধ্যেই কোন বাসে উঠে পড়েছে, কিংবা রাস্তা পেরিয়ে গেছে। তাকে আর দেখা গেল না।

যেতে যেতে আমি ভাবতে লাগলাম, এ কি আমার ভুল ? আমি বাড়িতে সব সময় মোনালিসা দেখতে শুরু করেছি ! কিন্তু রাস্তায় তো আরও অনেক মেয়ে দেখি, আর তো কখনো মনে হয়নি এরকম।

ব্যাপারটা সেখানেই ভুলে গেলাম।

কিন্তু দিন পনেরো পরেই, খুব সম্ভবত সেই মেয়েটিকেই আমি দেখলাম আবার। এবার আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম রাস্তায় মেয়েটি চলে গেল ট্যাক্সিতে।

একবার মুখ ফিরিয়েছিল আমার দিকে, তাতেই আমি কেঁপে উঠেছিলাম। একেবারে অবিকল সেই মুখ। মোনালিসার মতনই খানিকটা ভারী চেহারা, প্রায় গোল ধরনের মুখ, এই রকম গালে সাধারণত টোল পড়ে, খোলা চুল।

ট্যাক্সিটার দিকে আমি সতৃষ্ণ ভাবে চেয়ে রইলাম। কিন্তু মেয়েটিকে আর দেখা গেল না।

রাত্রে বাড়ি ফিরে আমি ছবির মোনালিসাকে জিজ্ঞেস করলাম, বল তো, সুন্দরী, তোমার মতন দেখতে আর কেউ আছে? থাকতে পারে?

ছবির মোনালিসা যেন স্পষ্ট উত্তর দিল, না, নেই, না নেই, থাকতে পারে না, থাকতে পারে না।

আমার ঘরে প্রতি মাসেই বইপত্র বাড়ে। নানান জায়গা থেকে বই পাই। এত ছোট ঘরে রাখবার জায়গা হয় না। ছুটির দিনে বই গুছোতে গিয়ে সারাদিন কেটে যায়। ছবিটাকে এদিক থেকে ওদিকে সরিয়ে রাখি, একবার রাখলাম দরজার পাশে।

সেদিন রাত্রে প্রচণ্ড একটা শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। উঠে আলো জ্বেলে দেখলাম, দেয়ালে দাঁড় করিয়ে রাখা ছবিটা আছড়ে পড়ে গেছে মাটিতে। বাইরে তুমুল ঝড়-বৃষ্টি। উঠে গিয়ে ছবিটাকে দাঁড় করালাম। মনে হল ছবির মোনালিসার মুখে যেন একটা অভিমানের চিহ্ন ফুটে উঠেছে। আমি তাকে শিয়রের কাছ থেকে সরিয়ে দরজার পাশে রেখে দিয়েছি। সেই জন্য।

যত্ন করে ছবিটার গায়ে হাত বুলোলাম। পড়ে যাবার জন্য ছবিটার কোন ক্ষতি হয়নি অবশ্য। কিন্তু এরকম ভাবে বার বার পড়ে গেলে ফ্রেমটা ভেঙে যাবে।

ছবিটা আবার নিয়ে এসে রাখলাম শিয়রের কাছে। মোনালিসা সুন্দরীর গালে হাত দিয়ে বললাম, রাগ কোর না লক্ষীটি! আর তোমায় কক্ষনো অন্য জায়গায় রাখব না।

পরদিন সকালে উঠে মনে হল, ছবিটার বড় অযত্ন হচ্ছে। আমার ঘরে এভাবে ফেলে না রেখে বরং কারুকে দিয়ে দেওয়া উচিত! কাকে দিই?

চেনা-শোনা অনেকেই ছবি ভালোবাসে, কেউ বা রীতিমত ছবির বোদ্ধা। তাদের যে-কোন একজনের কাছে প্রস্তাবটা তোলা যায়। কিন্তু ঠিক কাকে যে প্রথমে বলব, সে বিষয়েই মনস্থির করতে পারলাম না।

আজ হঠাৎ মনে পড়ল দেবেশদার কথা। দেবেশদা একজন নাম-করা ডাক্তার। কিন্তু ডাক্তারদের মধ্যে তিনি অত্যন্ত একটি ব্যতিক্রম। তিনি দারুণ ভালোবাসেন গান, ছবি, কবিতা—এইসব। সারাদিন তিনি অত্যন্ত

ব্যস্ত থাকেন, কিন্তু রাত আটটার পর আর রুগী দেখতে চান না পারতপক্ষে। নেহাত কোন মরণাপন্ন কেস এলে তিনি দেখেন, নইলে বলে দেন, এখন আমার ছুটি। সারাদিন অসুস্থ লোকের সঙ্গে কাটালে আমি নিজে বেঁচে থাকার আনন্দটা পাব কখন? কলকাতা শহরে একমাত্র দেবেশদার চেম্বারেই আমি রবীন্দ্র-রচনাবলী দেখেছি। রুগী দেখার ফাঁকে ফাঁকে তিনি একটু রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ে নেন।

রাত আটটার পর দেবেশদার চেম্বারে খুব জোর একটা আড্ডা হয়। মাঝে মাঝে সেখানে গেছি আমি। তখন সেখানে একদম অসুখের কথা আলোচনা হয় না। হয় শুধু সুখের কথা। কেউ এসে গান গায়, কেউ চেঁচিয়ে কবিতা আবৃত্তি করে। দেবেশদা নিজেও প্রায়ই আমাদের মুখে মুখে তৎক্ষণাৎ স্বরচিত কবিতা শোনান। সেগুলি অবশ্য কবিতা হিসেবে এমন কিছু নয়, কিন্তু তাঁর উৎসাহটা দেখবার মত।

একদিন দেবেশদার আড্ডাখানায় কথায় কথায় বললাম, দেবেশদা, তুমি, একটা ছবি নেবে? তোমার চেম্বারের এই দিকের দেয়ালটা ফাঁকা আছে, এখানে ছবিটা মানাবে।

কী ছবি?

আমি ছবিটার পরিচয় দিলাম। দেবেশদা সব শুনে আবেগের সঙ্গে বললেন, নিশ্চয়ই। রুগী দেখতে দেখতে মাঝে মাঝে ছবিটার দিকে তাকালে আমার মন ভালো হবে। রুগীদেরও মন ভালো লাগবে। যা, যা, নিয়ে আয়।

দু' একদিনের মধ্যেই আমি ছবিটা পৌঁছে দিলাম।

তারপর থেকে আমার ঘরটা ফাঁকা ফাঁকা লাগতে লাগল। ঘরে ঢুকেই মনে হয় কী যেন নেই, কী যেন নেই! তবু এতদিন একটি নারী সঙ্গ পেতাম এখন ঘরটা শূন্য মনে হয়। এক-একদিন বেশী রাত্রে বাড়ি ফিরে আমার ঘরের আলো জ্বেলে হঠাৎ মনে হয়, আমার খাটের মাথার সামনে মোনালিসাকে দেখতে পাবো। কিন্তু সেখানে একটা বইয়ের গাদা জমে গেছে। একটু একটু মন খারাপ লাগে।

হয়তো ছবিটার টানেই আমি দেবেশদার, আড্ডায় ঘন ঘন যেতে লাগলাম। কথা বলতে বলতে প্রায়ই ছবিটার দিকে তাকাই। মনে হয় মোনালিসা আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। যেন তার মুখে একটু অভিমানের পাতলা ছায়া নতুন করে লেগেছে। আমি তাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছি, সেই জন্য অভিমান? আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলি। আমার তো আর কিছু করার ছিল না। এখানে ছবিটা পাঠিয়ে দিয়ে বরং অনেক

ভালো হয়েছে। দেখছে অনেকে। মোনালিসা যদি একজন জীবন্ত মেয়ে হত, তবে সে শুধু একজনের হত। কিন্তু শিল্পকীর্তি সকলের জন্য।

দেবেশদা ছবিটা পেয়ে খুব খুশী। আমাকে প্রায়ই বলেন, জানিস প্যারিসে একবার একটা কনফারেন্সে গিয়ে আমি আসল ছবিটা দেখেছিলাম। এই ছবিটা অবশ্য সেটার মতন নয়, অনেক কিছু বাদ গিয়েছে।

আমি বললাম, একজন আধুনিক শিল্পী এঁকেছে তো, সে তো খানিকটা নিজস্ব চিন্তা মেশাবেই।

দেবেশদা বললেন, ঠিক। একালের কোন ছেলে যদি পুরনো কালেরই অনুকরণ করে তা হলে আর সে আধুনিক কেন? সে তো নতুন কিছু করবেই। যে কালো রঙের চাঁদটা এঁকেছে ওটা সত্যি দারুণ!

আমি অবশ্য চাঁদের ব্যাপারটা খুব একটা সাজ্ঘাতিক কিছু ভালো মনে করিনি। তবু চুপ করে রইলাম।

দেবেশদা বললেন, আমার কাছে যখন রুগীরা আসে, আমি প্রথমেই এ ছবি সম্পর্কে একটা লেকচার দিই। রুগীদের মন যদি কিছুক্ষণের জন্য অন্তত রোগ থেকে সরানো যায়, তা হলেই অর্ধেক চিকিৎসা হয়ে যায়, বুঝলি না? সবাইকে আমি প্রথমেই জিজ্ঞেস করি, এই মুখটা কার বলুন তো? বেশীর ভাল লোকই বলতে পারে না। সব ইডিয়েট তো! এদেশের লোকের তো ছবি দেখার চোখ নেই। স্কুল-কলেজে যারা লেখাপড়া শেখে তারাও শিল্প সম্পর্কে কিছু জানে না। অথচ আমরা ভারতীয়রা নাকি দারুণ সংস্কৃতিবান।

দেবেশদা শিল্প সম্পর্কে এক লম্বা লেকচার দিলেন, আর ততক্ষণ আমি মোনালিসার দিকে চেয়ে রইলাম। যেন আমি আমার এক পুরনো প্রেমিকাকে দেখছি।

দেবেশদা আবার বললেন, বিশেষ করে এই ছবিটা নিয়ে আমি বেশীক্ষণ কথা বলি প্রেগনেন্ট মেয়েদের—

আমি জিজ্ঞেস করলাম, দেবেশদা আপনিও তাহলে বিশ্বাস করেন যে মোনালিসা একটি গ [illegible] মেয়ের ছবি?

দেবেশদা জোর দিয়ে বললেন, নিশ্চয়ই! এই চোখের নীচের জায়গা দুটো ছাখ, ঠিক প্রেগনেন্ট মেয়েদের এরকম হয়। তারপর ছাখ মেয়েটির যা বয়স, সেই তুলনায় তার বুক দুটো অনেক বড়। তার মানে প্রায় ন'মাস। আর এর যে পোশাক, ইয়োরোপে পোয়াতি মেয়েরাই এ রকম পোশাক পরে।

আমি বললাম, তা ঠিক।

দেবেশদা বললেন, সবচেয়ে বড় হচ্ছে এর হাসিটা। আহা! এ যেন বিশ্বপ্রকৃতি! যে প্রকৃতি মানুষের জীবন-প্রবাহকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে। প্রাণ সৃষ্টির যে কী অপূর্ব আনন্দ! সেইজন্যই আমি আমার কাছে যে সব পোয়াতী মেয়েরা আসে, তাদের বলি, আপনাদের যা কষ্ট বা অসুবিধে হচ্ছে সব ভুলে যান। এরকম ভাবে একটু হাসতে শিখুন তো!

আমি বললাম, দেবেশদা, জান, কলকাতার রাস্তায় আমি একটি মেয়েকে দেখেছি, তাকে দেখতে ঠিক মোনালিসার মতন!

দেবেশদা হা হা করে হেসে উঠলেন। আমার কাঁধে একটা প্রবল চাপড় মেরে বললেন, তোরা কবিরা বড্ড রোমান্টিক! এরকম মুখ বাস্তবের কারুর সঙ্গে কক্ষনো মেলে না! ইয়োরোপেই এরকম মুখ আর একটিও দেখা যায় না, কিন্তু তুই দেখতে পেলি কলকাতা শহরে? হা-হা-হা!

সব গল্পের শেষেই একটা চমক থাকে। আজকাল চমক ছাড়াও অন্য রসের গল্প লেখা হয়, কিন্তু এর মধ্যে আমি নিজেই একটা দারুণ চমক খেলাম বলেই সেটা লিখতে হবে আমাকে।

একদিন বিকেলের দিকে দেবেশদার চেম্বারে যেতে হল আমাকে আমার ছোটমাসীর একটা ব্লাড রিপোর্ট দেখাবার জন্য। এই সময়ে দেবেশদা চেম্বারে বেশ ভিড় থাকে। অন্তত দু'ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয় কিন্তু আমার তো এতসময় অপেক্ষা করলে চলবে না। ভেতরে একজন রুগী আছে বলে আমি দেবেশদার অ্যাসিস্ট্যাণ্ট কানাইয়ের হাত দিয়ে একটা স্লিপ পাঠিয়ে দিয়ে বাইরে বসে রইলাম।

ডাক্তারদের চেম্বারের বাইরে ওয়েটিং রুমে অনেক রকম পুরনো পত্র-পত্রিকা থাকে। সে রকম একটি পত্রিকা আমি তুলে নিতে যাচ্ছি এমন সময় পাশ থেকে আর একজন মহিলাও ঠিক সেই পত্রিকাটি নেবার জন্য হাত বাড়ালেন।

আমি তৎক্ষণাৎ হাত সরিয়ে নিয়ে বললাম, নিন না আপনি, নিন।

মহিলাটি আমার দিকে তাকালেন। তখনই আমি আমূল চমকে উঠলাম। এই মহিলাটিকেই আমি একদিন গড়িয়াহাট মোড়ে আর একটি চলন্ত ট্যাক্সিতে দেখেছিলাম। সেই মোনালিসার মুখ।

বেশ স্বাস্থ্যবতী, সচ্ছল চেহারার মেয়েটি। মুখে আধুনিক আভিজাত্যের চিহ্ন। সে কোন কথা না বলে পত্রিকাটি তুলে নিল। সে কিংবা তিনি মেয়েটির চেহারার মধ্যে তুমির বদলে আপনি আপনি ভাব আছে। আমি ঠিক পাশেই বসে আছেন বলেই আমি তাঁর দিকে ভালো করে তাকাতে পারছিলাম না। একটু দূরে বসলে ভালো হত!

একটু পরেই দেবেশদা আগের রুগীটিকে ছেড়ে দিয়ে চেম্বারের দরজা খুলে বললেন, আয় সুনীল, ভেতরে আয়!

আমি ভেতরে ঢুকেই নিজের কাজের কথা বলবার বদলে উত্তেজিত ভাবে ফিসফিস করে বললাম, দেবেশদা আপনাকে বলেছিলাম না, একটি মেয়েকে ঠিক মোনালিসার মতন দেখতে!

দেবেশদা খানিকক্ষণ ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। তারপর বললেন, কোন মেয়েটি!

আমি বললাম, আমি যেখানে বসেছিলাম, ঠিক তার পাশের মেয়েটি।

দেবেশদা চেম্বারের দরজা খুলে উঁকি মেরে এলেন। ফিরে এসে বললেন, তোর মাথা খারাপ! ও তো রুচিরা সান্যাল, জ্যাস্টিস পি সান্যালের মেয়ে। ওর সঙ্গে তুই মোনালিসার কোন্ মিল খুঁজে পেলি?

—কেন, আপনি পেলেন না?

—কিসের মিল? কোন মিল নেই!

আমি ছবির মোনালিসার দিকে তাকিয়ে দেখলাম। অনেকটা মিল আছে। একই রকম থুতনি, একই রকম ওষ্ঠের রেখা।

দেবেশদা বললেন, ডাকব ওকে? তুই ওর সঙ্গে আলাপ করতে চাস?

আমি বললাম, না, না, আমি আর কী কথা বলব!

দেবেশদা মোনালিসার ছবিটার দিকে তাকালেন একবার। তারপর একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, তুই যখন কথাটা তুললিই তখন তোকে একটা কথা বলি। বলা উচিত নয়, তবুও বলছি। রুচিরা এখানে কেন আসে জানিস?

আমি কৌতূহলী চোখে তাকালাম।

দেবেশদা বললেন, ও গর্ভপাত করাতে চায়। আমি ওকে অনেক বুঝিয়েছিলাম, ও শোনেনি? ও করাবেই। আমারও কয়েকদিন ধরে মনে হচ্ছে, ওর যুক্তিটাই ঠিক। বোধহয় ওর গর্ভপাত করানোই উচিত।

আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, কেন?

দেবেশদা বললেন, তুই রুচিরা সান্যালের নাম শুনিস নি? কাগজে একবার বেরিয়েছিল। রাজনৈতিক কারণে গত বছর ওকে পুলিসে অ্যারেস্ট করেছিল। জেরা করার সময় নানারকম বীভৎস অত্যাচারে ও অজ্ঞান হয়ে যায়। সে সব অত্যাচারের কথা আর তোকে শোনাতে চাই না। তারপর যখন ও বেল-এ ছাড়া পেল তখনই টের পেল যে ও গর্ভবতী। ওর গর্ভে এক চরম অন্যায়ের সন্তান। বাবা কে, তাও জানে না। এই সন্তানকে ও কোনোদিনই ভালো মনে নিতে পারলে না। তাই ও চায়···এ সম্পর্কে তুই

কী বলিস ?

আমার কিছু বলার নেই, আমি চুপ করে রইলাম।

দেবেশদার কাছে কাজ সেরে বেরিয়ে আসবার সময় আমি সেই মেয়েটির মুখের দিকে একবার তাকালাম: একটি পত্রিকা আড়াল করে সে বসে আছে। হ্যাঁ, এখন দেখলে বোঝা যায়, মেয়েটি গর্ভবতী। কিন্তু এর মুখে কী রাগ না দুঃখ না ঘৃণা না উদাসীনতা ? অথবা সব মিলিয়ে অন্য একটি রূপ ? আমি শিল্পী নই। আমার একটুও ক্ষমতা নেই ছবি আঁকবার। তবু আশা করে থাকব, নতুন কালের কোন শিল্পী নিশ্চয়ই একদিন এই মেয়েটির ছবি শাশ্বত করে রেখে দেবে।

তৃতীয় পক্ষ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

একদম আনকোরা, টাটকা, নতুন বৌকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিল গুপ্ত। বৌয়ের নাম শম্পা! শম্পার সঙ্গে বিয়ের আগে কখনো দেখা হয়নি গুপ্তর। প্রেম-ট্রেমের প্রশ্নই ওঠে না, এমনকি বিয়ের আগে শম্পাকে চোখেও দেখে নি। একটা ফটোগ্রাফ অবশ্য পাঠিয়েছিল ওরা কিন্তু গুপ্ত সেটাও স্পর্শ করে নি।

বিয়ের আগে গুপ্তর একটা প্রেম কেঁচে যায়। সে বিয়ে করতে চেয়েছিল মলি নামে এক স্কুল শিক্ষিকাকে। মলি দেখতে শুনতে যাই হোক, স্বভাব যেমন ধারাই হয়ে যাক না কেন, গুপ্ত তাকে ভালোবাসতো। মলিরও গুপ্তর প্রতি ভালোবাসার অভাব দেখা যায় নি কখনও।

কিন্তু ঠিক মাস দুয়েক আগে এক বিকেলে ভিক্টোরিয়ার বাগানে বসে মলি, গুপ্তকে একটা সদ্য চেনা চৌকস ছেলের বিবরণ দিয়েছিল, ছেলেটা নাকি দুর্দান্ত স্মার্ট, আই, এ, এস দিয়েছে এবং নির্ভুল ইংরেজী গড়গড় করে বলতে পারে। গুপ্ত এর কোনোটাই পারে না। সে একটা কলেজের দর্শনের অধ্যাপক, কিন্তু অধ্যাপনায় তার একদম সুনাম নেই, বরং ছাত্ররা তার ক্লাস কামাই করে, একবার তার বিরুদ্ধে জয়েণ্ট পিটিসনও দিয়েছিল অধ্যক্ষের কাছে।

তাই মলির মুখে এক অচেনা ছেলের চৌকস বিবরণ শুনে সে একটু নার্ভাস হয়ে যায়। প্রেমের ক্ষেত্রে কোনোরকম প্রতিদ্বন্দ্বিতা তার পছন্দ নয়। কারণ বরাবর গুপ্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেরে গেছে।

ইস্কুলের নিচু ক্লাসে পড়ার সময়ে একবার সে ইস্কুল স্পোর্টসে নাম দেয়। একশমিটার দৌড়ে শুরুতে সে বেশ এগিয়ে গিয়েছিল, অন্তত সেকেণ্ড প্রাইজটা পেতই। হঠাৎ নিজের এই আশু সাফল্য টের পেল সে সেকেণ্ড হতে চলেছে, দৌড় শেষে ফিতেটাও খুব কাছে এগিয়ে এসেছে, কিন্তু যেই ব্যাপারটা সে টের পেল অমনি তার দুই হাঁটুর একটা হঠাৎ কেন যে আর একটাকে খটাং করে ধাক্কা মারল কে জানে! সেখানেই শেষ নয়। শোধ নিতে অন্য হাঁটুটাও এ হাঁটুকে দিল গুঁতিয়ে। কনিষ্ক গুপ্ত ফিতে ছুঁতে পারল না, দৌড় শেষের কয়েক গজ দূরে নিজের দুই হাঁটুর হাঙ্গামায় জড়িয়ে বস্তার মতো পড়ে গড়াগড়ি খেল।

আর একবার আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় চৌদ্দশো সাল আবৃত্তি করার সময়ে সে এত চমৎকারভাবে কবিতাটির অন্তর্নিহিত ব্যথা ও বেদনাকে কণ্ঠস্বরে প্রক্ষেপ করেছিল যে নিজেই বুঝেছিল, প্রতিযোগিতায় তার ধারে কাছে কেউ আসতে পারবে না। শ্রোতারাও শুনছিল মন্ত্রমুগ্ধের মতো। কবিতার শেষ কয়েকটা লাইনে এসে কনিষ্ক যখন পরিষ্কার বুঝতে পারছে, এক সেট রবীন্দ্র-রচনাবলীর প্রথম পুরস্কারটি তার হাতের নাগালে তখনই হঠাৎ কোথা থেকে এক ভূতুড়ে বিভ্রম এসে তার মাথার ভিতরে জল ঘোলা করে দেয়। শেষ দুটি লাইন একদম মনে পড়ল না। বার কয়েক তোত-লাল সে। তারপর নমস্কার করে লজ্জায় রাঙা মুখ নিয়ে উইংসের আড়ালে চলে এল। একটা সান্ত্বনা পুরস্কার পেয়েছিল সেবার।

বড় হওয়ার পর একবার বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে রেসের মাঠে গিয়ে-ছিল কনিষ্ক। রেসের কিছুই তার জানা নেই, মহা আনাড়ী যাকে বলে। সে তাই ঠিক করল সব কটা রেসের দু'নম্বর ঘোড়ার ওপর একটা করে বাজি খেলবে।

প্রথম তিনটে রেসে খেললও দু'নম্বর ঘোড়ায়। তিনটেতেই দু'নম্বর হেরে গেল। তখন এক বন্ধু বলল, কি আনাড়ীর মতো পয়সা নষ্ট করছিস? দেখেশুনে বাছাই ঘোড়ার ওপর খেল!

একটু দ্বিধায় পড়ে গেল কনিষ্ক। তখন প্রায় পনেরো টাকার মতো লস চলছে। এই দ্বিধাই তার কাল হল। পরের চারটে রেসে সে বাছাই ফেবারিট ঘোড়াগুলোর ওপর বাজি ধরতে লাগল। সব কটাতেই হার। কিন্তু শেষ চারটে রেসে প্রতিবার জিতল দু'নম্বর ঘোড়া।

প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতাকে তাই বড় ভয় পায় কনিষ্ক গুপ্ত। মলির মুখে সেই অচেনা পুরুষটির প্রশংসা শুনে সে মনে মনে খুব অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। এতকাল মলিকে নিয়ে তার কোনো ভাবনা ছিল না। খুব সহজ ছিল সম্পর্ক।

ব্যাপারটা ভাল করে বোঝবার জন্য সে পরদিন নিজে থেকেই সেই ছেলেটির প্রসঙ্গ তুলে বলল—মলি, কাল তুমি সুব্রত নামে ছেলেটির কথা বলছিলে, তার কথা শুনতে আমার বেশ লাগছিল। কেমন দেখতে বল তো?

মেয়েরা গন্ধ পায়। মলি একবার সচকিত হয়ে কনিষ্কের দিকে তাকাল। আর মলির সেই সচকিত ভাবটুকু দেখে কনিষ্কও বেশ সচকিত হয়ে ওঠে। মানুষের দুর্বল গোপনীয় কোনো বিষয়ে স্পর্শ হলে মানুষ ঐ রকম চমকে ওঠে কেমন করে। কিন্তু মলির সে ভাবটা বেশীক্ষণ রইল না। আসলে

সুব্রতর চালচলনে সে এত বেশী মুগ্ধ হয়েছে যে সে কথা কাউকে না বলেই বা সে থাকে কি করে ?

মলি বলল—দেখতে ? ধরো ছ ফুট লম্বা, ছিপছিপে, রঙ একটু কালো হলেও মুখখানা ভীষণ চালাক। এত সুন্দর হাসে!

কনিষ্ক নিজে পাঁচ ফুট পাঁচ। রোগা, ফ্যাকাসে এবং ভাবুক ধরনের চেহারা। সে আবার ভীষণ অন্যমনস্কও। প্রায় সময়েই এক কথার আর এক উত্তর দেয়। মনে মনে নিজের পাশে সুব্রতকে কল্পনা করে সে ঘুমিয়ে গেল।

মলির সঙ্গে সেই থেকে সম্পর্কটা আর স্বাভাবিক রইল না। মাঝখানে এক অচেনা সুব্রত এসে পর্দা ফেলে দিল।

পরের এক মাস কনিষ্ক নানা জ্বলুনিতে জ্বলে গেল মনে মনে। মলি তখন প্রায় সময়েই সুব্রতর সঙ্গে প্রোগ্রাম করে। তবে সে একথা বলত—দেখ, হিংসে কোর না যেন। কোনো পুরুষই তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয় আমার কাছে।

কিন্তু কনিষ্ক সে কথা মানে কি করে? সে যে অনবরত হীনমন্যতায় ভুগছে।

তাই একদিন সে তার পরিষ্কার গোটা গোটা হস্তাক্ষরে চিঠি লিখে মলিকে জানিয়ে দিল—আমাদের আর বেশীদূর এগোনো ঠিক নয় মলি। এখানেই দাঁড়ি টেনে দেওয়া উচিত।

চিঠি লিখে সে ছ' মাসের ছুটি নিয়ে বাইরে গেল বেড়াতে। এতদিনে বাড়ির লোকেরা তার বিয়ে ঠিক করল। মাত্র পনেরো দিন আগে সে সম্পূর্ণ অদেখা, অচেনা, অজানা শম্পাকে বিয়ে করেছে। বলতে কি, শম্পার সঙ্গে তার প্রথম দেখা শুভদৃষ্টির সময়ে। ভাল করে তাকায় নি কনিষ্ক। তার মনে তখন এক বিদ্রোহ ভাব। সমস্ত পৃথিবীর প্রতি বিতৃষ্ণা, বিরাগ, ভয়।

গত পনেরো দিন সে যে শম্পার সঙ্গে খুব ভাল করে মিশেছে তা বলা যায় না। কথাবার্তা হয়েছে, পাশাপাশি এক বিছানায় শুয়েছে, প্রাণপণে ভাল ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে মেয়েটির প্রতি। কিন্তু তা বলে তার মনে হতাশা ও সন্দেহের ভাবটি যায় নি। কেবলই মনে হয়, পৃথিবীর সর্বত্র তার চেয়ে বহুগুণে যোগ্যতর লোকেরা ছড়িয়ে আছে। সে একটা হেরো লোক। নিজের সম্পর্কে এইসব জরুরী চিন্তা তাকে এত বেশী ব্যস্ত রেখেছিল যে তার কাম তিরোহিত হয়, আগ্রহ কমে যেতে থাকে, শম্পা দেখতে কেমন তাও সে বিচার করে দেখে নি।

কনিষ্কর মা আজ সকালে তাকে ডেকে বললেন—খোকা, বৌমা কেন লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে রে? তোর কি বৌ পছন্দ হয়নি?

কনিষ্ক মুশকিলে পড়ে বলে, তা নয়। আমি তো ভাল ব্যবহারই করি।

—শুধু ভাল ব্যবহারেই কি সব মিটে যায় বাবা? পুরোনো কথা ভুলে এবার নতুন করে সব শুরু করে দাও। যাকে ঘরে এনেছো তার দিকটা এবার দেখ। বৌ তো ক্রীতদাসী নয়, তার মনের দিকে নজর দিতে হবে।

—কি করব মা? আমার হৈচৈ ভাল লাগে না।

—হৈচৈ করতে হবে না, আজ বিকেলে বৌমাকে নিয়ে বেড়াতে যা। দ্বিরাগমন সেরে আসবার পর দু'জনে মিলে তো কোথাও গেলি না দেখলাম।

অনেক ভেবেচিন্তে প্রস্তাবটা গ্রহণ করল কনিষ্ক। আসলে মলি বা সুব্রতর কথা ভাবার কোনো মানেই হয় না। কেননা এই নতুন অবস্থায় সে আর পুরোনো সম্পর্কের মধ্যে ফিরে যেতে পারে না।

সিনেমা দেখার কথা ছিল, কিন্তু টিকিট পাওয়া যায় নি। তাই নিছক ঘুরে বেড়ানোর জন্যই দু'জনে বেরিয়েছে। কথা আছে, আজ রাতে বড় কোনো রেস্টুরেন্টে দু'জনে রাতের খাওয়া সেরে একেবারে বাড়ি ফিরবে।

কনিষ্ক ট্যাক্সি নিয়েছিল। টালিগঞ্জ ছাড়িয়ে খানিক দূর আসতেই শম্পা বলল, শোনো, ট্যাক্সিটা এবার ছেড়ে দাও।

—কেন?

—ট্যাক্সি করে আমাদের মতো লোক বেড়াতে যায় না। মধ্যবিত্তরা প্রয়োজনে ট্যাক্সি নেয়। বেড়ানোর জন্য ট্যাক্সি ভাল নয়।

—তবে কিসে যাবে? ট্রামে বাসে যা ভিড়!

—হোক। তবু ভিড় ভাল। কত মানুষ দেখা যায়।

কনিষ্ক নড়েচড়ে বলে, তুমি কি ভিড় পছন্দ কর? আমি করি না।

—ভিড় নয়, তবে মানুষ পছন্দ করি। ট্যাক্সির ভিতরে নিঝুম হয়ে বসে থাকাটা ভারী একঘেয়ে। কিছু দেখা যায় না, শোনা যায় না।

কনিষ্ক রাসবিহারীর মোড়ে ট্যাক্সি ছেড়ে দিল।

হাঁটতে হাঁটতে শম্পা বলল, তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে শাশুড়ী মা আমাকে বারণ করেছেন। কিন্তু আমার একটা কথা খুব জানতে ইচ্ছে করে।

—কি?

—তুমি এত অহংকারী কেন?

—আমি অহংকারী?

—নয়?

কনিষ্ক অবাক হয়ে বলে—মোটেই নয় শম্পা। বরং আমি ঠিক উল্টোটাই সব সময়ে ভাবি। আমার মনে হয়, আমি বড় অপদার্থ পুরুষ।

—সে কি! কেন?

—আমি তো তেমন স্মার্ট নই। লম্বা চওড়া নই। আমার ভিতরে হাজার রকমের ডেফিসিয়েন্সি।

শম্পা খুব খিলখিলিয়ে হাসে। বলে—তাই নাকি! তাহলে তো তোমাকে বিয়ে করাটা মস্ত ভুল হল!

—হলই তো।

—শোন। ভাবতে গেলে, আমারও হাজারটা ডেফিসিয়েন্সি। নিজের দোষ কোলে করে বসে থাকলে তো জীবনটাই তেতো হয়ে গেল।

শীতকালের বেলা! ক্রিস্‌মাসের ছুটি চলছে। হাজারটা লোক বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়। অপরাহ্নের কোমল কবোষ্ণ রোদে আর ছায়ায় অপরূপ হয়ে আছে পথঘাট।

এই আলোয় আজ কনিষ্ক শম্পার মুখশ্রী খুব অকপট চোখে দেখল। তুলনা করে নম্বর দিলে মলি আর শম্পা প্রায় সমান সমান নম্বর পাবে। শম্পার তুলনায় মলি কিছু লম্বা ছিল, কিন্তু সেই রকম আবার মলির চেয়ে শম্পা ফর্সা। মলির শরীরে কিছু বাড়তি মেদ ছিল বলে পেটে ভাঁজ পড়ত। শম্পার সে সব নেই। মলির মুখখানা ছিল গোল ধরনের। শম্পার মুখ লম্বাটে, লাবণ্য শম্পারই বেশী, কারণ সে বয়সে মলির চেয়ে কম করে পাঁচ বছরের ছোটো। বি. এ পরীক্ষা দিয়েই তার বিয়ে হয়েছে।

কনিষ্কর কথাটা ভাল লাগল। নিজের দোষ কোলে করে বসে থাকাটা কাজের কথা নয়।

সে বলে, আমাকে তোমার কেমন লাগে?

—আগে বল, আমাকে তোমার কেমন?

—শোন শম্পা, তোমাকে কেমন লাগে তা আমি এখনো ভেবেই দেখি নি।

আচমকা শম্পা বলে—মলিকে তোমার কেমন লাগত?

কনিষ্ক থমকে যায়। অনেকক্ষণ বাদে বলে, তুমি জানলে কি করে?

—তোমার মা বলেছেন।

—মা?

—মা সব বলে দিয়েছেন আমাকে। আরো বলেছেন, আমি যেন এসব তোমাকে জিজ্ঞেস না করি।

শ্বাস ফেলে কনিষ্ক বলে, জিজ্ঞেস করে ভালই করেছ। মলিকে আমার

ভালই লাগত। তবু শেষদিকে—

শম্পার মুখখানা ভার হয়ে গেল। কনিষ্কর মুখচোখও লাল দেখাচ্ছে। সে বড় অস্বস্তি বোধ করে বলে, এসব কথা কি ভাল?

শম্পা বলে—ভাল নয়। কিন্তু আমাদের দু'জনের সম্পর্কের মধ্যে যদি তৃতীয় কোনো লোক নাক গলায় তবে সেই তৃতীয় লোকটাকে জেনে রাখা দরকার।

অবাক হয়ে কনিষ্ক বলে—তুমি তো ভীষণ বুদ্ধিমতী। এত গুছিয়ে কথা বল কি করে? মাথায় আসে?

শম্পার ভার মুখ হাল্কা হয়ে গেল। হেসে বলে—যাঃ।

—সত্যি বলছি, তুমি খুব ভাল কথা বলতে পার। আমি পারি না।

শম্পা বলে, বাপের বাড়িতে আমাকে সবাই কটকটি বলে ডাকত। আমি নাকি ভীষণ কটকট করে কথা বলি।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা দেশপ্রিয় পার্ক বরাবর এসে গেল। গলার স্কার্ফটি ভাল করে জড়িয়ে শম্পা বলে—একটু চা খেতে পারলে বেশ হত। আজ যা শীত!

কাছেই একটা রেস্টুরেন্ট। কিন্তু আজ ছুটির দিনে সেখানে বেশ ভিড়। বসার জায়গা নেই।

কনিষ্ক বলে—আর একটু হাঁটি চল। পোস্ট অফিস ছাড়িয়ে একটু এগোলে বোধহয় একটা দেশওয়ালী চায়ের দোকান পাওয়া যাবে।

তাই হল। গাছতলার দোকানদার দু ভাঁড় চা বড় যত্নে এগিয়ে দেয়। শম্পা আর কনিষ্ক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাঁড়ে চুমুক দেয়।

কনিষ্ক বলে—কেমন?

—বেশ গো।

কনিষ্ক খুশী হয়ে পয়সা মিটিয়ে দেয়। বলে—খিদে পেয়েছে নাকি? কিছু খাবে?

—কে খাওয়াবে? আমার তো পোড়া কপাল, কেউ পছন্দ করে না। কনিষ্ক হেসে বলে—কটকটি, এবার কিন্তু কথা ফেইল করলে।

—কেন?

—যে চা খাওয়াল সেই খাবার খাওয়াতে পারে। আর কে খাওয়াবে?

—মলির সঙ্গে তোমার ঝগড়া হল কেন? হঠাৎ শম্পা প্রশ্ন করে।

—ঝগড়া! না, ঝগড়া হয় নি তো ও একটা ছেলের খুব প্রশংসা করত। সেটা আমার সহ্য হত না।

—ওমা! তাই নাকি? এসব তো মা আমাকে বলে নি!

—মা জানবে কি করে? কনিষ্ক বলে—মা শুধু জানত, মলির সঙ্গে আমার ভাব।

—এখন তুমি মলির কথা খুব ভাব, না? ভাব, আমার মতো একটা বিচ্ছিরি মেয়ের সঙ্গে কেমন হট করে বিয়ে হয়ে গেল। সারাটা জীবন কেমন ব্যর্থতায় কাটবে।

কনিষ্ক খুব হতাশার ভাব করে বলে, কতগুলো ভাবনা আছে যা তাড়ানো যায় না। বিরহ ভোলা যায়, কিন্তু অপমান কি সহজে ভোলে মানুষ? কিংবা ঈর্ষা? হীনমন্যতা?

শম্পা মুখখানা করুণ করে বলে, আমাকে একটা কথা বলতে দেবে? ধর আজ তোমার কাছে আমার খুব একটা দাম নেই। তুমি ভালবাসতে পারছ না আমাকে। অথচ আমি তোমার কাছে কত সহজলভ্য। কিন্তু দেখ, সুজন নামে একটা ছেলে আছে। তার কাছে শম্পাই হল আকাশ-পাতাল জোড়া চিন্তা। শম্পার জন্য কি জানি সে হয়তো আত্মহত্যার কথা ভাবে। পৃথিবীতে শম্পা ছাড়া বেঁচে থাকা কত কষ্টের সে জানে একমাত্র সুজন। তুমি তা কখনো জানবে না, বুঝবে না। পৃথিবীটা ঠিক এরকম নিষ্ঠুর।

চোয়াল কঠিন করে কনিষ্ক বলে, সুজন কে?

—সে একটা ছেলে। আমাকে ভালবাসত। কোনোদিন তাকে পাত্তা দিই নি। কিন্তু আজ অনাদরের মাঝখানে থেকে তার কথা খুব মনে হয়।

কনিষ্ক স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে থাকে।

সেই রাত শম্পা আর কনিষ্কর ভালবাসার মাঝখানে অনেকবার মলি এসে হানা দিল, এল সুজনও। দু'জনে এসে এক অদৃশ্য প্রজাপতির দুটি ডানার মতো কাঁপতে লাগল। তাতে বড় সুন্দর হল কনিষ্ক ও শম্পার ভালবাসার নিরালা ঘরটি।

প্যাণ্টের বোতাম

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিম পড়ি-কি-মরি করে দৌড়ে সাড়ে ন'টার বাসটা ধরে ফেলল। সামনের দরজা দিয়ে সে পারতপক্ষে উঠতে চায় না, পড়লেই অবধারিত মৃত্যু। পেছনের দরজায় তবু হাড়গোড় ভেঙেও বেঁচে থাকার সম্ভাবনা থেকে যায়। ঝুঁকি নিয়ে সামনের দরজাতেই উঠল। ফুটবোর্ডে মিনিট খানেক লাট খেল। তারপর বলম্ বলম্ বাহুবলম্ করে সামনের লেডিজ সিটের কাছে একটু দাঁড়াবার জায়গা করে নিল। দুহাত দিয়ে মাথার ওপরের রড শক্ত করে ধরেছে। পা দুটো যথাসম্ভব ফাঁক! তা না হলে ব্যালেন্স রাখতে পারবে না। বাস চলেছে উর্ধ্বশ্বাসে! যখন থামছে পেছন থেকে সামনে একটা ঢেউ খেলে যাচ্ছে। যখন ছাড়ছে তখন সামনে থেকে পেছনে। ঢেউয়ের দোলায় বঙ্কিম কখন বামে, কখন ডানে অল্প একটু হেলে যাচ্ছে। ভেতরে তিনটে লাইন হয়েছে। পেছন থেকে যখন চাপ আসছে বঙ্কিমের ভুঁড়িটা সামনে এগিয়ে যাচ্ছে।

বঙ্কিম সাধারণত চোখ বুজিয়ে কোনো একটা ভাবনা বা একাধিক ভাবনা লোফালুফি করতে করতে, আধঘণ্টার পথ পার করে দেয়। আজও চোখ বুজিয়ে ছিল। ভাবছিল সকালেই মিটিং আছে। অফিসে পৌঁছে মিনিট দশেক মাত্র সময় পাবে। তার মধ্যে ফাইল-টাইল ঠিকঠাক করে নিতে হবে। অ্যাজেণ্ডা পয়েন্টস, মান্থলি রিপোর্ট। আজকে ঠেলাঠেলিটা বড় বেশি। ওঃ ধনুক করে ছেড়ে দিলে। কানের কাছে কে যেন ফিসফিস করে বললে—'দাদা'। বঙ্কিম গ্রাহ্য করল না। আবার—'দাদা'। চোখ খুলে বাঁ পাশে তাকাল। একটি অমায়িক মুখ। ভদ্রলোক ফিসফিস করে বললেন—'পোস্ট অফিস থেকে আণ্ডারওয়্যারের দড়ি ডেলিভারি হয়ে সামনে পেণ্ডুলামের মত ঝুলছে! বারকতক ভদ্রমহিলার নাকে টুসকি মেরেছে। গলার টাইটার সঙ্গে ব্যালেন্স করেই কি নিচের এই ব্যবস্থা!' বঙ্কিম সঙ্গে সঙ্গে নিচের দিকে তাকাল, সর্বনাশ, আধহাতের মত পুরুষ্টু একটি শাড়ির পাড় ডগায় আবার একটা গেরো, প্যান্টের ফাঁক দিয়ে সামনে ড্যাং ড্যাং করে দুলছে বঙ্কিমের বিলম্বিত সেই ফ্রন্ট লাঙুলের সামনেই একটি সুন্দর মুখ ভুরুটুরু কুঁচকে বসে আছেন। দড়ি একবার করে তাঁর দিকে যাচ্ছে আর ছুঁই ছুঁই করে কখন ছুঁয়ে অথবা ছোঁয়ার ভয় দেখিয়ে বঙ্কিমের দু'

পায়ের ফাঁকে মুখ লুকিয়ে ফেলছে।

ভদ্রলোক বললেন, 'ওটাকে অ্যারেস্ট করে সেফ কাস্টডিতে চালান করুন, তা না হলে অভূতপূর্ব অশান্তির সম্ভাবনা।'

যে জায়গায় ঝোঝুল্যমান দড়িটাকে অদৃশ্য করাতে হবে, সে জায়গাটা শরীরের একটা ভাইটাল এরিয়া হলেও সর্বসমক্ষে সেটি রেডলাইট এলাকা। হঠাৎ আঙুল ঠেকানো যায় না। বিশেষত ভদ্রমহিলাদের সামনে। একটু ঘুরে বা আড়াল করে যে ঢোকাবে, তারও উপায় নেই। ঘুরবে কি করে! কুলফি মালাইয়ের মত সবাই খাপে সেট। ঠিক হ্যায়! বঙ্কিম নিজেই চোখ বুজলো। যে দেখে দেখুক, সে নিজে দেখতে রাজি নয়। সামনের দিকে মাঝের একটা বোতাম মিসিং। দড়িটা অবোধ শিশুর মত সেই ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এসে সামনেই সুন্দরী মহিলা দেখে প্রভুভক্ত কুকুরের মত গদগদ আনন্দে ল্যাজ নাড়তে শুরু করেছে।'

বাড়িতে প্যান্টটা যখন পরেছিল তখনও বোতামটা ছিল। বাসে ওঠার কসরতেই বোধহয় কেন্দ্রচ্যুত হয়েছে। বঙ্কিমের সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল স্ত্রী প্রতিমার উপর। মানুষের একটা সামান্য কমনসেন্স থাকা উচিত। মেয়ে-মানুষ কি মানুষ নয়! কেউ আণ্ডারওয়্যারে অতবড় একটা চিত্র-বিচিত্র পাড় লাগায়। কয়েকদিন আগেও একটা মাপেরসই গেঞ্জির দড়ি লাগান ছিল। রোজই সকালে কাচা আণ্ডারওয়্যার পরতে গিয়ে দেখা যেত দড়ির যে কোন একটা মাথা ফোল্ডের মধ্যে ঢুকে পলাতক প্রাণীর মত বসে আছে। তাড়াতাড়ির সময় মহাবিরক্তি। রাঁধতে রাঁধতে প্রতিমাকে আসতে হত মাথার কাঁটা কিংবা বোনার কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে বের করে আনার জন্যে। উভয় পক্ষেরই অসুবিধে। বেরোবার সময় কেউই প্রকৃতিস্থ থাকে না। অফিসের দিনের সকাল সাত সতেরো ঝামেলায় ভরা। তখন এইসব ছ্যাচড়ামি একেবারেই ভাল লাগে না সত্যি। কিন্তু তা বলে কেউ এতবড় একটা দড়ি লাগায়। এ যেন রথের রশি।

বাস এগোচ্ছে, প্রতিমার সঙ্গে বঙ্কিমের মনে মনে ঝগড়াও তত জমে উঠেছে। একবাস লোকের সামনে তুমি আমায় প্রায় বিবস্ত্র করে ছেড়েছো। বিবস্ত্র নয়তো কি! এমন সুন্দর একটা প্যান্টের তলাতেও যে একটা অন্তর্বাস থাকে, সেই অপ্রিয় সত্য, হাটের মাঝে হাঁড়ি ভাঙার মত প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। দীর্ঘ ব্যবহারে সেই পরিধেয় লাল এবং সেটি কোমরের সঙ্গে বাঁধা শাড়ির পাড় দিয়ে। এ যেন দীনবন্ধুর মাথা কামানো অবস্থা। দীনবন্ধু ছিল তাদের পাড়ার অ্যাপোলো। সেই দীনবন্ধু প্রেম-পত্র লিখেছিল তার মার বয়সী এক কুমারী মেয়েকে। পঞ্চায়েতী সাজা

হয়েছিল, মাথা মুড়িয়ে গলায় জুতোর মালা পরিয়ে রাস্তায় প্যারেড। তুমি আমায় দীনবন্ধু করে ছেড়েছো।

যে মহিলার নাকের ডগায় বঙ্কিমের দড়ি পেয়ার করতে গিয়েছিল তিনি হঠাৎ উঠে পড়লেন। স্টপেজ এসে গেছে তাঁর। বঙ্কিমকে এমন-ভাবে 'সরুন' বললেন, বঙ্কিম যেন ছোঁয়াচে কোনো অসুখে ভুগছে। বঙ্কিম জানে ভদ্রমহিলার গিয়ে প্রথম কাজই হবে নাকের ডগা ধোয়া। মেকআপ চটকে যাবে। বঙ্কিমের উদ্দেশে তখন আর একপ্রস্থ গালাগাল ছুটবে। সামনে জায়গাটা খালি হল। বোতাম নেই বসলেই লালচে আণ্ডারওয়্যার উঁকি দেবে স্লেট রঙের প্যাণ্টের জানালা দিয়ে। কেউ হয়তো লক্ষ্য করবে না কিন্তু বঙ্কিম এখন সচেতনতায় ভুগছে। আপনি বসবেন না!' বলে আর একজন বসে পড়লেন। বঙ্কিমবাবু দুলতে দুলতে, মনে মনে ঝগড়া করতে করতে ক্রমশই অফিসপাড়ার দিকে এগোতে লাগলেন।

অফিসে পৌঁছেই তার প্রথম সমস্যা হল উদার প্যাণ্টকে কি করে একটু অনুদার করা যায়। মোটা কুশন লাগানো ঘূর্ণায়মান চেয়ারে বসলেই অর্ন্তবাসের চোরাচাহনি শুরু হবে। স্টেনো মিস মিত্র অনবরতই পাশে এসে দাঁড়ান নানা কাজে। চোখ পড়বে। একটু পরেই ডিরেকটারের ঘরে মিটিং। গোল করে নিচু হাইটের সোফা পাতা। মধ্যে সেণ্টার টেবিল। বসা মাত্রই প্যাণ্টের ঠোঁট ফাঁক হয়ে যাবে। মহিলা পি-এরা এই স্ফুরিত অধরের জঘন্য ব্যাখ্যা করে নিতে পারেন। কাণ্ডজ্ঞানশূন্য স্ত্রী নিয়ে ঘর করলে মানুষকে এইভাবেই ভুগতে হবে। চেয়ারের পেছন থেকে তোয়ালে টেনে নিয়ে বঙ্কিম কোলের উপর রাখল। কাজ করতে হলে বসতেই হবে। বসতে হলে চাপা দিতে হবে। বঙ্কিমের যেন ছেলে হয়েছে। কোলে শুইয়ে রেখেছে সযত্নে।

মিস মিত্র এলেন, একঝলক গন্ধ আর খুশি নিয়ে। বঙ্কিম আসন্ন মিটিং-এর জন্যে প্রস্তুত হতে লাগল। মিত্রর হঠাৎ চোখ পড়ল কোলের তোয়ালের ওপর।

'দিন স্যার তুলে রাখি।,

বঙ্কিম একটু বিব্রত হল। এতটা সজাগ দৃষ্টি ভদ্রমহিলা যদি না দিতেন, প্রোমোশন, ইনক্রিমেণ্ট আটকাতো কি? বঙ্কিম বললে, 'না থাক, হাত দুটো বড় ঘামচে, আমার একটু লিভার হয়েছে।'

মিস মিত্র ধনুক ভুরু করে বললেন, 'খুব ভাল ওষুধ আছে আমার মার কাছে, একেবারে অব্যর্থ, কাল এনে দেবো।'

বঙ্কিম বললে, 'থ্যাঙ্ক ইউ।' মিত্র সুইং দরজা দুলিয়ে চলে গেলেন।

একটা আলপিন লাগালে কেমন হয়? বঙ্কিম তেমন উৎসাহ পেল না, জায়গাটা বিশেষ সুবিধের নয়। কোনো ঝুকি নিলেই হসপিটাল। পরিবেশনের সময় যেমন করে কোমরে তোয়ালে জড়ায়, সেইভাবে জড়িয়ে ডিরেকটারের ঘরে যাওয়া যায় না! তোয়ালেটা যথাস্থানে ঝুলিয়ে রেখে বঙ্কিম বাথরুমে গেল। দরজাটা লক করে প্যান্টের কোমরের বোতাম খুলে ফেলল। হ্যাঁ দড়ি বটে। দেখবার মত। লাউডগার মত লটপট করে ঝুলছে। দড়ির প্রান্ত দুটো ভাল করে গুঁজে নিল কোমরে। দেখি এবার তুমি কোন ফাঁকে বেরোও। বড় অপদস্থ করেছো আজ। সাহেবী অহঙ্কারের বেলুন পাংচার করে দিয়েছো। টাই ঠিক করে, চুলে চিরুনি বুলিয়ে বঙ্কিম নিষ্ক্রান্ত হল। রেডি ফর দি মিটিং।

কোলের উপর একটা ফাইল রেখে মিটিংরুমে বঙ্কিম কাউকেই বুঝতে দিল না যে তার ভাইটাল জায়গায় একটা বোতাম নেই। সারাটা দিন অশান্তি নিয়ে কাটল। বাড়ি ফিরে যতক্ষণ না বৌকে ধাতাতে পারছে ততক্ষণ মনের কোষ্ঠ-কাঠিন্য কাটবে না। একসময় মনে হল প্রতিমার কি দোষ? বোতাম তো বাসে খুলে পড়ে গেছে! তাহলেও প্রতিমার তো উচিত ছিল একটু চেক করা। প্লেন আকাশে ওড়ার আগে গ্রাউণ্ড ইঞ্জিনিয়ারদের কি ডিউটি? খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব দেখা। প্রতিমার গাফিলতিতেই তার এই বেলি ল্যাণ্ডিং।

বাড়ি ফিরে বঙ্কিমকে আর কলিং বেল বাজাতে হল না। সামনেই হাসি হাসি মুখে প্রতিমা দাঁড়িয়ে। বঙ্কিম বলতে যাচ্ছিল শাট আপ রাসকেল। তারপর মনে হল রাসকেল শব্দটার যথার্থ অর্থটা কি! এতকাল বলে আসছে, মানেটা জানা নেই। অক্সফোর্ড কিংবা চেম্বার্স খুলে আগে মানেটা দেখা দরকার। খামোখা দেড়টা টাকা খরচ হয়েছে আসার সময় একটা বৃহৎ সাইজের সচিত্র ইংরেজী সাপ্তাহিক কিনে, সারাটা রাস্তা কোলে রাখতে হয়েছে। তাপ্পি মেরে ছাদের ফুটো বন্ধ করার কায়দায়। পাশের ভদ্রলোক একবার দেখতে চেয়েছিলেন, বঙ্কিম বলেছিল, এটা দেখার নয়, কোলে পেতে রাখার, আই অ্যাম সরি। ভদ্রলোক বলেছিলেন, ঠিক আছে পয়সা থাকে কিনে পড়ব, আপনার মত শিক্ষিত ছোটলোকের কাছে কখনো চাইব না। বঙ্কিম বলেছিল, হুঁ। ভদ্রলোক কিন্তু থামলেন না—আমিও বইপত্তর কিনি মশাই, গত মাসে ষাট টাকা দিয়ে গীতার

বে।

। কিনেছি, বিশ্বাস না হয় আমার বাড়িতে গিয়ে দেখে আসুন।

প্যাে

সছে ভদ্রলোকের আক্রমণও চলেছে অপ্রতিহত—এই সব চিপ

বড় ক

ম্যাগাজিন আমি পড়ি না মশাই, একমাত্র বাসে আর ট্রামে এর-তার কাছে চেয়ে একটু পাতা ওল্টাই। বঙ্কিম বলেছিল—হুঁ। ভদ্রলোক ফোঁ করে নস্যি টেনে বলেছিলেন, অত অহঙ্কার ভাল না। ঠিক আছে আপনিই তা হলে পড়ুন। ম্যাগাজিন কেউ মুর্খের মত কোলের শিশু করে রাখে না। এত করেও বঙ্কিম যখন পাতা ওল্টালো না, ভদ্রলোক হাল ছেড়ে বললেন, অক্ষর জ্ঞান হয়েছে তো শহরে ড্রেস দেখে মানুষ চেনা দায়।

রাসকেল শব্দটা উদগত ঢেঁকুরের মত চেপে রেখে বঙ্কিম স্ত্রীকে বলল—'তুমি কী? তোমার কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই! খাচ্ছোদাচ্ছো আরভুঁড়ি ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছো। তোমার কি কোন কর্তব্যবোধ কিছুই নেই। এটা বাড়ি না জিমখানা।' হোসপাইপে জল দেবার মত করে বঙ্কিম বিষোদগার করে প্রতিমাকে পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকে গেল। আকস্মিক আক্রমণে প্রতিমা অবাক। সে পেছনে পেছনে ঘরে ঢুকে জিগ্যেস করল, হল কি তোমার?' বঙ্কিম ঘুরে দাঁড়িয়ে এতক্ষণের ঢেকে রাখা জিনিসটা উন্মুক্ত করল—'এটা কি! এটা' সমস্ত শরীরটাকে পেছনদিকে আর্চ করে, সামনের দিকটা প্রতিমার দিকে ঠেলে দিয়ে, প্যান্টের ফ্ল্যাপটা দেখালো। 'জানো এক বাস লোকের মাঝে এই গর্ত দিয়ে কি বেরিয়েছে?' প্রতিমার হাসি একটুতেই হেসে ফেলে, কুঁক কুঁক শব্দ করে বলল, 'কি বেরিয়েছে? সাপ!' বঙ্কিম দক্ষযজ্ঞের মহাদেবের মত ঘরের কার্পেটে ধিতিং ধিতিং করে নেচে প্যান্টটা কোমরচ্যুত করে, আণ্ডারওয়্যারের পাড়ের একটা মাথা টেনে বের করে বলল, 'এইটা, এইটা, কোন একটা সেন্স অফ ডিসেন্সি নেই। নিজেও যেমন বেহুঁশ অন্যকেও নিজের অগোছালো ধারায় আনতে চাও। নিজের ব্রেসিয়ারের স্ট্রাপ তো জীবনে ব্লাউজের আড়ালে গেল না। বেল্লিক কাঁহাকা।' বঙ্কিম যেন একটু হালকা হল। বেশ বলেছে! প্রথম কিস্তি ভালই নামিয়েছে। প্রতিমা এতক্ষণ ব্যাপারটাকে লঘু করে নিয়ে ছিল, বেল্লিক টেল্লিক বলায় তারও রক্তের চাপ এইবার বেড়ে গেল—'মুখ সামলে। বাড়িতে ঢুকেই ঝগড়া কোরো না বলে দিচ্ছি। কার সঙ্গে কী করতে গিয়ে বোতাম ছিঁড়ে এসে এখন বেঁড়ে শালাকে ধর। আমি কি হাত গুনবো। না বললে জানবো কি করে যে বাবুর বোতাম ছিঁড়েছে।'

'জানতে হবে না।' বঙ্কিম আণ্ডারওয়্যার খুলতে খুলতে তিরিক্ষি মেজাজে বলল, 'তুমি তোমার ফষ্টিনষ্টি নিয়ে থাকো, আমার ব্যাপারে নাক গলাতে হবে না। চা খাবো না যাও!' প্রতিমা বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলল 'খেতে হবে না। আমার ভারী বয়ে গেল।' এদিকে দড়িতে মোক্ষম্‌ ার ম পড়ে গেছে, কিছুতেই খুলতে পারছে না। প্রকৃতির ডাকও আর

রাখা যাচ্ছে না! আলমারির মাথার উপর থেকে একটা খোলা ছুরি নিয়ে বঙ্কিম বললে—'কেটেই ফেলবো, যস্মিন দেশে যদাচার।' প্রতিমা হৈ হৈ করে উঠল, 'চালাকি পেয়েছো। পাড় অত সস্তা না। কাল সকালবেলা যখন হুকুম হবে পাড় পরিয়ে দাও, তখন আমি পাব কোথায়! আর আমার স্টকে নেই।' বঙ্কিম ছুরিটা ভুড়িতে ঢুকিয়ে কাটতে যাচ্ছে, প্রতিমা এসে হাত চেপে ধরল। ভুঁড়ি ফেঁসে যাবার ভয়ে বঙ্কিম ছুরিটা ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। 'না কাটলে খুলবো কি করে? এটা কি আমি ততদিন পরে বসে থাকবো যতদিন না গলে গলে বেরিয়ে যাচ্ছে। চালাকি পেয়েছো? প্রতিমা নির্বিকার মুখে বলল—'আমি কি জানি! গিঁট পড়ে কেন?' বঙ্কিম বললে, ঠিক আছে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে খুলবো।' মহা বেকায়দায় পড়েছে বঙ্কিম, নিম্নচাপ, আর ধরে রাখা যায় না। দেশলাই দিয়ে পোড়াবে কি! আগুন লেগে যাবার ভয় আছে। বাধ্য হয়েই বঙ্কিম সুর পাল্টালো—'খুলে দাও তাহলে! প্রতিমার ব্যাঙ্গের হাসি—'পথে এস বাছাধন।' অ্যামিবিক লোকের স্ত্রীর সঙ্গে সদ্ভাব রেখেই চলা উচিত। গেরোটি খুলে দিতেই বঙ্কিম চেন ছাড়া কুকুরের মত অন্তর্বাস মুক্ত হয়ে, সোজা বাথরুমে গিয়ে ঢুকলো।

রাত দশটা নাগাদ বঙ্কিম আবিষ্কার করল, তার নির্লজ্জ স্ত্রী প্যান্টের বোতাম বসাবার কোনো চেষ্টাই করে নি। ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে মৌজ করে উপন্যাস পড়ছে। বঙ্কিম বললে, 'উচিত ছিল।' প্রতিমা বইয়ের মধ্যে থেকেই বলল—'হুঁ'। বঙ্কিম আর এক পর্দা গলা চড়াল—'উচিত ছিল।' আবার প্রতিমার—হুঁ। এইবার বঙ্কিমের ফেটে পড়ার সময়—'উচিত ছিল ওই রাবিশ বই না পড়ে, বোতামটা বসানো, কাল সকালেই তো পরে বেরোতে হবে। প্রতিমার সেই এক উত্তর—হুঁ। বঙ্কিম ঝড়ের বেগে বইটা কেড়ে নিয়ে রকেট করে ঘরের সিলিংয়ের দিকে উড়িয়ে দিল। পাখাভাঙা জটায়ুর মত বইটা পাতাটাতা মুড়ে ঘরের এককোণে পড়ল। বঙ্কিমের চেপে রাখা রাসকেলটা এতক্ষণে বেরোলো—'রাসকেল রাসকেলিয়ান বাগার। যার শিল যার নোড়া তারই ভাঙো দাঁতের গোড়া। তাই না?' প্রতিমা মেঝে থেকে বইটা কুড়োতে কুড়োতে বললে—'তুমি ডবল রাসকেল'? বঙ্কিমের খুব ইচ্ছে করছিল নিটোল নিতম্বে একটি পদাঘাত করে। মনের ইচ্ছে মনে চেপে বঙ্কিম বৌয়ের ঘাড় ধরে বলল—আগে বোতাম বসাবে পরে অন্য কাজ।' প্রতিমা বললে, 'তোমার মত ছোটলোকের প্যান্টে আমার হাত ঠেকাতে ঘেন্না করে।' বঙ্কিম বৌকে ছেড়ে দিল। এত বড় কথা যে বলতে পারে তার সঙ্গে কিসের সম্পর্ক! বালির চরে ঘর

বেঁধেছে। সংসারে কে কার! এসেছি একলা, যাবোও একলা ম্যান। প্রতিমা বিছানায় মুখ গুজে শুয়ে পড়ল। বঙ্কিম বসল প্যান্টে বোতাম বসাতে।

চোখের কি আর সেই জ্যোতি আছে। ছুঁচের ফুটো তাক করে সুতো চালায়, একটুর জন্যে পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। প্রথম ছুঁচের দিকে সুতো, পরে সুতোর দিকে ছুঁচ, কোনো ভাবেই কায়দা করতে পারলো না। একে রেগে আছে। রাতের খাওয়া ডকে উঠেছে। প্রতিমার অভিমান সে জানে নিম্নচাপের বৃষ্টির মত মিনিমাম তিন দিন। তার উপর ছুঁচের এই ছলনা। একটা চাপা গর্জন শোনা গেল—'শালা, তেরি আঁড়দেনি, পাঁড়-দেনি। ছুঁচ আর মেয়েমানুষ একজাত। ছলনাময়ী।' বঙ্কিম ছুঁচটাকে মেঝেতে রেখে, দু' হাত জোড় করে বলল—'পায়ে ধরছি মাইরি, আর বেইজ্জত কর না।'

ছুচের বোধ হয় দয়া হল। হঠাৎ সুতোটা ঢুকে গেল ছুঁচের গর্তে। বোতামও একটা জোগাড় হয়েছে। রঙে প্রায় রঙ মেলে। আগের বোতামটা যাবার সময় একটু ফেঁসো সুতোর স্মৃতি রেখে গেছে। বঙ্কিম বোতামটাকে দাগে দাগ মিলিয়ে বসালো। এইবার তলা থেকে ছুঁচ গলিয়ে প্যান্টের ওপিঠ থেকে এপিঠে আসতে হবে, বোতামের চারটে গর্তের যে কোনো একটা ভেদ করে। তলা থেকে ছুঁচের মাথা গলিয়ে গলিয়ে সুতোর পথ করে দেবার প্রয়াস। কেবলই ঠেকে যাচ্ছে। ছিদ্র ছলনাময়ী। প্যাট, প্যাট। কার্ডিয়োগ্রাফের ছুচের মত বোতামের উল্টো পিঠে ছুচের লাফালাফি। করতে করতে ফ্যাঁস করে ছুচটা বেরিয়ে এল। শালা, কালঘাম ছুটে গেল। সুতোটা টেনে ওপরের দিকে তুলতে লাগল বঙ্কিম এরপর কোণা-কুণি একটা ফুটোয় ঢুকতে হবে ওপর থেকে নীচে, তারপর আবার নীচে থেকে হাতড়ে হাতড়ে ওপরে। এইভাবে চারটে ফুটো। যাঃ শালা, সমস্ত সুতোটাই বেরিয়ে চলে এল, বোতামটা কোল বেয়ে প্যান্ট বেয়ে গড়িয়ে খাটের তলায় চলে গেল। ওঃ হরি। সুতোয় যে গিঁট দিতে হয়, তা না হলে আটকাবে কিসে! ধ্যুর বাপু।

বোতাম খুজতে বঙ্কিম হামাগুড়ি দিয়ে খাটের তলায় ঢুকলো। লো হাইটের খাট। একে অন্ধকার অন্ধকার জায়গা, তাব ওপর কালো বোতাম। অত সহজে পাওয়া যাবে! বঙ্কিম দেখেছে, পয়সা, বোতাম, আংটির পাথর, কানের দুল পড়ে গেলেই ফোর্থ ডাইমেনসানে চলে যায়। অন্তত মিনিট পাঁচেক ইঞ্চি ইঞ্চি করে ৪২ বর্গফুট জায়গা অনুসন্ধানের পর বোতামটা তার হাতে এল। বেরিয়ে আসার সময় হিসাবের ভুলের

ফলে খাটে মাথা ঠুকে গেল।

ছুঁচটা আবার কোথায় গেল? বঙ্কিমের ল্যাজে-গোবরে অবস্থা। বোতাম পেল তো ছুঁচ হারালো। ছুঁচের ধর্মই হল হারিয়ে যাওয়া। বুঝেছি, তুমি শালা পাছায় না ফুটে উঠবে না। থ্যাপ থ্যাপ করে বার কতক এখানে-ওখানে বসল। ছুঁচ শেষে বেরোলো প্যাণ্টের ফোল্ড থেকে! সুতোর ল্যাজে বেশ জুতসই করে একটা গিঁট দিল! আবার শুরু হল, তলা থেকে ছুঁচের বোতামের ফুটো খোঁজার পালা সমস্তটাই চান্সের খেলা, আর বঙ্কিম ভাবতেও পারে নি যে এবার এক চান্সেই লক্ষ্যভেদহবে। বঙ্কিম সাবধান হবার সময়ই পেল না। ফ্যাঁস করে ছুঁচ বিঁধে গেল আঙুলের মাথায়। প্যাণ্ট, ছুঁচ, সুতো, বোতাম, একটান মেরে তালগোল পাকিয়ে পাঠিয়ে দিল খাটের তলায়।

রক্তের বিন্দু আঙুলের মাথায়। রক্তটা মুখ দিয়ে শুষে নিল। নোনতা। আবার এক বিন্দু। বুঝেছি ভগবান, বোয়ের কারসাজিতে অভুক্ত তাই রক্তের ডিনার! সব কাজ সকলকে দিয়ে হয় না। তু'পাতা নোট লিখতে পার, ডবল এন্ট্রি বুককিপিং পার, তাবলে কি সেলাইফোঁড়াও পারবে। ওটা মেয়েদের ব্যাপার। মেয়েরা পারবে! মনে নেই শৈশবে একবার ইঁটের গর্তে আঙুল ঢুকিয়ে বিছের কামড় খেয়েছিলে। যাও শুয়ে পড়, কাল সকালে দেখা যাবে।

বঙ্কিম শুয়ে শুয়ে আঙুল চুষতে চুষতে ঘুমিয়ে পড়ল। খাটের তলায় মুখ গুজড়ে পড়ে রইল বঙ্কিমের সাধের গরম প্যাণ্ট, একটি আলগা বোতাম, সুতো পরানো একটা পাতি ছুঁচ। মাঝরাতে হালকা পায়ে কোনো সহৃদয় পরী এসে বঙ্কিমের বোতামটা বসিয়ে দিয়ে যায় কিনা দেখা যাক! রাত উপোসী বঙ্কিমের মুখে ছুঁচ ফোঁটা আঙুলের ললিপও। অনেক রাতে প্রতিমার একবার ঘুম ভেঙেছিল। ঘরের চাপা আলোয় আঙুল চোষা ঘুমন্ত বঙ্কিমকে দেখে, মনে মনে বলল—আহা রে, কোলের খোকা আমার, প্যাণ্টের আর দরকার কি! এবার ঘুনসি বেঁধে কপনি পরলেই হয়। হাড় বজ্জাত। বিয়ের পর থেকে জ্বালাচ্ছে। সারাটা জীবন জ্বালাবে। 'হাড় জ্বালানে' বলে প্রতিমা পাশ ফিরে ঘুমের টানেল দিয়ে নাকের ইঞ্জিন চালিয়ে দিল ভোরের স্টেশনের দিকে।

দেশলাইয়ের বাক্স এবং নির্বারুদ কাঠি

সমরেশ মজুমদার

সিগারেটের তামাক সরু তার দিয়ে পটু হাতে বের করে চেটোয় রাখল নীতা, তারপর কাগজের পুরিয়া খুলে বস্তুটিমেশালো সেই তামাকে। পুনরায় ফাঁকা সিগারেটটা নব্য মশলা দিয়ে টাইট হয়ে যেতেই একটা অপার্থিব আনন্দ ফুটল নীতার মুখে। অদ্ভুত উচ্চারণে ইংরেজি বলল সে, 'কে প্রথম ভালবাসবে?'

তিনটি হাত উঠল। জিনা বলল, 'হা-ই, আমি ভালবাসার জন্যে মরে যাচ্ছি!

সীতা মাথা নাড়ল, 'ও মাই সুইটি, লিটল স্টিক।"

নীতা চোখ পাকাল, 'সিলি! একজন হাত তোলে নি। অতএব সে-ই শুরু করবে।' সিগারেটটা এগিয়ে দিল সে রিয়ার দিকে।

নীতাদের এই ঘর ভরতি বই। এত বই, বিভিন্ন বিষয়ের বই যে রিয়ার মনে হয় এখানে তাকে সারাজীবন বন্দী করে রাখলে ক্ষতি হতো না। এই ঘরে কোনো চেয়ার নেই। দামী কার্পেটের ওপর আধশোয়া হয়ে ও ও ফিউচার শক পড়ছিল। মুখ না তুলে হাত নাড়ল, 'নো, আই কান্ট স্ট্যাণ্ড।'

'ইটস মাইন্ড। ফ্রেস ফ্রম মণিপুর।' নীতা উঠে দাঁড়ল সিগারেটটা নিয়ে, 'কি বই ওটা? ফিউচার শক্? ছাটস রাবিশ। টেক দিস শক্ অ্যাণ্ড ইউ উইল ফিল সামথিং!'

রিয়া বান্ধবীদের দিকে তাকাল। ওই সিগারেটের ভেতর আজ নীতা কি পুরেছে তা সে জানে না। হয়তো কোনো ড্রাগ, পাউডার বা স্রেফ গাঁজা। কড়া ধাতের গাঁজা। আর তার টান নেবার জন্যে প্রত্যেকে উদগ্রীব। এই সব মেয়েরা, রিয়ার বন্ধুরা ছেলেদের পাত্তা দেয় না। প্রেম-ট্রেম এদের ধাতে সয় না। ওদের জিজ্ঞাসা করলেই বলবে, যে কোনো একটা লোককে তুলে নাও এবং তার নাম দাও, যে কোনও নাম দাও, দেখবে সেই লোকটাকে ওই নামে চমৎকার মানাবে। ছাত্রী হিসেবে এরা প্রত্যেকেই ভালো ছিল, পড়াশুনা কারোরই খারাপ নয়, 'উই লিভ অন ড্রাই।'

এই কথাটা এখন খুব চালু নিজেদের মধ্যে। ডোণ্ট গো ফর ওয়াটার, উই লিভ অন ড্রাই। নীতাদের এই ঘর, এই আড্ডা রিয়ার খারাপ লাগে না। শুকনো মাদক তাকে তেমন টানে না। মাঝে মধ্যে সঙ্গ রাখার জন্যে সে দু-একটা টান দেয় মাত্র। সেই মুহূর্তে মাথার ভেতরে অদ্ভুত একটা অনুভূতি হয়। শরীরে ঝিম লাগে। অলস অবসন্ন সময় ফুড়ুত করে ফুরিয়ে যায়।

কিন্তু বেশির ভাগ দিনই সে বই নিয়ে আধশোয়া হয়। নীতার এই ঘরে বাড়ির কেউ ঢোকে না, ঢুকবে না। বাড়ির কেউ বলতে নীতার মা। বাবা থাকেন জলে। সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ান জাহাজের কাজে। মা সোস্যাল ওয়ার্কার। এই ঘরে যে সব মেয়ে আছে, প্রায় প্রত্যেকের মা ডিগনিফাইড সোস্যাল ওয়ার্কার। এক একটি চীজ সব। রিয়ার নিজস্ব মা পর্যন্ত। কোয়ালিটিতে দুপুরের বিয়ার পার্টিতে না গেলে সামাজিক কর্তব্য করা হয় না।

নীতার প্রসারিত হাতের দিকে তাকিয়ে রিয়ার হঠাৎ মনে পড়ল ওর কোনো আত্মীয় নেই। বাবা মা এবং সে। সত্যি কথা বলতে কি ওর বান্ধবীদেরও একই দশা। কারো কারো হয়তো একটি ভাই বা বোন থাকতে পারে। কিন্তু সেই সব পিসি মাসি কাকা কাকিমাদের দিন ভোর। তাদের নিজেদের ফ্ল্যাটে ওসব মানুষ জন্মইস্তক আসেন নি। বাবা রাখেননি তাঁর পূর্ব-পরিবারের সঙ্গে কোন যোগাযোগ, মা ছেদ করেছেন তাঁর বাপের বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক।

সিগারেটটা হাতে নিয়েই হেসে ফেলল রিয়া। নীতা জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার?

এটা কি তোমাকে হাসির কিছু মনে করিয়ে দিচ্ছে?'

'নো! ছোট পরিবার সুখী পরিবার।'

'সো হোয়াট?'

আমাদের পরিবারগুলো এত ছোট যে বাড়ি গেলে কেউ কারো দেখা পাই না। আগুন জ্বালাও।'

একটা নীলচে আগুন আর তারপরই গলা দিয়ে নেমে যাওয়া ধোঁয়ার সোয়াদ চোখে আবেশ আনল। রিয়া টের পেল না সিগারেটটা ততক্ষণে হাত বদল হয়ে গেছে। উৎকট একটা গন্ধ তখন ঘরে পাক খাচ্ছে।

'ফিউচার শক' বইটা সরিয়ে রেখে দু পা ছড়িয়ে বসল রিয়া। আজ শুক্রবার। কারো বাড়িতেই খোঁজখবর করার কেউ নেই রাত দুটোর আগে। উইক-এণ্ড কাটাতে বাবা মায়ের দল কলকাতার লম্বা লম্বা ফ্ল্যাট

বাড়ির যে কোনো একটায় ডিঙ্কস নিয়ে বসে গেছে। কিংবা ভিসি আর-এ লেটেস্ট হট কিছু একটি তাদের সময় জ্বলিয়ে দিচ্ছে। এই চল্লিশ থেকে ষাটের মধ্যে থমকে থাকা বাবা এবং মায়েরা সারা সপ্তাহ খেটে আজ বড্ড ক্লান্ত। তাই নীতারা চুটিয়ে আনন্দ নিচ্ছে গলায়।

হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠতে গিয়ে টলে গেল রিয়া। তারপর নিজেকে সতর্ক করে বেরিয়ে এলো ঘর ছেড়ে। এই সময় টয়লেট ছাড়া কেউ কোথাও যায় না। মাঝরাতে নীতার গাড়ি প্রত্যেককে ড্রপ করে দেবে দেশলাই বাক্সমার্কা ফ্ল্যাটগুলোর গেটে। ওই বুড়ো ড্রাইভারকে সব্বাই জনি বলে আদর করে। রিয়ার তো ওই কালো বৃদ্ধটিকে দেখলেই আঙ্কল টমের কথা মনে পড়ে। হি ইজ সো নাইস! নেশাগ্রস্ত কয়েকটা মেয়েকে কি মমতায় ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়ে যায়। নীতার বাবা মা বোধহয় সে খবর রাখে না।

পাঁচতলা ফ্ল্যাট বাড়িটা ছেড়ে রিয়া বেরিয়ে এলো। ওর পরনে জিনিস আর সাদা শার্ট। পায়ে হাওয়াই চটি। বাইরের ঠাণ্ডা বাতাসটার স্পর্শ পাওয়ামাত্র মাথা ধরে গেল আচমকা! কেমন বমি বমি পাচ্ছে। এখন রাত অনেক। কত? হু কেয়ারস? নীতাদের বাড়ি থেকে ওদের ফ্ল্যাটটা বেশি দূরে নয়। এই সব বড়লোকি পাড়ার রাস্তায় চমৎকার আলো জ্বলে। বাস ট্রাম চলে না। মাথা ধরা সত্ত্বেও হাঁটতে বেশ ভালো লাগছিল ওর। ওদের বাড়িতে নিষিদ্ধ একটি গান হঠাৎ চিৎকার করে গাইতে ইচ্ছে করল, দোলাও দোলাও আমার হৃদয়!

বাংলা পড়তে জানে না রিয়া, কারণ তাকে কখনও সেটা পড়ানো হয় নি। বাড়িতে কোনো বাংলা গল্পের বই নেই। থাকলেও সেটা হিব্রু কিম্বা টিবেটিয়ান বলে মনে হতো রিয়ার কাছে। নেই তাই রক্ষে। বাংলা রেকর্ড নেই। মা বলেন, 'বাংলাগান মানেই তো প্যানপেনে রবীন্দ্রসংঙ্গীত। শুনলেই নপুংসকদের কথা মনে হয়।'

বাবা বলেন, 'রবীন্দ্রনাথের বাইরেও গান আছে হনি। ছিলও।

মা খিলখিল করে হেসেছিলেন, 'সকল দেশের সেরা আমার জন্মভূমি? ওই মিথ্যে কথা সুর করে গাইলেই গান বলতে হবে? বি স্মার্ট রিয়া, জীবনটাকে টগবগে করো, বাঙালি সেন্টিমেন্ট ধোপার দেওয়া মাড়ের মতো। স্মৃতির কাপড় শক্ত করে কিন্তু দুর্গন্ধ ছড়ায়। ওসব এ বাড়িতে চলবে না।'

দোলাও দোলাও তোমার আপন—। লিফটম্যানকে দেখে চুপ করে গেল রিয়া। এই লোকটা বাঙালি। যদি গানটা জানা থাকে তাহলে হয়তো ভুল ওয়াডিং কিংবা টিউন ধরে ফেলবে। সোঁ সোঁ করে ওদের ফ্লোরে চলে এসে শান্তি।

তিনবার বোতাম টিপলো রিয়া। ভেতর থেকে কোনো শব্দ নেই। তারপর হিপ পকেট থেকে কিছু টাকা আর চাবি বের করল। এই ফ্ল্যাটের তিন বাসিন্দার জন্যে তিনটে চাবি বরাদ্দ। যে যখন ইচ্ছে ঢোক এবং বের হও।

ড্রইং রুমেই পরিচিত দৃশ্য। বাবা চিৎ হয়ে পড়ে আছেন সোফায়। মাথার পাশে পিটার স্কটের বোতলটা খালি। গ্লাসে এখনও অবশিষ্ট রয়েছে। টাই দূরের কথা, জুতো পর্যন্ত খোলেন নি বাবা। মুখ হাঁ। আউট, মাই পাপা ইজ আউট। রিয়া এগিয়ে এসে বাবার পাশে দাঁড়াল। সামান্য ঝুঁকল। কালো রঙ, সামান্য ফেড হয়ে যাওয়ায় লালচে রূপোলি চুল ঝিলিক মারছে। এই মুহূর্তে বাবাকে খুব বুড়ো মনে হচ্ছিল। বুড়ো এবং অসহায়। কফিনে শুইয়ে দিলে বোধহয় চমৎকার শান্তি পেত। ভোর অবধি এইভাবেই পড়ে থাকবেন বিখ্যাত কোম্পানির ডিরেক্টর। সকালে ক্লিন সেভ্‌ড হয়ে ঝকমকে হাসবেন, বলবেন হা-ই।

রিয়া মায়ের ঘরের সামনে দাঁড়াল। নীলচে আলো জ্বলছে। কোনো শব্দ নেই। সে নিচু গলায় ডাকল, 'মাম্মি!' দুটো মুহূর্ত, কোনো সাড়া এল না। ভারি পর্দা সরিয়ে পা বাড়াতে শূন্য ঘর চোখে এল। ঘড়িতে তখন দুটো কোকিল পালা করে ডেকে জানাল বারোটা বাজছে। মায়ের বিছানার পাশেই ম্যাগনেটিক রিসিভার। ন্যুয়র্ক থেকে আনানো। কড্‌বিহীন রিসিভার নিয়ে এই ঘরের যে কোনো প্রান্তে গিয়ে কথা বলা যায়। রিয়া টেলিফোনের বোতামটা টিপতেই মায়ের কণ্ঠস্বর কানে এল, 'হা-ই, গোয়িং আউট ফর দা নাইট। ডোণ্ট ওয়েট ফর মি।'

বোতামটা ছেড়ে দিতেই ঘর শান্ত। মেসেজ রেখে গেছেন সোস্যাল ওয়ার্কার। উইক এণ্ড কাটাতে গেছেন তিনি। সারারাত আমি চরে বেড়াবো, আমার জন্যে কেউ বসে থেকো না। অন্তত বাবা বসে থাকেন নি। ছাব্বিশ আউন্স পেটে পুরে সটান পড়ে আছেন।

এই বাড়িতে ঝি চাকর নেই। ঠিক নেই বললে ভুল হবে। একটা নেপালী ছোঁড়া আসে ভোরে। ব্রেকফাস্ট করে দিয়ে চলে যায়। আর সব সেলফহেল্প। মা বলেন পৃথিবীর যে কোনো সভ্যদেশে এটাই নিয়ম। তোমার খাবার তুমিই করে নেবে। ফ্রিজে সব রাখা আছে। সপ্তাহে দুদিন মায়ের ড্রাইভার সেগুলো কিনে এনে দেয়। যেহেতু ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয় তাই নেপালিটির আগমন, নইলে সেটাও বন্ধ হলে মা খুশি হতেন। বাবার সমস্ত আধুনিকতা এখানেই হোঁচট খায়। কিন্তু—এই বাড়িতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মায়ের। মা লাঞ্চ ডিনার বাড়িতে খাচ্ছে এমন দিন হাতে গোনা

যায়

নিজের ঘরে ফিরে এলো রিয়া। এখন তার শুয়ে পড়া উচিত অথচ ঘুমের কোনো সম্ভাবনাই নেই। বরং উৎকট মাথা ধরে আছে। এই ছোট পরিবারে কেউ নেই যার সঙ্গে কথা বলা যায়। খুব আফসোস হচ্ছিল ওর। ফট করে না উঠে এসে নীতাদের সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ কাটালে, নেশাটা জমতো। আচ্ছা, এখন স্নান করলে কেমন হয়?

টয়লেটের সঙ্গেই শাওয়ার। জানলাটা খুলতেই ঝকঝকে আকাশ চোখে পড়ল। নীতাদের ওখান থেকে আসবার সময় খেয়াল হয় নি আজ জ্যোৎস্নার রাত। একটু বেড়ালে কেমন হয়? একটু ঘুরে বেড়ালে। এই রাত দুপুরে? চমচমে জ্যোৎস্না কিরকম কিলবিল করতে লাগল রিয়ার সামনে। সে পোশাক না ছেড়ে বেরিয়ে এলো। পিতৃদেব তখনও একই অবস্থায় পড়ে আ[illegible]ন। বাবা কতদিন তাঁর বাবাকে ছাখেননি কে জানে? রিয়া শুনেছে ও[illegible] মানুষটা মালদার একটা গ্রামে বাস করেন। বাবার মা মারা যাওয়ার খবর এলে যে সব নিয়ম পালন করতে হয় তা এ বাড়িতে করা হয় নি। তখন রিয়া আরও ছোট ছিল, কেন হয় নি তা সে জানে না। তবে সেই মুহূর্তে মায়ের আড়ালে বাবাকে খুব দুঃখী বলে মনে হয়েছিল, তা ঠিক। এই সময় বাবাকে খুব সরল বলে মনে হচ্ছে। ঘুমন্ত মানুষ কোনো প্রিটেনসন করতে পারে না এই জন্যেই কি?

দরজা খুলে বেরিয়ে এলো রিয়া। লিফট নয়, সিঁড়ি ভেঙে সে নামছিল। নামবার সময় অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছিল। আমার শরীর ঠিক আমার নয়। পৃথিবীর গভীর থেকে গভীরে নিঃশব্দে হেটে যাওয়ার মতো এই নামা। প্রতিটি ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ। এই সফিস্টিকেটেড ম্যাচবক্স বস্তিটার মানুষজন বাইরে নেই। শুধু আমিই নেমে যাচ্ছি।

গেটের বাইরে এসে তার মন ধাতে এল। কোথায় যাওয়া যায়? এসব জায়গায় ডাকাতি বা ছিনতাই হয় বলে শোনা যায় না। আমি একটু আমার মতো পৃথিবীতে হাটতে চাই. খামোকা কেন তাতে বাধা দেবে কেউ? নিজের কাছে গড়ে নেওয়া এই সরল বিশ্বাসে আশ্বস্ত রিয়া পা ফেলতে লাগল। ভালবাসার গন্ধের মতো কিংবা ঘুমন্ত শিশুর হাসির মতো একটা জ্যোৎস্না বেরিয়ে আসছিল চাঁদের শরীর থেকে। আর তাতে ক্রমশ জবজবে হয়ে যাচ্ছিল রিয়া। এমন একটা সুখের সন্ধান সে কখনও পায় নি। এরকম রাত কখনও বলে না ডোণ্ট ওয়েট ফর মি। বরং সেই দোলাও দোলাও শব্দ দুটো বারংবার ফিরে ফিরে আসে।

রিয়ার খেয়াল হলো লেকটার কথা। মাত্র মিনিট পাঁচেক দূরে সেই

লেকটা, যেখানে এককালে সে বেড়াতে যেত। তখন একটা আয়া ছিল তার জন্যে। ফুট-ফুটে অনেক বাচ্চা আমাদের গা ঘেঁসে বসে জল দেখত। অনেককাল সেখানে যাওয়া হয় নি। আজ গেলে কেমন হয়?

জ্যোৎস্না রাত্রে জলের মতো সুন্দরী আর কেউ হয় না। আকাশের মুখ জলের বুকে সাঁতরে সাঁতরে ভালবাসার ঘ্রাণ নেয় চাঁদের সঙ্গ পেয়ে। একটা স্ট্যাচুর ধাপে বসে রিয়া এই দৃশ্য দেখছিল।

কখন চাঁদ মরে গেছে, কখন রাত ফুরোল কখন জলের রঙ কালো হলো রিয়া জানে নি। কারণ তার শরীর শীতল বাতাস পেয়েছিল, মাথা হেলেছিল স্ট্যাচুর স্তম্ভে। হালকা ঘুম ছড়িয়ে প্রকৃতি তার রাতের শেষ খেলা খেলে নিল। এবং তখনই কানে এল কিছু শব্দ। উদাত্ত কণ্ঠে কেউ কিছু শব্দ উচ্চারণ করে যাচ্ছে। যার স্বর এবং ধ্বনি অদ্ভুত একটা মায়ালোক তৈরি করে ফেলছে চারপাশে। রিয়া দেখল ভোর হচ্ছে। আকাশের অনেকটাই এখন লাল ছোপ মেখেছে। শব্দতরঙ্গ তাকে কৌতূহলী করছিল। ধীরে ধীরে সে পা বাড়াল।

গাছের আড়াল সরতেই তার দৃষ্টিতে এক দীর্ঘকায় মানুষ ধরা দিলেন। তাঁর দুটো হাত নমস্কারের ভঙ্গিতে আবদ্ধ। পরনে ধুতি এবং সাদা ফতুয়া। তন্ময় হয়ে সূর্যের প্রতীক্ষায় মন্ত্র উচ্চারণ করছেন। সেই মন্ত্রের অর্থ রিয়ার জানা নেই। শব্দগুলো তার অবোধ্য। তবে সংস্কৃত বাক্যগুলো উচ্চারণে অনুমান করতে পারল সে। ঠিক সেই সময় আকাশকে চমকে দিয়ে জলের ওপর উঁকি মারল দিনের প্রথম সূর্য। লাল সোনালি আভায় পৃথিবী ছেয়ে যেতে বৃদ্ধ মন্ত্রপাঠ শেষ করলেন। তারপর প্রণাম জানিয়ে ফিরে দাঁড়াতেই রিয়ার সঙ্গে তাঁর চোখাচোখি হলো। রিয়া হাসবার চেষ্টা করল, 'হা-ই।'

বৃদ্ধ বললেন, 'হ্যালো!'

রিয়া প্রশ্ন করল, 'তুমি এতক্ষণ কি করছিলে?'

বৃদ্ধ জবাব দিলেন। তাঁর উচ্চারণে দক্ষিণভারতের টান, 'প্রার্থনা করছিলাম। যাতে সূর্য ওঠে, অন্ধকার দূর হয়। তুমি বুঝতে পার নি?'

মাথা নাড়ল রিয়া, না।

'সেকি? তুমি তো ভারতীয়, তুমি সূর্যস্তোত্র শোন নি?'

'ভারতীয়!' রিয়া মাথা নাড়ল, 'আমি জানি না। তুমি কি বলছিলে এতক্ষণ?'

দক্ষিণ ভারতীয় বৃদ্ধটি বললেন, 'আমি প্রার্থনা করছিলাম যাতে সূর্যদেব ব্যাখ্যান, জগতের মঙ্গল হয়, কারণ অন্ধকার মানেই অপবিত্র।'

বাস চরেরিয়া জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু এই প্রার্থনায় তোমার কি উপকার হবে?

মাঃ

তোমার তো বয়স হয়েছে। তাই না ?'

বৃদ্ধ বললেন, 'বয়স ? হ্যাঁ, তা হয়েছে। কিন্তু তোমরা যারা পৃথিবীতে আছ, অনেকদিন থাকবে, এই প্রার্থনা তাদের উপকারে আসবে। আমরা সবসময় কি নিজের জন্যে সব কিছু করি ?'

ঠিক সেই সময় একটি কিশোর দূর থেকে চিৎকার করে উঠল। ছুটে আসছিল সে পাগলের মতো। এসে জড়িয়ে ধরল বৃদ্ধকে। তারপর দ্রুত নিজের ভাষায় কিছু বলে গেল। বৃদ্ধ সস্নেহে তাকে জড়িয়ে ধরে এগিয়ে যেতে রিয়া আবার প্রশ্ন করল, 'এ তোমার কে হয় ?'

'নাতি। আমাকে ডাকতে এসেছে।'

'কেন ?'

'আমার ছেলে আর বউমা চায়ের টেবিলে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে, তাই।' বৃদ্ধ হাসলেন। তারপর চলে যেতে যেতে বললেন, 'বাই।'

শূন্য জলের ধারে ভোরের রোদ কখনও কখনও জ্যোৎস্নার চেয়েও সুন্দরী করে তোলে প্রকৃতিকে। সেই আলোয় আলোকিত রিয়া জলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখল। সে দেখল তার ঠোঁট নড়ছে। আর সমস্ত শরীর মন্থন করে অমৃতের স্বাদ মানা একটা শব্দ সেই ঠোঁটের ফাঁক গলে পৃথিবীর শরীরে মিশে গেল, 'হা-ই!' তারপরেই বুক ভরে বাতাস নিল সে। নিয়ে বলল, 'বাই দাদু।'

———